অতীন্দ্রিয় অলৌকিকের অন্তরালে

অতীন্দ্রিয় অলৌকিকের অন্তরালে

উৎস মানুষ সংকলন

অতীন্দ্রিয় অলৌকিকের অন্তরালে

উৎস মানুষ সংকলন

Atindrio Aloukiker Antarale

Utsa Manush Samkalan

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯৫

প্রকাশক : পবন মুখোপাধ্যায়, উৎস মানুষ, বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক কলকাতা ৭০০ ০৬৪

মুদ্রক : হিন্দুস্থান আর্ট এনগ্রেভিং (প্রা:) লি. ২৪ কার্তিক বোস স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯

লেজার সেটার : শিবা লেজার সেটার, ৮৯/১গড়পার রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ : তরুণ বসু

দাম : তিরিশ টাকা

ISBN-81-86371-02-8

সূচীপত্র

অন্যান্য উৎস মানুষ সংকলন

বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান (১ম খণ্ড)/২৫.০০

বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান (২য় খণ্ড)/ ৩০.০০

বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ/২৫.০০

শেকলভাঙা সংস্কৃতি/১৬.০০

প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয়/২২.০০

এটা কি ওটা কেন/১৬.০০

বিবেকানন্দ অন্য চোখে/২৫.০০

বিবেকানন্দ অন্য চোখে : একটি সমীক্ষা একটি বিতর্ক/১৬.০০

প্রমিথিউসের পথে/৮.০০

প্রতিরোধ/৩২.০০

যে গল্পের শেষ নেই/২৫.০০

ছেচল্লিশের দাঙ্গা ২৫.০০

স্বাস্থ্যের বৃত্ত/২০.০০

বিজ্ঞানকে মুখোশ করে/২০.০০

সাপ নিয়ে কিংবদন্তী/১৫.০০

আগের কথা

পঞ্চাশ হাজার বছর আগের প্রাচীন মানব নিয়নডারথাল-রা তাদের নিকটজনের মৃতদেহ কবর দিত, মৃতদেহের পাশে রাখত খাদ্যদ্রব্য হাতিয়ার—দেহাতীত অস্তিত্বের বিশ্বাসে। পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন গ্রীক মিশরীয় চিত্রকর্মে দেখা যায় অনৈসর্গিক অবয়ব পার্থিব মানুষের সাথে সংযোগ রাখছে, প্রভাবিত করছে তাকে। ...প্রাচীন থেকে নবীন সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ ব্যাপক রূপান্তর ঘটিয়েছে মানুষের জীবনধারায়, চিন্তায়, সংস্কৃতিতে। কিন্তু জনজীবনে গভীরভাবে গেঁথে থাকা সেই প্রাচীন দৈব, পরলোক, অতীন্দ্রিয়, অলৌকিকের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পেরেছে কি আধুনিক মানবমন? পারে নি যে তা আমরা সবাই জানি—সারা বিশ্বের নানা অদ্ভুত আশ্চর্য আপাত অবিশ্বাস্য কাণ্ডকারখানা সেই পরিচয় দেয়।...কিন্তু কেন? কেন এই নতুন বোতলে সেই পুরনো সোমরস রয়ে যায়? এর অন্তর্নিহিত প্রক্রিয়াটি যথেষ্ট জটিল সন্দেহ নেই। আসলে, মানুষ স্বভাবত রহস্য-রোমাঞ্চ প্রিয় এবং পরনির্ভরপ্রবণ। ব্যক্তিজীবন সমাজজীবন জাতীয়জীবনে প্রতিনিয়ত দুর্বিপাক, সংকট, নিরাপত্তাহীনতা আর অনিশ্চয়তা মানুষকে পীড়িত করে, বিভ্রান্ত করে। বিজ্ঞান সব সংকট মোচন করতে পারে না, সবাইকে খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান দিতে পারে না, সব আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সম্পূর্ণ সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে না। অতএব আঁকড়ে ধরার মতো কোনো অ-দেখা শক্তি, কোনো অজানা পরিত্রাতা দুর্বল মনে জায়গা করে নেয়। রহস্যপ্রিয় দুর্বলচিত্ত মানুষ অবনত হয়ে যায় অলৌকিক 'কিছু' একটা শক্তির প্রতি। এই 'কিছু' একটা শক্তির সপক্ষে তথ্য-তত্ত্ব-ব্যাখ্যা পরিষ্কার ও প্রমাণিত না থাকলেও থাকে বিশ্বাস, থাকে বিস্ময়মেশানো আনুগত্য। সেখানে শিক্ষা-দীক্ষাও হার মেনে যায়। দেশে-বিদেশে নানা চরিত্রের ইন্দ্রিয়-বহির্ভূত অনুভূতি (ESP), অলৌকিক দৈব ক্ষমতা, আর অতি-প্রাকৃত (Paranormal) ঘটনাবলীর কাহিনী শোনা যায়, সাধারণ মানুষ রহস্য-রোমাঞ্চের চমকে সে-সব বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করে, আত্মসমর্পণ করে, এবং তার অবধারিত পরিণতি হয়—প্রতারণা আত্মপ্রবঞ্চনা হতাশা এবং বিভ্রান্তি। কিন্তু কেন মানুষ এত সহজে প্রভাবিত হয়? কেন অথর্ব হয়ে থাকে তার জিজ্ঞাসু সন্দিগ্ধ মন? ...এর অন্যতম এক কারণ হলো অলৌকিক, অপার্থিব, অতীন্দ্রিয় ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা মানুষের কাছে প্রায়শই কুয়াশাচ্ছন্ন ধোঁয়াবৃত থাকে। এগুলি সত্যি না মিথ্যে, নির্ভরযোগ্য না জালিয়াতি তা সঠিক বুঝে উঠতে পারে না অধিকাংশ মানুষ। বাস্তবে সত্য উদ্‌ঘাটন করতে পারে একমাত্র বিজ্ঞান। যে বিজ্ঞান আজ ক্ষুদ্রতম পদার্থ কণা থেকে শুরু করে

অনন্ত নক্ষত্র জগৎ পর্যন্ত বিস্তৃত ক্ষেত্রে বিচরণ করে চলেছে অপ্রতিহত দাপটে তাকেই হাতিয়ার করা যায়, সেই বিজ্ঞানেরই যুক্তি-বিচার-বিশ্লেষণ দিয়ে অলৌকিক রহস্যময় ঘটনাবলীর অন্ধকার আবরণকে উন্মোচন করা সম্ভব—প্রতারণা ভাঁওতা আর বিভ্রম কাটিয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এই প্রয়োজনীয় কাজটা করার মতো ব্যক্তি বা সংগঠন, স্বভাবতই, কম। প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কে আর যেতে চায়! তবু কিন্তু এরই মধ্যে বিদ্রোহীরা কাজ করে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞানপ্রেমী সত্যানুসন্ধানীরা অতীন্দ্রিয় অলৌকিকের স্বরূপ উদঘাটন করে চলেছেন, মিথ্যের মুখোশ ছিঁড়ে ফেলতে চাইছেন যেখানে যতটুকু সম্ভব। এইসব তথ্য-সংবাদ সকলের কাছে সহজে পৌঁছয় না। *উৎস মানুষ* পত্রিকায় ১৯৮১ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন সংখ্যায় এ-জাতীয় রহস্য উন্মোচক অনুসন্ধান রিপোর্ট ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণমূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে—তা থেকেই নির্বাচিত কুড়িটি রচনা সংকলিত হলো বর্তমান গ্রন্থে। প্রতিটি রচনার শেষে পত্রিকায় প্রথম প্রকাশের কাল উল্লেখ করা হয়েছে। কয়েকটি রচনার শিরোনাম পরিবর্তন করা হয়েছে এবং সামান্য সম্পাদনা করা হয়েছে পুনরাবৃত্তি বা একঘেয়েমি কাটানোর জন্য। কিছু নতুন চিত্রও সংযোজিত হয়েছে বর্তমান বইতে; 'অলৌকিক প্রভা'র ছবি নতুন করে তোলা হয়েছে। বিষয়গুলি সাজানোর ক্ষেত্রে পত্রিকায় প্রকাশকালের ক্রমিক পর্যায় অনুসরণ করা হয় নি, বরং প্রতিপাদ্য বিষয়ের সাবলীল বিস্তারের কথা মাথায় রেখে বিষয়-বিন্যাস করার চেষ্টা হয়েছে। আমাদের (*বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান*) ২য় খণ্ডের ভূমিকায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম পত্রিকার অতীন্দ্রিয়বাদ সংক্রান্ত লেখাগুলির একটি সংকলন আমরা ভবিষ্যতে প্রকাশ করব। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হলো। এরপর, এ বই-এর যাবতীয় ভালো-মন্দ বিচারের ভার রইল পাঠকবন্ধুদের ওপর।

সম্পাদকমণ্ডলী

অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা

আমার বড়দা ব্যাংকে চাকরি করেন। কিছুদিন আগে কর্তৃপক্ষ তাকে গয়া বদলি করার হুকুম জারি করলেন। গয়া যেতে দাদা ভীষণ অনিচ্ছুক ছিলেন এবং বদলির আদেশ ঠেকাবার জন্য যতরকমভাবে পারা যায় চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই নিষ্ফল হলো। কিছুদিন পরে শুনলাম, শেষ চেষ্টা হিসাবে দাদা এক বিখ্যাত তান্ত্রিকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন এবং তিনিও এ ব্যাপারে তাঁর অক্ষমতা জানিয়ে দিয়েছেন। কাজেই বদলি হতেই হবে।

তান্ত্রিক বাবাজী কিছু করতে পারলেন না বটে কিন্তু তার ক্রিয়া-কলাপের যে বিবরণ দাদা আমাদের দিলেন তাতে আমরা সবাই একেবারে তাজ্জব বনে গেলাম। খবরের কাগজে 'বিশ্বাস হরিয়েছেন?' বিজ্ঞাপনই দাদাকে আকৃষ্ট করেছিল। যখন যথাস্থানে গিয়ে পৌঁছলেন তখন ওঁকে বাইরের একটা ঘরে বসতে বলা হলো এবং একটা খাতায় নাম ঠিকানা লিখতে বলা হলো। ঘন্টাখানেক পরে ডাক পড়ল বাবার সঙ্গে দেখা করার। ভেতরের একটা ছোটো কামরায় ওঁকে বাবার কাছে নিয়ে যাওয়া হলো এবং কী প্রশ্ন জানতে গেছেন সেটা বাবা ওঁকে একটা কাগজে লিখে ফেলতে বললেন। দাদা তার বদলি ঠেকাবার কথা লিখলেন। দাদার লেখা শেষ হওয়ামাত্র বাবা একটা কাগজ বার করলেন এবং দাদা দেখলেন ওঁর প্রশ্নের জবাব বাবা আগে থাকতেই ঐ কাগজে লিখে রেখেছেন। এরকম আশ্চর্য ব্যাপার দেখে দাদা যার-পর-নাই বিচলিত হয়ে পড়লেন এবং আমরা যারা শুনলাম, কিছুতেই ভেবে পেলাম না ঐ ভিতরের ঘরে বসে বাবা কি করে দাদার মনের কথা টের পেয়ে গেলেন। বয়স্করা যথারীতি এর মধ্যে দৈব ক্ষমতা দেখতে পেলেন এবং মানুষের যুক্তি, বুদ্ধি, বিজ্ঞান যে এখনও এসবের কাছে শিশু—সেই মন্তব্য প্রকাশ করলেন।

আমার কিন্তু ব্যাপারটাকে একটু বাজিয়ে দেখতে ইচ্ছে হলো এবং একদিন নিজেই বাবার ডেরায় গিয়ে হাজির হলাম। দেখলাম আমার আগে অন্তত দশ থেকে বারো জন লোক বসে আছে। যথারীতি খাতায় নাম ঠিকানা লিখে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বাবার যে লোকজন ছিল তাদের সঙ্গে কথাবার্তায় জানতে পারলাম বাবাকে মোট চারটি প্রশ্ন করা যাবে এবং এর জন্য বাবা কোনো পারিশ্রমিক নেবেন না। তবে মায়ের পুজোর জন্য কিছু দক্ষিণা দিতে হবে তা হলো এক বোতল হুইস্কি, এক প্যাকেট ধূপবাতি ও একটা দেশলাই-এর দাম। সব মিলিয়ে ৩৯ টাকা কয়েক পয়সা। যাই হোক, যথা সময়ে ডাক পড়ল এবং বাবার কাছে গেলাম। বাবা দেখলাম মদে চুর হয়ে আছেন তবে মাতাল নন। বাবার কথামতো দক্ষিণার টাকা হাতে দিলাম এবং কাগজে প্রশ্ন লিখলাম। সাধারণত লোকে করে না এরকম চারটে প্রশ্ন ভেবে

রেখেছিলাম, তাই লিখে দিলাম। বাবাও তার জবাবের কাগজ বার করলেন। বাবার কাগজে আমার চাকরি, পদোন্নতি, প্রেম, বিবাহ ইত্যাদি বিষয় লেখা আছে দেখলাম কিন্তু আমার একটা প্রশ্নেরও জবাব পেলাম না। আমার প্রশ্ন দেখে বাবাও দেখলাম বেশ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তারপর আমার হাতখানা টেনে নিয়ে হাতের রেখা দেখে প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন এবং জ্যোতিষীরা যেমন বলে, রাহু, কেতু, শনি, মঙ্গল, উচ্চস্থ, নীচস্থ ইত্যাদি আরম্ভ করলেন। তবে বাবাকে ভদ্রলোক না বলে উপায় নেই। প্রশ্ন ও উত্তরে মিল না হওয়ায় দক্ষিণার সমস্ত টাকা আমাকে ফেরৎ দিলেন। একটা ছাপানো প্যাডে আমার ভবিষ্যত সম্বন্ধে অনেক কথা লিখে দিলেন এবং আশ্বাস দিলেন যে ভবিষ্যতে যদি কোনোদিন বাবার সাহায্যের দরকার হয় তবে ঐ কাগজখানা সঙ্গে করে নিয়ে গেলে বিনা খরচায় আমার সমস্ত প্রশ্নের জবাব দেবেন।

এই ঘটনা থেকে উপরোক্ত 'বাবা'র অতীন্দ্রিয় বা দৈব ক্ষমতার স্বরূপ হয়তো পাঠকমাত্রেই বুঝে নিতে পেরেছেন। এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে অধিকাংশ লোকে কতকগুলি মামুলী প্রশ্নই করে থাকেন যার উত্তর বাবাদের পকেটে সর্বদাই মজুত থাকে—আমার দাদাও তেমনই কিছু মামুলী প্রশ্ন করেছিলেন, আর স্বাভাবিক কারণে বাবাও তাকে চমকে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর আমি সচেতনভাবেই এমন কিছু প্রশ্ন করেছিলাম যা সাধারণত লোকে করে না, ফলে বাবাও প্যাঁচে পড়ে গিয়েছিলেন। তবে কথা হলো ভারতে অনেক কিছুর অভাব থাকলেও এরকম বাবার অবাব নেই এবং তার চেয়েও বড় কথা হলো আমরা যারা শিক্ষিত এবং ভালোভাবে খেয়ে-পরে বেঁচে আছি তারাই এই সমস্ত বাবাদের ব্যবসা বাঁচিয়ে রেখেছি। অশিক্ষিত গরীব লোকদের আমরা এক কথায় কুসংস্কারাগ্রস্ত বলে আখ্যা দিই বটে, কিন্তু তাদের পক্ষে দক্ষিণা মিটিয়ে এই সব বাবাদের সামনে যাওয়া মোটেই সম্ভব নয়।

আমাদের চারপাশে যে-সমস্ত ঘটনা ঘটছে সে সম্বন্ধে আমরা জ্ঞান, অভিজ্ঞতা বা ধারণা সংগ্রহ করি পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে। এই পাঁচটা ইন্দ্রিয় হলো চোখ, নাক, জিহ্বা এবং ত্বক। প্রায়ই আমরা বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন এমন অনেক লোকের কথা শুনতে পাই যারা নাকি ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়াই জ্ঞান সংগ্রহ করতে পারেন এবং তাঁদের এই বিশেষ ক্ষমতাকেই বলা হয় অতীন্দ্রিয় বা দৈব ক্ষমতা। সাধারণের মধ্যে এই ধারণা চালু আছে যে, বিশেষ রকম যোগ অথবা তন্ত্র সাধনার দ্বারা নাকি তাঁরা এই বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হন এবং অসাধ্য সাধন করতে পারেন। যেমন আমাদের বাবাজী, যার কথা একটু আগেই বলা হলো। সাধারণত আমাদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক লোকই এই ক্ষমতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই—বেশিরভাগই অন্যের কাছ থেকে শোনা কথা। আরও বড় ব্যাপার হলো আমাদের দেশের কোথাও কোনো বাবাকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে উক্ত ক্ষমতার পরীক্ষা করা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। কিছুদিন আগে বাঙ্গালোরের একদল বিজ্ঞানী বিখ্যাত 'সাঁইবাবা'কে আহ্বান জানিয়েছিলেন তাঁর অলৌকিক ক্ষমতাকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণ করার জন্য, কিন্তু

সাঁইবাবা সসম্মানে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এ-প্রসঙ্গে সিংহলের আব্রাহাম কভুর মহাশয়ের চ্যালেঞ্জের কথাও স্মরণ করা যেতে পারে। শ্রীকভুর ভারতের সমস্ত বাবাদের কাছে চ্যালেঞ্জ রেখেছিলেন (যা এখনও প্রযোজ্য) যে তিনি একটি টাকার নোট খামে ভরে রাখবেন এবং কোনো বাবা যদি ঐ অবস্থায় নোটের নম্বর বলে দিতে পারেন তাহলে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার পাবেন। তবে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলে বাবাকে প্রথমে ১০০০ টাকা জমা রাখতে হবে এবং না পারলে ঐ টাকা বাজেয়াপ্ত হবে। এখন পর্যন্ত যা খবর আছে তা হলো, একজন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে ১০০০ টাকা খুইয়েছেন এবং দ্বিতীয় কোনো বাবা ঐ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন নি।

সাধারণের মধ্যে আরও একটা ধারণা চালু আছে যে, খুব সাধারণ লোকের মধ্যেও মাঝে মাঝে এই ক্ষমতার প্রকাশ দেখা যায় এবং তা স্বতস্ফূর্তভাবেই দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে আমার শোনা দুটো ঘটনার কথা মনে পড়ছে। প্রথম ঘটনায় এক ভদ্রলোক, ধরা যাক রামবাবু, বি বা দী বাগে চাকরি করেন এবং অফিস ছুটির পর কসবায় নিজের বাসায় ফিরে আসেন অথবা মাঝে মাঝে বাবা মা-কে দেখতে বেহালায় যান। ঘটনার দিন অফিসে কাজ করতে করতেই রামবাবুর মনে হলো মা-বাবার কিছু হয়তো হয়ে থাকবে; এবং ছুটির পর রামবাবু বেহালা গিয়ে দেখেন সত্যিই মা ভীষণ অসুস্থ। রামবাবু যখন পরে এই ঘটনার কথা অফিসের বন্ধু-বান্ধবদের বললেন তখন তাদের মধ্যে যারা দৈব ইত্যাদিতে বিশ্বাস করতে অভ্যস্ত তারা সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপারটার মধ্যে অলৌকিকত্ব আবিষ্কার করলেন এবং আরও দশজনকে বলতে লাগলেন। কিন্তু যারা অত সহজে দৈবে বিশ্বাস করতে রাজি নয় তাদের মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগবে। যেমন, ১. রামবাবু যে এইরকম ভেবেছিলেন তার প্রমাণ কি? রামবাবুর মুখের কথাই একমাত্র প্রমাণ। কাজেই মুখের কথাকে যদি কেউ প্রমাণ বলে মেনে নিতে অস্বীকার করে তবে কিছু করার নেই। ২. রামবাবু যে-দিনই বেহালা যেতেন সেদিনই তিনি মা-বাবার সম্বন্ধে কিছু ভাবতেন। মা-বাবার যেহেতু বয়স হয়েছে তাই তাদের শারীরিক অসুস্থতার চিন্তা, রোজ না হলেও, মাঝে মাঝেই আসত, কিন্তু বাস্তব অবস্থার সঙ্গে ঐসব ভাবনার তেমন মিল হতো না। ঘটনার দিন ভাবনা ও বাস্তব অবস্থা সুন্দরভাবে মিলে গিয়েছিল। কাজেই ব্যাপারটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। ছক্কা পড়বে ভেবে যদি বেশ কয়েকবার লুডোর দান ফেলা হয় তবে একবার না একবার ছক্কা পড়বেই।

দ্বিতীয় ঘটনাটা হলো এরকম : শ্যামবাবু কলকাতায় থাকেন এবং তাঁর বোনের বিয়ে হয়েছে ব্যারাকপুর-এ। বোনের স্বামী দুশ্চরিত্র এবং এজন্য বোন খুবই মানসিক অশান্তিতে আছে। একদিন সকালে শ্যামবাবুর মনে হলো যেন তার বোন আত্মহত্যা করেছে এবং তার ঘন্টা খানেকের মধ্যেই টেলিফোনে খবর আসল যে, তার বোন সত্যি-সত্যিই আত্মহত্যা করেছে। এই ঘটনা থেকেও অনেকে শ্যামবাবুর মধ্যে হঠাৎ পেয়ে যাওয়া একটা অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা আবিষ্কার করে ফেলবেন। অনেকে আবার (যারা অন্ধবিশ্বাসী নয়) রামবাবুর ব্যাপারে যে প্রশ্ন তুলেছিলেন, শ্যামবাবুর বেলায় সেই একই সন্দিগ্ধ প্রশ্ন তুলবেন।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার। অনেকের ধারণা, অত্যন্ত প্রিয়জনের ক্ষেত্রে, যেমন মা ও তার ছেলেমেয়ের বেলায়, এরকম একটা ব্যাপার সচরাচর দেখা যায়। যেমন লণ্ডনে ছেলে অসুস্থ হয়েছে, দেখা গেছে মা কলকাতা থেকে তা টের পেয়ে গেছেন। এ-ব্যাপারে আমার যে-টুকু অভিজ্ঞতা আছে তা এখানে বলা যেতে পারে। আমার বোনের বিয়ে হয়েছে আসানসোলে। কলকাতায় মা-র যদি জল খেতে গিয়ে গলা আটকায় তার অর্থ হলো বোনের শরীর ভালো নেই। যদি হাঁটতে গিয়ে গ্লাস উল্টে যায় তবে নির্ঘাৎ ওদের কারো না কারো অসুখ করেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কাজেই সেরকম চেষ্টা করলে মা-র মধ্যে অনেকেই দৈব ক্ষমতা আবিষ্কার করতে পারেন।

আমার অভিজ্ঞতার সঙ্গে অনেকেই হয়তো একমত হবেন না। সন্দেহাতীতভাবে অতীন্দ্রিয় বা দৈব ক্ষমতার প্রমাণ পেয়েছেন এরকম ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তও হয়তো অনেকে হাজির করবেন। সে-সব তর্কের মধ্যে না গিয়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে এ-ব্যাপারে যতটুকু গবেষণা হয়েছে এবং সেই সমস্ত গবেষণার ফলাফলই বা কী, সেটা আলোচনা করাই যুক্তিযুক্ত হবে। ইংরাজিতে এই ক্ষমতাকে বলে Extra Sensory Perception (ESP) এবং একে সাধারণত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—১. টেলিপ্যাথি (mental telepathy),২. অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি বা অলোকদর্শন (clairvoyance) এবং ৩. ভবিষ্যৎ দৃষ্টি (precognition)।

প্রথম ক্ষেত্রে এক ব্যক্তি (প্রেরক) কোনো বাস্তব ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন এবং দ্বিতীয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তি (গ্রাহক) নাকি প্রেরক ব্যক্তির মন অনুধাবন করে বাস্তব ঘটনা বলে দিতে পারেন। প্রেরক ও গ্রাহক ব্যক্তির মধ্যে দূরত্ব এ-ব্যাপারে কোনো বাধা সৃষ্টি করে না। অর্থাৎ প্রেরক শত শত মাইল দূরে থাকলেও গ্রাহক তার মনের কথা টের পেয়ে যাবেন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কোনো প্রেরক থাকার দরকার নেই; গ্রাহক ব্যক্তি বাস্তব ঘটনাটা চোখে দেখছেন না বটে কিন্তু তার সমস্তই জেনে যেতে পারেন। এখানেও দূরত্ব কোনো বাধা হয় না, ঘটনার শত শত মাইল দূর থেকেও গ্রাহক তার সম্পূর্ণ বিবরণ দিতে সক্ষম হবেন। এই প্রসঙ্গে মহাভারতের গল্প স্মরণ করা যেতে পারে যেখানে সঞ্জয় ইন্দ্রপ্রস্থে বসে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বর্ণনা দিতে পেরেছিল। তৃতীয় ক্ষেত্রে ঘটনাটা ঘটার আগেই গ্রাহক ব্যক্তি বলে দিতে পারবেন যে ভবিষ্যতে কী ঘটবে। এখানেও দূরত্ব কোনো বাধার সৃষ্টি করে না।

আমরা প্রায়শই এমন অনেক ক্ষমতাশালী ব্যক্তির গল্প শুনি যারা নাকি উপরোক্ত তিনটি ক্ষমতাতেই পারদর্শী। এই সমস্ত ক্ষমতাশালী বা গ্রাহক ব্যক্তিদের নিয়ে নিম্নোক্ত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করা যেতে পারে। এক প্যাকেট তাস শাফ্‌ল্‌ করা হবে এবং শাফ্‌ল্‌ করার পর তাসগুলো পর পর কিভাবে সাজানো আছে বা তাসের ক্রম (order) গ্রাহক ব্যক্তিকে জানতে দেওয়া হবে না। এখন টেলিপ্যাথি পরীক্ষার ক্ষেত্রে একজন প্রেরক তাসগুলো দেখবেন এবং গ্রাহক তার মন অনুধাবন করে তাসের ক্রম বলে দেবেন। দ্বিতীয় বা অলোকদৃষ্টির ক্ষেত্রে কোনো প্রেরক থাকবেন না, গ্রাহক

দূর থেকেই তাসের ক্রম বলে দিতে সক্ষম হবেন। তৃতীয় অর্থাৎ ভবিষ্যৎদৃষ্টির ক্ষেত্রে শাফ্‌ল্ করার আগেই গ্রাহক বলে দিতে পারবেন যে শাফ্‌ল্ করার পর তাসগুলো কিভাবে সাজানো থাকবে। দেখা গেছে, এই পরীক্ষা বা এই জাতীয় সব পরীক্ষাতেই পরীক্ষার ফল অনুমান-সীমা অথবা সম্ভাবনা-সীমার মধ্যেই থাকে সর্বদা।

এই অনুমান-সীমা বা সম্ভাবনা-সীমার ব্যাপারটা একটু বলে নেওয়া ভালো। কেউ যদি একটা পয়সা নিয়ে ১০০ বার টস করে তবে প্রায় ৫০ বার হেড এবং প্রায় ৫০ বার টেল পড়বে। কাজেই হেড বা টেল পড়ার সম্ভাবনা সীমা ১০০-র মধ্যে ৫০। তেমনি ধরা যাক, কাউকে ১০০ প্রশ্নের জবাব দিতে বলা হলো এবং প্রশ্নগুলোর জবাব হবে—হ্যাঁ অথবা না। এখন যদি ঐ ব্যক্তি শুধু আন্দাজে হ্যাঁ-না, হ্যাঁ-না করে তাহলে অন্তত ৫০টা প্রশ্নের জবাব ঠিক হয়ে যাবে। এখানে বলা যাবে যে, সঠিক উত্তরের সম্ভাবনা-সীমা ১০০তে ৫০ বা ২ এর মধ্যে ১। ঠিক এই রকম, কেউ যদি লুডোর ঘুঁটির দান ফেলতে থাকে তাহলে ৬০ বার দান ফেললে কমবেশি ১০ বার ছক্কা পড়বে, ৬০০ বার দান ফেললে প্রায় ১০০ বার ছক্কা পড়বে। অর্থাৎ ছক্কা পড়ার সম্ভাবনা-সীমা ৬ এর মধ্যে এক। বর্তমানে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা প্রমাণ করার ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা-সীমার গুরুত্ব খুব বেশি। যেমন, এক ব্যক্তি একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় সফল হলেন যেখানে অঙ্ক কষে দেখা গেল তার সফল হবার সম্ভাবনা ছিল $১০^{৭০}$-এর মধ্যে ১। অথচ অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় বিশ্বাসীরা যদি এটাকে ওই ক্ষমতার অস্তিত্বের এক অকাট্য প্রমাণ বলে প্রচার করতে শুরু করেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু কথা হলো কেউ যদি কোনোরকম চাতুরি অবলম্বন করে তবে সম্ভাবনা-সীমার গাণিতিক মান কোনো কাজে আসে না। যেমন কোনো লোক যখন ৫২ খানা তাসকে শাফ্‌ল্ করার পর তার মধ্যে থেকে নির্দিষ্ট একটা তাসকে বার করতে চায় তখন তাসটি নির্ভুলভাবে বার করার সম্ভাবনা থাকে $৫২^{৫০}$-এর মধ্যে ১। কিন্তু আমরা জানি যে, ম্যাজিশিয়ানরা খুব সহজেই এই কাজটা করে থাকে এবং সাধারণের দুর্বোধ্য কোনো চাতুরি অবলম্বন করেই সে এটা করে।

এই যে তিন প্রকার ক্ষমতার কথা বলা হলো তাছাড়া চতুর্থ আর একটি ক্ষমতার কথাও অতীন্দ্রিয়বাদের প্রবক্তারা বলে থাকেন যার ইংরাজি নাম সাইকোকাইনেসিস (Psychokinesis)। এই ক্ষমতার বলে কোনো ব্যক্তি নাকি তার মানসিক শক্তি প্রয়োগ করে কোনো বাস্তব ঘটনাকে পরিবর্তিত করতে পারেন। যেমন ধরা যাক তাসের ক্ষেত্রে; ঐ ব্যক্তি মানসিক শক্তি প্রয়োগ করে এমন করতে পারেন যে শাফ্‌ল করার পর তাসের ক্রম (order) তাঁর ইচ্ছানুযায়ী হবে। অথবা লুডোর ঘুঁটির বেলায় মানসিক শক্তি দ্বারা যতবার ইচ্ছে ছক্কা বা যতবার ইচ্ছে পাঞ্জা ফেলাতে পারেন। কাজেই কেউ যদি এই সাইকোকাইনেসিস-এ পারদর্শী হন তাহলে তার ফলাফল কত সুদূরপ্রসারী হতে পারে তা বিশেষভাবে ভেবে দেখার মতো। তাস খেলার সময় তিনি তাঁর এবং পার্টনারের হাতে সমস্ত অনার্স কার্ড নিয়ে আসতে পারবেন এবং প্রতিবারই বাজি মাৎ করতে পারবেন! অবশ্য আপনার-আমার পকেটের টাকা নিজের পকেটস্থ করতে পারবেন কিনা সে সম্বন্ধে কিছু তথ্য কোথাও পাই নি।

অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা প্রমাণ বা অপ্রমাণ করতে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত মোট ১৪৫টি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার খবর পাওয়া যায়। এর মধ্যে বেশিরভাগ পরীক্ষার ফলাফলই সম্ভাবনা-সীমার নিচে। মাত্র কয়েকটি পরীক্ষার বেলায় দেখা যায় যে, ফলাফল সম্ভাবনা-সীমার উর্ধ্বে রয়েছে, যেমন ১. প্র্যাট-উডরাফ-এর পরীক্ষা, ২. পিয়ারস্-এর পরীক্ষা, ৩. ফুচিয়েন ওয়ার্নার-এর পরীক্ষা, ৪. টার্নার-ওন্‌বীর পরীক্ষা, ৫. মার্ফি ও তাভের পরীক্ষা ইত্যাদি। প্রবক্তারা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই ক-টা পরীক্ষার ফলাফলকেই 'সাইকিক' ঘটনাবলীর অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করে থাকেন। অথচ বিশেষজ্ঞদের মতে, উপরোক্ত পরীক্ষাগুলো সম্পূর্ণ চাতুরিমুক্ত ছিল না। আরও মজার
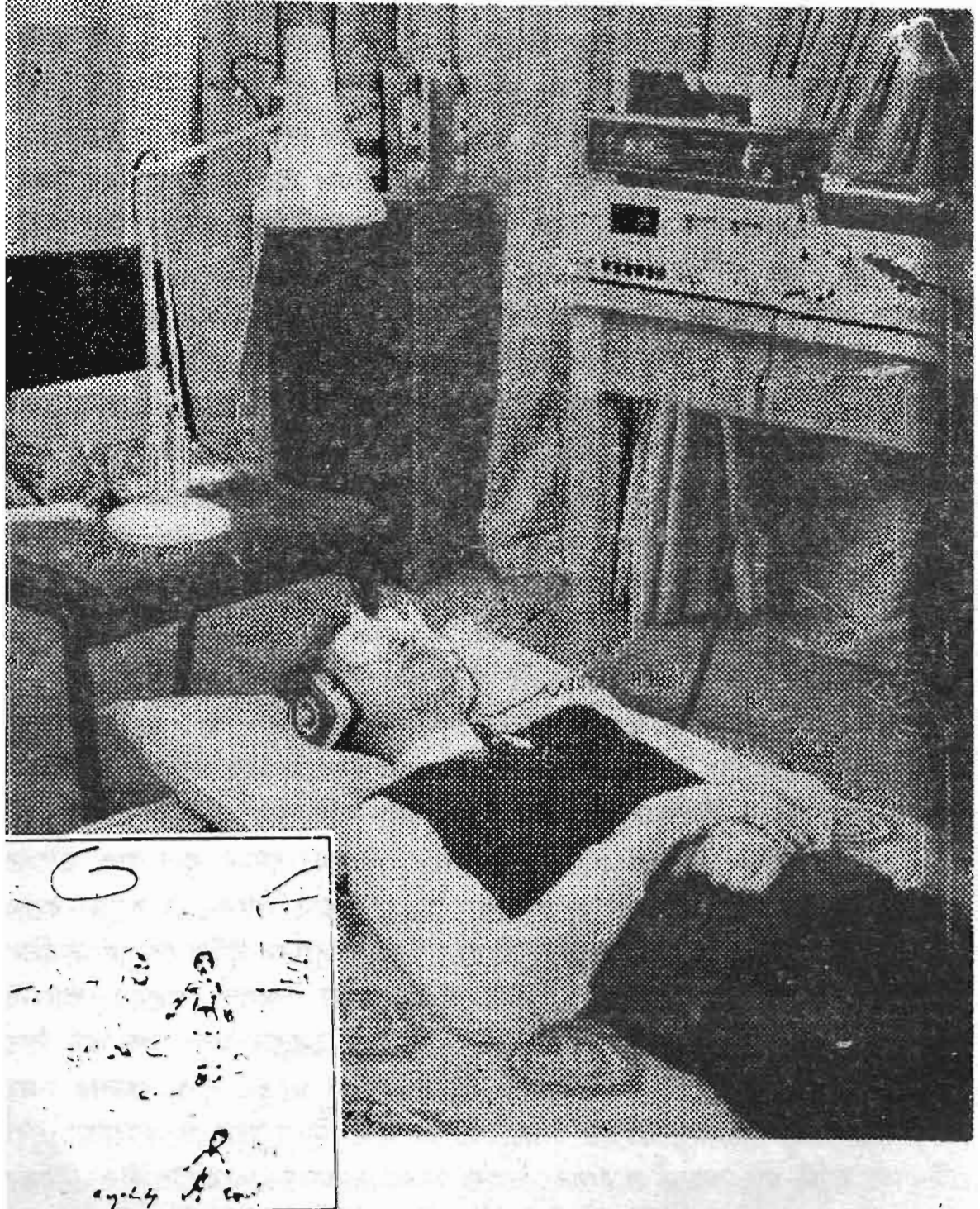
ই. এস. পি (ESP)/ অলোকদর্শন টেলিপ্যাথি নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা

ব্যাপার হলো, দৈবতত্ত্বের প্রবক্তারা নিজেরাই এই পরীক্ষাগুলোর ফলাফল সম্বন্ধে সন্দিহান। যেমন ১৯৫৪ সালে সোল ও বেটম্যান (Soal & Bateman) নামে দুই ভদ্রলোক *Modern Experiments on Telepathy* বলে যে বইটি প্রকাশ করেন তাতে উপরোক্ত পরীক্ষাগুলোর মধ্যে দুটো বাদে আর সবগুলোকেই সন্দেহজনক বলে মত প্রকাশ করেন।

বিজ্ঞানসম্মত ও সম্পূর্ণ চাতুরিমুক্ত বেশিরভাগ পরীক্ষার ফলাফল অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অস্তিত্বের বিপক্ষে রায় দেয় বলে এর প্রবক্তারা নিম্নোক্ত উপায়ে পিঠ বাঁচাতে চেষ্টা করে থাকেন। তাঁরা বলেন : ১. কোনো গ্রাহকের ক্ষমতা সব সময় একরকম থাকে না। (অর্থাৎ আমাদের পরীক্ষার সময় ক্ষমতা বেশি থাকে, তোমাদের পরীক্ষার সময় ততো থাকে না।) ২. কঠিন ও বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষার পরিবেশে ক্ষমতা একেবারেই লোপ পায়। ৩. যেহেতু সাইকোকাইনেসিস দ্বারা বাস্তব ঘটনাকে পরিবর্তিত করা সম্ভব তাই অবিশ্বাসীরা যখন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন তখন পরীক্ষকরা, ইচ্ছায়-ই হোক আর অনিচ্ছায়-ই হোক, মানসিক শক্তি দিয়ে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাকে নষ্ট করে দেন। [এই যুক্তি কিন্তু পুরোপুরি বিজ্ঞানের পরিপন্থী। কোনো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, সে বিশ্বাসীই করুক আর অবিশ্বাসীই করুক, ফল একই হবে—বিজ্ঞান এই কথাই বলে। কাজেই বিজ্ঞানী হেলম্‌হোল্‌ট্‌জ্‌ (Hermann Ludwig Von Helmholtz, 1821-1894) যথার্থই বলেছিলেন যে 'রয়াল সোসাইটির সমস্ত সভ্যগণের সাক্ষ্য-প্রমাণ, এমন কি আমার আপন ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য-প্রমাণও আমাকে কখনই এ-কথা বিশ্বাস করাতে পারবে না যে, ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত একজন মানুষের চিন্তা-ভাবনা অপর কোনো মানুষে স্থানান্তরিত হওয়া সম্ভব।']

গ্রন্থঋণ :

1. C. E. M. Hansell, *ESP : A Scientific Evaluation.*
2. Daniel Cohen, *ESP.*
3. *The Sixth Sense* , R. Heywood.
4. P. D. Bandit, *Clairvoyance* .
5. *McGraw Hill Encyclopaedia of Science & Technology* .

রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

ফেব্রুয়ারি ১৯৮২

মৃতদের সঙ্গে কথোপকথন ও থিওসফিক্যাল সোসাইটি

দেবতার পাশে অপদেবতা, কিংবা মানুষের পাশে অপ-মানুষ অর্থাৎ ভূতপ্রেত যেমন, তেমনি বিজ্ঞানের পাশে দাঁড়িয়ে আছে অপ-বিজ্ঞান। এরকম যুগলবন্দী অস্তিত্ব যেন প্রাকৃতিক নিয়মবশেই স্বতঃসিদ্ধ।

আধুনিক বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটেছে পশ্চিমে। অথচ আজও Occultism বা গুপ্তবিদ্যার ছড়াছড়ি। একসময় ওদেশে ডাইনি বলে অসংখ্য মেয়েকে পুড়িয়ে মারা হতো। আজকাল রাষ্ট্রীয় আইন ব্যবস্থার নিরাপত্তা ডাইনি-তন্ত্র বা Witch-cult-কে ঢাকঢোল পিটিয়ে পশ্চিমী সমাজে পুনর্জাগরণের সুযোগ দিয়েছে। মেমসায়েবদের দেখাদেখি ভারতেও ইদানিং বহু মহিলা নিজেদের ডাইনিতন্ত্র চর্চা সম্পর্কে কাগজে সাক্ষাতকার দেন। এ অবশ্য নেহাত ফ্যাসান।

ইউরোপের জেন্টাইলরা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ধর্মীয় হেলেনিজমের ভূতকে তাড়ানো যায় নি। হেলেনীয় গুপ্তবিদ্যা খ্রিস্টধর্মের আনাচে কানাচে থেকে গিয়েছিল। তদুপরি খ্রিস্টীয় সন্তরাও অনেকে গূঢ় রহস্যবাদী বা Occultist ছিলেন। এখনও বিস্তর পাদ্রী সে-দেশে এ চর্চায় লিপ্ত। তাঁরা ভূতপ্রেত তাড়ান মনুষ্যশরীর থেকে।

তত্ত্বগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে সেমেটিক ধর্মত্রয় : ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলিম ধর্মে গুপ্তবিদ্যা অস্বীকৃত ও নিন্দনীয়। কিন্তু এ ধর্মের সাধু-সন্তরা Occult-এর কেরামতি জাহির করতে বরাবর তৎপর। তার ফলে সাধারণ ধর্মবিশ্বাসীর মনে গুপ্তবিদ্যার (Occultism) ভিতটা দৃঢ় হয়েছে যুগে যুগে।

ভারতে হিন্দুধর্মের জটিল বিস্তারের আনাচে কানাচে আদিম সমাজের নানা গূঢ় রহস্যবিদ্যা টিঁকে ছিল যুগ-যুগ ধরে। বৌদ্ধ মহাযানীরা নতুন করে সাংগঠনিক ভাবে Occultism-এর পুনর্জাগরণ ঘটান। তন্ত্র এবং যোগ বিজ্ঞানের সংলগ্ন জমিতে বীজ রোপণ করে, আজ তা দুটি বিশালগাছ হয়ে ডালপালা ছড়িয়েছে। উনিশ শতকে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য যোগাযোগের বিপুল প্রসার ঘটলে এই ভারতীয় গুপ্তবিদ্যা রাসায়নিক উর্বরাশক্তি বিশিষ্ট সারের মতো পাশ্চাত্য Occultism-কে ফুলে ফলে বর্ণাঢ্য শস্যবতী করে তোলে। সমকালীন বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে তার সম্পর্ক ঘটাবারও চেষ্টা সেই প্রথম শুরু হয়।

পাশ্চাত্য Occultism-এর মহাসমারোহে পুনর্জাগরণের ধাত্রী এক রুশ মহিলা। ইনি নাকি বিদেহী আত্মাদের ডেকে আনতে পারতেন। তাদের 'সূক্ষ্ম শরীর' দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিতেন। শিষ্যসংখ্যা হু হু করে বেড়ে যেত। সারা পশ্চিম থেকে পূর্ব

তাঁর এই অলৌকিক কীর্তি ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতে বিভিন্ন সংবাদপত্রেও এসব খবর ফলাও করে ছাপা হতো। মাদ্রাজের কাছে সমুদ্রতীরে তিনি তাঁর ক্রিয়াকলাপের সদরদফতর স্থাপনও করেছিলেন। শুধু তাই নয়, ভারতীয় সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক শাসন-বিরোধী মনোভাব গড়ে তুলতেও তিনি প্রেরণা যুগিয়েছিলেন। তাঁরই শিষ্যা অ্যানি বেসাণ্ট। অ্যানির সঙ্গে এই রুশ মহিলার নাম স্মরণ করে আজও ভারতীয় বিদগ্ধজনেরা মাথা নত করেন।

মাদাম ব্লাভাৎস্কির কথাই বলছি। আধুনিক 'স্পিরিচুয়ালিজম' এবং থিওসফিক্যাল সোসাইটি, যাকে বলা হয় 'থিওসফিক্যাল মুভমেণ্ট', তার সূচনা ইনিই করেন।

****

তারিখটা ছিল ১৮৭৫ সালের ৭ সেপ্টেম্বর। নিউইয়র্কের ম্যানহাটান এলাকায় মাদাম ব্লাভাৎস্কির বাড়িতে সেদিন এক অদ্ভুত আলোচনার আয়োজন। বিষয় : প্রাচীন মিশরের রহস্যবিদ্যা। মাদামের এক শিষ্য জর্জ এফ. ফেল্ট ছিলেন বক্তা। ওই লুপ্তবিদ্যার পুনরুদ্ধার করেছেন নাকি তিনি। এ বিদ্যাবলে পরলোকের খবরাখবর নিয়ে আসা অর্থাৎ ডাক-পিওন স্বরূপ বিদেহীদের সঙ্গে মোলাকাত করা যায়। ফেল্ট সভায় তেমন এক বিদেহী পোস্টম্যানকে হাজির করেও ছাড়লেন। তারপর প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে সেই সভাতেই সংগঠিত আকারে এ বিদ্যাচর্চার সিদ্ধান্ত করা হলো। প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া হলো 'থিওসফিক্যাল সোসাইটি'।

কে এই মাদাম ব্লাভাৎস্কি? উনিশশতকে তিনি শুধু এক প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব নন। রীতিমতো রহস্যময় কিংবদন্তীসিদ্ধ একটি চরিত্র। প্রতীচ্য থেকে প্রাচ্যে তাঁর অলৌকিক শক্তির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। বিদেহী আত্মাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে হিড়িক পড়ে গিয়েছিল উনিশশতকে। মাদাম ব্লাভাৎস্কি তাঁর এই বিদ্যাকে বলতেন 'স্পিরিচুয়ালিজম'। নিউইয়র্কে আবির্ভূত হন যখন তখন তাঁর বয়স বিয়াল্লিশ বছর। সে যুগে ভাগ্যের সন্ধানে ইউরোপ থেকে অজস্র লোক আমেরিকায় পাড়ি জমাত। মাদাম তাঁদের একজন।

তাঁর জন্ম রাশিয়ায়। পুরো নাম হেলেনা পেত্রোভ্না ব্লাভাৎস্কি। নিউইয়র্কে আসার আগে তিনি পশ্চিম ইউরোপ ও মিশরে ছিলেন। কিন্তু নিজের সম্পর্কে অদ্ভুত-অদ্ভুত গল্প প্রচার করতেন। বলতেন যে তিনি তিব্বতেও গেছেন। কারণ তিব্বতের একটি গোপন আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠান তাঁকে নাকি তাঁদের বার্তা প্রচারের জন্যে বেছে নিয়েছিলেন। সেখান থেকে চলে আসার পরও তিনি তাঁদের কাছ থেকে অলৌকিক উপায়ে চিঠি পান এবং এসব চিঠিকে তিনি বলতেন, 'মহাত্মা লেটারস'। তিব্বতী গুপ্তবিদ্যার গুরুদের সঙ্গে তাঁর নাকি 'টেলিপ্যাথিক যোগাযোগ' রয়েছে; ওই গুরুরা তাঁকে নিয়মিত দেখাও দেন। দু-জন গুরুর নামও করতেন মাদাম : কুট হুমি এবং মাস্টার মর্য (Morya)।

এসব ব্যাপারে মাদামের সহযোগী ছিলেন এক মার্কিন আইনজীবি। তাঁর নাম হেনরি স্টিল ওলকট। পরে ওলকটের সঙ্গে মাদামের থিওসফিক্যাল সোসাইটির

ক্ষমতা নিয়ে দস্তুরমতো লড়াই বেঁধেছিল।

কিন্তু 'থিওসফিক্যাল সোসাইটি'-তে মাদাম ব্লাভাৎস্কি প্রাচ্য অধ্যাত্মবিদ্যা অর্থাৎ হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের (মহাযানী) ধ্যানধারণা জুড়ে দেওয়ার ফলেই তাঁর প্রভাব ভারত এবং শ্রীলংকায় প্রবল হয়ে ওঠে। অসংখ্য থিওসফিক্যাল সোসাইটি গড়া হয় এ দুটি দেশে। মাদাম তাঁর 'স্পিরিচুয়ালিজম' বিষয়ে দুটি মস্তো কেতাবও লেখেন। বিশেষ করে তাঁর *The Secret Doctrine* বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

বিদেহীদের সঙ্গে যোগাযোগ করার ব্যাপারে মাদাম বিজ্ঞানের রসায়নশাস্ত্রের প্রয়োগে পারদর্শিনী ছিলেন। বোঝাই যায়, ওইসব আশ্চর্য 'অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড' রসায়নবিদ্যারই কারিগরি। কিন্তু দক্ষ যাদুকরের ব্যক্তিত্ব ও প্রয়োগকৌশলে তিনি অবিশ্বাসীদেরও তাক লাগিয়ে দিতেন। ধ্যানবলে তিব্বত থেকে 'মহাত্মা লেটারস' আকর্ষণ করে প্রেতচর্চার আসরে এনে ফেলতেন! এ-বিষয়ে তাঁর প্রতিভার প্রশংসা না করে পারা যায় না। অতীন্দ্রিয় ঘটনাবলী, চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর এমন ক্ষমতা প্রয়াত পি সি সরকারেরও ছিল না।

****

মাদাম ব্লাভাৎস্কির রবরবা যখন তুঙ্গে, তখন ১৮৮২ সালে ইংল্যাণ্ডের একটি প্রতিষ্ঠান 'The Society for Psychical Research' বা আত্মাবিষয়ক গবেষণা সমিতি ব্যাপারটা নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। এই সমিতির সদস্য ছিলেন প্রখ্যাত কবি টেনিসন, উইলিয়ম জেমস্ প্রমুখ। সমিতি সমস্ত বিষয় অনুসন্ধানের জন্য রিচার্ড হজসনকে মুখপাত্র ঠিক করলেন। তখন মাদাম ব্লাভাৎস্কি এবং তাঁর সহযোগী বন্ধু ওলকট ভারতে মাদ্রাজের কাছে বঙ্গোপসাগরের তীরে তাঁদের কার্যকলাপের প্রধান ঘাঁটি গড়েছেন। হজসন এলেন সেখানে।

হজসনের অনুসন্ধান কিন্তু মাদামের 'স্পিরিচুয়ালিজমে'র বারোটা বাজিয়ে ছাড়ল। হজসন টের পেলেন, মাদামের ওইসব অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ (বা 'Supernatural Phenomenon') নিছক জুয়াচুরি। আসরে তিব্বতী আত্মা 'কুট হুমি'র আবির্ভাব ব্যাপারটা আসলে একটা মনুষ্যাকৃতি ডামির কীর্তি। ভারতীয় সংবাদপত্রে ফলাও করে মাদামের যে-সব অলৌকিক ক্ষমতা প্রচারিত হচ্ছিল, তা হজসনের মতে স্রেফ 'হোক্স'। ধাপ্পাবাজী। আসলে ব্লাভাৎস্কি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রতারকদের একজন।

একবছর পরে (অর্থাৎ ১৮৮৩-তে) ইংল্যাণ্ডের সেই সমিতি একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেন—তাতে মাদাম সম্পর্কে যা বলা হয়, তার একটা অংশ তুলে দিচ্ছি এখানে :

> For our own part we regard her either as the mouth-piece of hidden Seers, nor as a mere vulgar adventuress; We think that she has achieved a title to permanent remembrance as one of the most accomplished ingenious and interesting *impostors* in history.

তবু মাদাম ব্লাভাৎস্কির গায়ে কাঁটার আঁচড় লাগে নি। তিনি লণ্ডন শহরেই তাঁর 'থিওসফিক্যাল সোসাইটি' স্থাপন করেন। আইরিশ পুনর্জাগরণের ব্যাপারে তাঁর প্রেরণা অসামান্য হয়ে ওঠে। অ্যানি বেসাণ্ট তাঁর অনুগামিনী হন। অ্যানি আদতে ছিলেন সে-যুগের ফেমিনিস্ট বা নারী জাগরণ আন্দোলনের নেত্রী।

এমন অসামান্য ব্যক্তি বলেই তাঁর জীবন এবং ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে পরবর্তী সময়ে প্রচুর অনুসন্ধান হয়েছে। মাদাম বলতেন যে, তিনি গ্যারিবল্ডির সঙ্গে একবার ডুয়েল লড়ে আহত হয়েছিলেন। বলতেন, আমি কুমারী। কিন্তু জানা গেছে, সে কথা সত্যি নয়। আসলে তিনি রীতিমতো দুঃসাহসী, দুর্দান্ত মহিলা ছিলেন। প্রথম যৌবনে তিনি বিয়ে করেন। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে বেশিদিন ঘর করেন নি। পরে বিয়ে করেন এক বয়স্ক অপেরা গায়ককে। তাঁর নাম অ্যাগার্ডি মেট্রোভিচ। মেট্রোভিচের সঙ্গেই তিনি পশ্চিম ইউরোপ ও মিশরে কিছুকাল বাস করেছিলেন। ইউরি নামে তাঁর একটি অবৈধ পুত্র ছিল। সে মারা গেলে তিনি রটান যুদ্ধে ইউরির মৃত্যু হয়েছে।

মাদাম ব্লাভাৎস্কি ভারতে এসেছিলেন কিন্তু কদাচ তিব্বতে যান নি। ছেলেবেলা থেকেই তিনি অদ্ভুত-অদ্ভুত গল্প বলে এবং ক্রিয়াকলাপে তাক্ লাগিয়ে দিতেন লোককে। আমাদের দেশেও এমন চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের অভাব নেই। অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়ে তাঁরা অসংখ্য ভক্ত জোটাতে পেরেছেন।

****

মাদাম ব্লাভাৎস্কি মূলত পাশ্চাত্য গুপ্তবিদ্যায় (occultism) একটি বিপ্লব ঘটালেও তাঁর প্রেরণা ছিল এশীয় অধ্যাত্মবিদ্যা। ভারতে খ্রিস্টান মিশনারিদের বিরুদ্ধে যখন শিক্ষিত হিন্দুরা মর্যাদার লড়াইয়ে অবতীর্ণ, তখন মাদাম ব্লাভাৎস্কি স্বভাবত তাঁদের সমর্থনে এগিয়েছিলেন। ভারতে শুধু অধ্যাত্মক্ষেত্রের এ লড়াইয়ে নয়, ঔপনিবেশিক পাশ্চাত্য মূল্যবোধ চাপানোর বিরুদ্ধেও মাদামের প্রেরণা ছিল একটি উদ্দীপক শক্তি। কাজেই ভারতে মাদাম শ্রদ্ধেয় মহিলা ছিলেন। থিওসফিক্যাল সোসাইটির উত্তরসূরী অ্যানি বেসাণ্ট তো ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনেও প্রেরণা যুগিয়েছিলেন।

ব্লাভাৎস্কির গুপ্তবিদ্যা বা প্রেতচর্চা বিষয়ে আজীবন আগ্রহ ছিল খুব প্রবল এবং তার আদত কারণ, তাঁর জীবনেই কোথাও একটা গভীর শূন্যতা ছিল।

মাদাম ব্লাভাৎস্কি সম্পর্কে আগ্রহীরা অন্তত এ দুটি বই যোগাড় করে পড়ে দেখতে পারেন। মারিওন মিডের *দি উত্তমান বিহাইণ্ড্ দি মিথ* এবং ব্রুস এফ. ক্যাম্বেলের *এ হিস্টরি অফ দি থিওসফিক্যাল মুভমেণ্ট*।

মাদাম মারা যান ১৮৯১ সালে।......

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলে

প্রায়ই এখানে সেখানে দু-একটা এমন সংবাদ পাই যার শিরোনাম থাকে 'বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না'। সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, বেতার কিংবা দূরদর্শন সর্বত্রই এ-জাতীয় খবর পাওয়া যায়। কোথাও কোনো জাতিস্মরের সন্ধান পাওয়া গেছে, কোথাও বা জনৈক অত্যাশ্চর্য ক্ষমতাধর ব্যক্তি আত্মবিকাশ করেছেন। কেউ বা অতীতের দূরূহ সব ঘটনাবলীর কথা অনর্গল বলে যেতে পারেন, কোথাও আবার ভবিষ্যদ্‌বাণী শুনতে জনসমাগম হয়। এমন ঘটনা অজস্র। আমাদের প্রত্যেকেরই এরকমের দু-চারটি ঘটনার কথা শোনার অভিজ্ঞতা আছে। অনুসন্ধানের পর বহুক্ষেত্রেই কিন্তু প্রকৃত ঘটনার চিত্রটি পাল্‌টে গেছে। এ জাতীয় ঘটনাকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় :

১. স্বাভাবিক ঘটনা : শুধু স্থান-কাল-পাত্রের পরিপ্রেক্ষিতে অলৌকিকতার চেহারা নিয়েছে।
২. অপপ্রচারিত বিকৃত সংবাদ।
৩. প্রতারণামূলক ঘটনা।

কয়েকটি বিশ্ববিখ্যাত অলৌকিক ঘটনা সংকলন করা হয়েছে এই নিবন্ধে। প্রথম ঘটনা দুটির বিবরণ *এন্‌সাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা*-র সর্বশেষ সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে জনমানসে ঘটনা দুটির ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হবার ফলে। তৃতীয়টি আব্রাহাম লিংকনের একটি বহুল প্রচারিত বিখ্যাত ঘটনার বিবরণ।

১. রোজমেরি ব্রাউন ছেলেবেলায় খানিকটা গানবাজনার চর্চা করেছিলেন। তারপর, বিয়ের পরে, সংসারের নানা ঝামেলায় গানবাজনা প্রায় ছেড়েই দিলেন। সময় কোথায়! এইভাবেই চলছিল জীবন। কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো হঠাৎ তাঁর স্বামী মারা গেলেন। তখন তিনি মধ্যবয়সী।

এই হলো শ্রীমতি ব্রাউনের জীবনের একটা পর্ব। আর পাঁচটা জীবনের মতো রোজমেরি ব্রাউনের জীবনটাও নিত্যনৈমিত্তিক চালে চলছিল। কটা লোকই বা ব্রাউনকে তখন চেনে!

হঠাৎ একদিন একটি বিরাট দাবি নিয়ে রোজমেরি ব্রাউন হাজির হলেন ব্রিটিশ দূরদর্শনের পর্দায়। তিনি জানালেন, বিখ্যাত সঙ্গীতকার বেটোভেন (Beethoven), ব্রাহ্‌মস (Brahms) এবং সুবার্ত (Schubert) স্বপ্নে দেখা দিয়ে তাঁকে বেশ কয়েকটি রচনা টুকে নিতে বলেন। যে সমস্ত সঙ্গীত জীবদ্দশায় তাঁরা সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি সেই সমস্ত সঙ্গীত মূর্ত হলো ব্রাউনের হাতে লেখা স্বরলিপিতে।

বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে দেখলেন স্বরলিপি। অনেকে এমনো বললেন যে, কেউ যদি বলত রচনাগুলি কোনো ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া গেছে তবে হাতের লেখা

ছাড়া অন্যকিছুই সন্দেহ উদ্রেক করত না। সঙ্গীতকারত্রয়ের নিজস্ব আবেগ এবং ব্যক্তিত্ব পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান এসব রচনায়।

রোজমেরি ব্রাউন অল্পদিনের মধ্যেই প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করলেন পশ্চিম দুনিয়ায়। দু-একজন সন্দেহবাতিকগ্রস্ত লোক প্রশ্ন করে ফেললেন, ভূত কি পৃথিবীর সমস্ত ভাষাই শিক্ষা করেছে? নইলে জার্মান সঙ্গীত রচয়িতা ইংরাজি ভাষায় শ্রীমতি ব্রাউনকে স্বরলিপির নির্দেশ দিলেন কিভাবে? কিন্তু এই সব ছোটো-খাটো সন্দেহ প্রকাশ জনগণের অন্তরের গভীরে প্রোথিত বিশ্বাসকে নাড়া দিতে সক্ষম নয়।

অতএব—'বুদ্ধিতে এর ব্যাখ্যা মেলে না।'

অথচ রোজমেরি ব্রাউন একদম সঙ্গীত জানতেন না এমন নয়। তিনি ঠিক কতদূর গভীরে সঙ্গীত চর্চা করেছিলেন তা-ও জানা নেই। সঙ্গীতে তাঁর কতটা অনুরাগ ছিল সেকথাও তিনি স্পষ্ট করে বলেন নি কোথাও, বিখ্যাত হবার লোভে অথবা দূরদর্শন কোম্পানির চাপে।

বিখ্যাত প্রাচীন চিত্রকরদের ছবি, যেমন মোনালিসা, বহুবার অনুকরণ করে আঁকা হয়েছে। মূল চিত্রকরের তুলির টানের বৈশিষ্ট্য পর্যন্ত অবিকল অনুকরণ করা হয়েছে। একাধিক মোনালিসা ছবিকে মূল ছবি বলে দাবিও করা হয়েছে। ভ্যানগগ্-এর *অপ্রকাশিত ছবি* এবং হিটলারের *অপ্রকাশিত ডায়েরি*-র কথাও আমরা জানি—যেগুলি পরে জাল বলে প্রমাণিত হয়েছে।

অতএব যত্ন নিয়ে অনুকরণ করলে, মূল ব্যক্তির কাজকে হুবহু অনুকরণ করা যায়। তাঁর আবেগ এবং ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন সমেত। রোজমেরি ব্রাউন নিজে অথবা অন্য কারো সহায়তায় এই কাজটিই সম্পন্ন করেছিলেন। বিখ্যাত হয়ে যাবার পর ব্রাউনের সঙ্গে অন্যান্যদের বনিবনায় চিড় ধরেছিল। তাই বেটোভেনও আর দেখা দেন নি রোজমেরি ব্রাউনের স্বপ্নে।

২. গত দশকের ঘটনা। চিকাগো শহর উত্তাল। সবার মুখেই একটি নাম—টেড্ সিরিও। একটি ফোটোগ্রাফিক ফিল্মের ওপর একটি আঙুল চেপে ধরলেন সিরিও। একজন দর্শক বললেন 'সংখ্যা ষোল'—অবাক কাণ্ড, ফিল্মের ওপর উঠে গেছে সংখ্যাটি। সংখ্যা ষোল।

টেড্ সিরিও যা ভাবেন, যা চিন্তা করেন, সবই তাঁর শরীর বেয়ে আঙুলের ডগায় চলে আসে। সেখান থেকে ছাপ ফেলে ফিল্মের ওপর। চিন্তা করল একটা হাতি, কাছে পিঠে কোনো হাতি নেই, অথচ হাতির ছবি উঠে গেল ফিল্মের ওপর।

এর নাম দেওয়া হলো থটোগ্রাফ।

বহু বিজ্ঞানী হাজির হলেন সিরিও-র দপ্তরে। দেখে তাঁরাও চমৎকৃত। এমন ঘটনা বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। বিজ্ঞানীরা অবশ্য ছোট্টো একটি অভিযোগ করেছিলেন, 'ইচ্ছেমতো অনুসন্ধানের সুযোগ তাঁদের দেওয়া হয় নি।'

দু-জন পেশাদার ফটোগ্রাফার বানচাল করে দিল সিরিও-র ব্যবসা। ভালোভাবে

পর্যবেক্ষণ করার পর তাঁরা কায়দাটা ধরে ফেললেন। নিজেরাই করে দেখালেন যা সিরিও দেখাচ্ছিলেন। [কায়দাটা অবশ্য ফটোগ্রাফারদ্বয়ও জানান নি পেশাগত গোপনীয়তা রক্ষার জন্য—যে কারণে আমরাও তা জানাতে পারলাম না।]

সিরিও-র ব্যবসায় ছেদ পড়ল।

৩. আব্রাহাম লিংকনের বিখ্যাত সেই গল্প। একটি স্বপ্ন দেখলেন লিংকন। একটি কফিনে শায়িত তাঁর মৃতদেহ। শিউরে উঠলেন। ঘুম ভেঙে গেল। উঠে ডায়েরিতে নোট রাখলেন লিংকন।

পরদিন সারা বিশ্ব চমকে উঠল একটি সংবাদে। একজন আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন আব্রাহাম লিংকন।

আব্রাহাম লিংকন আগেই জেনে ফেলেছিলেন পরদিন তিনি মারা যাবেন। তাঁর ডায়েরি অন্তত সে কথাই বলে। বুদ্ধিতে কি এর ব্যাখ্যা মেলে?

আব্রাহাম লিংকন স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁর মৃতদেহের। জৈব বিজ্ঞানী কেকুলে, শোনা যায়, কার্বনের গঠন কাঠামোর চিত্রটি প্রথমে দেখেন স্বপ্নে। অনেক ছাত্র স্বপ্নে এমন অংকও কষে ফেলে যা জেগে থাকা অবস্থায় সে পারে নি। কার্বনের গঠন কাঠামোর স্বপ্ন দেখাটা কেকুলের পক্ষেই সম্ভব। আব্রাহাম লিংকনের পক্ষে কার্বনের গঠন কাঠামোর স্বপ্ন দেখা অসম্ভব।

স্বপ্ন দেখাটা অনেকাংশেই নির্ভর করছে দর্শকের পেশা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর। আব্রাহাম লিংকন যে অবস্থায়, যে পরিস্থিতিতে, যে ধরনের কাজ করতেন, তাঁর পক্ষে আততায়ীর গুলিতে নিহত হবার স্বপ্ন দেখাটা কি সত্যিই আশ্চর্যের? এ-জাতীয় স্বপ্ন তিনি আগেও নিশ্চয়ই বহুবার দেখেছিলেন। বুদ্ধিতেই কি এসবের ব্যাখ্যা মিলছে না?

শঙ্কর ঘটক

নভেম্বর ১৯৮৪

অতীন্দ্রিয়, গণমাধ্যম ও আমাদের বিশ্বাস

'অলৌকিকতার প্রতি সন্দেহপ্রবণতা কখনই জনপ্রিয় হয় নি। অবশ্য, কোন্ মানুষই বা চায় না অলৌকিক ঘটনা ঘটুক? জনসাধারণ এমন সংবাদকে খুব কমই গ্রহণ করেছে যেখানে বলা হয়েছে যে ইউ. এফ. ও.-গুলো প্রায়শই অতি সাধারণ কতকগুলো পার্থিব ঘটনা অথবা বারমুডা ত্রিকোণ সাধারণ এক ফালি জল ছাড়া আর কিছু নয়। অপরপক্ষে, জনসাধারণ ক্রমাগত দাবি করে এসেছে আরো বেশি মাত্রার অপার্থিব এবং অবাধ লোমহর্ষক অলৌকিক কল্পকাহিনী। পরাবিজ্ঞান এই দাবিকে চরিতার্থ করে এসেছে অন্তহীন ঘটনাবলীর স্রোতের প্লাবন বইয়ে দিয়ে—জাপানি প্রেত-ছবি, এরিক ফন দানিকেনের প্রাগৈতিহাসিক নভশ্চর, ইমানুয়েল ভেলিকোভস্কির মহাকাশের বিলিয়ার্ড, জৈব স্পন্দন, অ্যামিটিভেলির আতংক, দেহাতীত অভিজ্ঞতা—ইত্যাদি ইত্যাদি।'

জন স্ল্যাডেক (John Sladek) *প্যারানর্মাল বর্ডারল্যাণ্ডস্ অফ সাইন্স* বইটির আলোচনার শুরুতেই কথাগুলি বলছেন।[১] বেশ কিছুদিন ধরে বাংলায় প্রকাশিত একটি পাক্ষিক পত্রিকায় অলৌকিক বিষয়বস্তুর ওপর বেশ কয়েকটি লেখাও প্রকাশিত হচ্ছে। কোথাও 'বিদেহী ডাক্তার' পরলোক থেকে এসে চিকিৎসা করছেন, কোথাও জনৈকা ভদ্রমহিলা প্ল্যানচেটের মাধ্যমে তাঁর মৃতা মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করছেন। একটি দৈনিক পত্রিকা কয়েক বছর আগে কলকাতার আলিপুর অঞ্চলের 'পুলিশ ভূত' আবিষ্কার করেছিল। এরকম নানা কাহিনী। এই 'পুলিশ ভূত' নিয়ে *উৎস মানুষ* পত্রিকা গোষ্ঠী তদন্ত করে দেখেছেন যে পুরো খবরটাই ভুয়া। সেই তদন্তের ব্যাপারটি কিন্তু খুব সহজ নয়। এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তদন্ত করাও সম্ভব নয়; অর্থের প্রয়োজন, সময়ের প্রয়োজন, লোকবলের প্রয়োজন, আর অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজন প্রভাবশালী ব্যক্তির সাহায্য। এই সমস্ত অসুবিধা এবং প্রতিকূল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে এইসব সুযোগ-সন্ধানী ব্যবসায়ীরা মিথ্যের বেসাতি নিয়ে বসেছে। উদ্দেশ্য সহজেই অনুমান করা যায়। এইসব পত্র-পত্রিকাগুলোর বেশ বড়ো রকমের চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে বাজারে। আমরা লোমহর্ষক অলৌকিক কাহিনী চাই বলেই এঁরা তা দেয়। আমরা সে-সব বিশ্বাস করতে চাই বলেই যথাসম্ভব বিশ্বাসযোগ্য করেই তাঁরা তা পরিবেশন করেন।

কয়েক মাস আগে 'সংস্কারমুক্ত' একজন বিজ্ঞানী কথা প্রসঙ্গে আমাকে বললেন—'টেলিপ্যাথি সম্ভব।'

'টেলিপ্যাথি সম্ভব কিভাবে? আমাদের যে পাঁচটা ইন্দ্রিয় আছে, তার কোনোটারই তো টেলিপ্যাথি করার ক্ষমতা নেই।'

তিনি আমার চোখের সামনে একটি ছাপানো বই খুলে ধরলেন। প্যারিসে ছাপানো

একটি আন্তর্জাতিক পত্রিকা। স্পষ্ট করে লেখা, 'এমন টেলিপ্যাথি যোগাযোগের খবর পাওয়া গেছে যেখানে প্রেরক এবং গ্রাহক ব্যক্তির মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান ২৩ কিলোমিটার। অপর আরেকটি ক্ষেত্রে এই দূরত্ব বাড়িয়ে করা হয়েছে ৭২ কিলোমিটার। তিন হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত দূরত্বের ব্যবধানে টেলিপ্যাথি যোগাযোগও সম্ভব হয়েছে।'

বিজ্ঞানের পত্রিকা, এ কোনো আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত মনোরঞ্জনের পত্রিকা নয়। অতএব চট্ করে কিছু বলাও সম্ভব নয়। তাহলে কি আমারই চিন্তায় গলদ ছিল কোথাও!

সেই বিজ্ঞানী ভদ্রলোক বেশ খবর রাখেন। তিনি এবারে সুযোগ বুঝে আমায় বুঝিয়ে দিলেন, ইন্দ্রিয়াতীত উপলব্ধির ব্যাপারটা। বললেন, 'এরকম অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির ব্যাপারটা কিন্তু আজ আর অস্পষ্ট নেই। টেলিপ্যাথি নিয়ে পরীক্ষা হয়েছে, হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা হলে বলা যেত কাকতালীয় ব্যাপার, কিন্তু...'

তিনি আরেকটি পত্রিকা দেখালেন আমায়। *সানডে মিরার*, ইংরাজী পত্রিকা। প্রতি রবিবার লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। তাতে লেখা, 'অতলান্ত সাগর পেরিয়ে টেলিপ্যাথির যোগাযোগ!' খবরটা এরকম : মোট দুটি পরীক্ষার আয়োজন করেছিল *সানডে মিরার* পত্রিকার কর্তৃপক্ষ। প্রথমটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭৩ সালের ১০ ডিসেম্বর এবং দ্বিতীয়টি ১৯৭৪ সালের জুন মাসে। লণ্ডনের মণ্টকাম হোটেলে বসে একজন লোক যা চিন্তা করছে নিউ ইয়র্কে অন্য একজন লোক তা বলে দিচ্ছে, একই সময়ে।

বিজ্ঞানী বন্ধুটি বেশ আবেগ মথিত স্বরে বললেন, 'এ তো পাশাপাশি ঘরে বসে টেলিপ্যাথি করা নয় যে, জালিয়াতির আশ্রয় গ্রহণ করেছে! একে কী বলা যাবে বল?' ওনার কাছ থেকেই জানা গেল *সানডে মিরার* পত্রিকায় ডিসেম্বর ১৯৭৩ সাল থেকে জুলাই ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত এই খবরটি নানাভাবে বহুবার ছাপা হয়েছে। আর আমাদের দেশের পত্রপত্রিকাতেও এ খবর বেরিয়েছে। অবস্থাটা এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেছে যে, টেলিপ্যাথির সম্ভাব্যতা নিয়ে এখন আর নাকি কেউ সন্দেহ প্রকাশ করে না।

খবরটা জানার পরে একটু থমকে গেলাম। একটু খবর-টবর নিয়ে অবশ্য দেখা গেল ঘটনাটা যেভাবে ছাপা হয়েছে ঠিক সেভাবে ঘটে নি। *সানডে মিরারে* যে-সংক্ষিপ্ত সংবাদটি ছাপা হয়েছিল তাতে সত্যের অপলাপ করা হয়েছিল বলে ধারণা হলো আমার। সম্পূর্ণ ঘটনাটি জানা গেল *নিউ সাইণ্টিস্ট* পত্রিকার একটি সংখ্যা৩ থেকে।

সানডে মিরার-এর টেলিপ্যাথির পরীক্ষা

সানডে মিরার আয়োজিত পরীক্ষাটিতে লণ্ডন অফিসে ছিলেন ঐ পত্রিকার দূরদর্শন সম্পাদক ক্লিফোর্ড ডেভিস, সিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থার এলিসন, *সানডে মিরারের*

বিজ্ঞান সম্পাদক রোনি বেডফোর্ড, *নিউ সাইন্টিস্ট* পত্রিকার পক্ষ থেকে ডক্টর ক্রিস্টোফার ইভান্স্ এবং ডক্টর যোশেফ হ্যান্লন্। এছাড়া আরো দু-চারজন বিজ্ঞানী, ডজন খানেক দর্শক এবং সাংবাদিক। আর নিউ ইয়র্ক অফিসে ছিলেন অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাধর সেই ব্যক্তি তাঁর একজন সহকারী এবং *মিরারের* একজন প্রতিনিধি সিড্নি ইয়াং। *সানডে মিরার* অফিসের সঙ্গে নিউ ইয়র্কের সরাসরি টেলিফোন যোগাযোগ স্থাপন করা হলো। পরীক্ষাটি চলেছিল প্রায় দু-ঘণ্টা ধরে।

দু-ঘণ্টায় কী ঘটেছিল

লণ্ডনের অফিস ঘরে সমবেত জনতা। *নিউ সাইন্টিস্ট* পত্রিকার পক্ষ থেকে একতাড়া সিল করা খাম টেবিলের ওপর রাখা হলো। খামের ভেতরে কি আছে তা একমাত্র *নিউ সাইন্টিস্ট*-এর প্রতিনিধিরাই জানতেন। সেই একগুচ্ছ খামের মধ্য থেকে একটি খাম তুলে নেওয়া হলো। সেই খামটিকে রাখা হলো টেবিলের ওপর। বাকিগুলো সরিয়ে ফেলা হলো দূরে।

খামটি খুলে দেখা গেল তাতে একটি ছবি আছে। ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে একটি পুলিশের গাড়ি, যার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন একজন পুলিশ অফিসার।

লণ্ডন অফিসে টেলিফোন ধরে বসে আছেন আর্থার এলিসন। এখানে আর্থার এলিসনের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচিতি আবশ্যক। আগেই বলা হয়েছে ইনি সিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। এনার 'অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা'য় অগাধ বিশ্বাস এবং ইনি 'সোসাইটি ফর সাইকিক্যাল রিসার্চ'—যাদের প্রধান কাজ 'অতীন্দ্রিয়বাদ' প্রচার করা—তার পরিচালন সমিতির সভাধ্যক্ষ।

ছবিটিকে টেবিলের ওপর রেখে সমবেত সকলেই তার ওপর মনঃসংযোগ স্থাপন করলেন। অন্যপ্রান্তে নিউ ইয়র্ক অফিসে টেলিফোনের সামনে চিন্তামগ্ন টেলিপ্যাথিকারক।

তিনি জানেন না হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে *সানডে মিরার* অফিসের একটি ঘরের টেবিলের ওপরে কী ছবি রাখা আছে। তাই তিনি চিন্তামগ্ন, টেলিপ্যাথি করছেন তিনি।

টেলিফোনের কথোপকথন

এলিসনের সঙ্গে টেলিপ্যাথিকারক ব্যক্তির যোগাযোগ স্থাপিত হলো। যোগাযোগ স্থাপন করার পরেও দীর্ঘ সময় ছিল নীরবতা। অধৈর্য হয়ে এলিসন সাহেব ফোনের মাধ্যমে টেলিপ্যাথিকারককে উৎসাহিত করার চেষ্টা করলেন।

—'এখন তুমি তোমার মনশ্চক্ষে কী দেখতে পাচ্ছো?' এলিসনের প্রশ্ন।

—'আমি সারাক্ষণই তিনটি ছবি দেখতে পাচ্ছি।'

—'ঠিক কী ধরনের ছবি তুমি দেখতে পাচ্ছ বল তো? আমাদের ছবির সঙ্গে তার মিল আছে কিনা দেখি!'

অপর-পক্ষ নিরুৎসাহ। এরপর কুড়ি মিনিটের দীর্ঘ নীরবতা। তারপর নিউ ইয়র্কের প্রান্ত থেকে একটা হতাশ-ক্লান্ত স্বর ভেসে এল, 'আমি ক্লান্ত! আমি অত্যন্ত ক্লান্ত!'

এলিসন কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন, 'এত তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড় তুমি আজকাল! একটু ঠিক হয়ে বসো। বসে ভাবো।' ভেবে বল দেখি আমরা যখন ছবিটির দিকে তাকিয়ে ছিলাম, মনঃসংযোগ স্থাপন করেছিলাম ছবিটির ওপর, তখন তোমার মনে ঠিক কী ধরনের আকৃতি ভেসে উঠেছিল।'

—'একটা সাদা আস্তরণের ওপর তিনটি মানুষের ছবি। তারপরে এল একটা লম্বাটে বস্তু, আর তারপর...'

কথাটি শেষ করার সুযোগ পেলেন না তিনি। তার আগেই বক্তাকে মাঝ পথে থামিয়ে দিয়ে এলিসন উৎসাহভরা গলায় চিৎকার করে উঠলেন, 'ঠিক, ঠিক, ঐ লম্বাটে ধরনেরই কিছু! বলে যাও।' লক্ষণীয়, এখানে কিন্তু এলিসন মোটেই নিরপেক্ষ থাকলেন না। গাড়ির যে ছবিটি ছিল সেটির গড়ন কিন্তু লম্বাটেই। তবে এই সংকেতেও বিশেষ কাজ হলো না। লম্বাটে গড়নের বহু বস্তুই যে পৃথিবীতে আছে।'

—'আমি দেখছি—একটা কুকুর, একটা ঘোড়া আড়াআড়ি দাঁড়িয়ে।' কোনো রকম উৎসাহই এ প্রান্ত থেকে না পাওয়ায় ও প্রান্ত এবার থেমে গেল। বিষয় পরিবর্তন করল সে, 'একটা ত্রিকোণ ছবি যার বাঁ দিক থেকে একটা অর্ধবৃত্ত—একটা পর্বত—একটা কিছু বেরিয়ে আসতে চাইছে যেন।' তবুও কোনো সাড়া নেই এলিসনের দিক থেকে। শেষ পর্যন্ত উত্তেজনায় ফেটে পড়ল সে, ...'একটা আকার, ঘোড়া, জন্তু...কুকুর...কুকুর...কুকুর।'

এবারেও এলিসনের কাছ থেকে কোনো উৎসাহ পাওয়া গেল না। কুকুরের সঙ্গে ছবিটির বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য নেই যে। টেলিপ্যাথিকারক কিন্তু ইতিমধ্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে, 'দেখুন তো ঘরে কোনো কুকুরের ছবি আছে কি না?'—খোঁজ, খোঁজ—কিন্তু না ত্রিসীমানায় কোনো কুকুরের ছবি পাওয়া গেল না। কাছে-পিঠে কোনো কুকুরও নেই। হায়!

এলিসন এবারে শেষ চেষ্টা করলেন, 'কোনো লম্বা কিছুর কথা বলছিলে না তুমি?' টেলিপ্যাথিকারক ব্যক্তিটিও ইতিমধ্যে বুঝে গেছে অহেতুক উত্তেজনা বাড়িয়ে লাভ নেই। তার থেকে এলিসনের কথা শোনাই ভালো। সোৎসাহে উত্তর দিল সে, 'সব চাইতে উজ্জ্বল আর স্পষ্ট যে ছবিটা আমি দেখেছি?'

'ঠিক তাই। তার কথা বল।'

'একটা চওড়া মতন লম্বা কোনো বস্তু। উজ্জ্বল তার বর্ণ।'

'খুব ভালো। বলে যাও।'

'টেবিল, ফুল, টেলিফোন...'

এলিসনের দিক থেকে কোনো সাড়া না পাওয়ায়, কোনো উৎসাহ না পাওয়ায়, ও প্রান্তের গলা হঠাৎ থেমে গেল। মিনিট পাঁচেক নীরবতা। তারপর ও প্রান্ত থেকে শোনা গেল *নিউ সাইন্টিস্টের* প্রতিনিধি সিডনি ইয়াং-এর গলা।

—'ও একটা ছবি আঁকছে। ছবিটা একটা গাড়িরও হতে পারে আবার একটা শুকর ছানারও হতে পারে।'

এলিসন আবার উৎসাহিত, 'চালিয়ে যেতে বলুন।'

—'ছবিটা এবারে একটা অদ্ভুত বাঁক নিয়েছে। ছেলেদের কাঠের খেলনার মতো। অনেকটা গাড়ির মতো, অনেকটা শুকর ছানার মতো, চাকা-টাকা নেই, পা-ও নেই। গোলাকার।'

—'অনেকটাই সফল হয়েছে সে। আপনি বলে যান।' এলিসন উদ্ভাসিত।

—'এবারে ছবিটা একটা থালার চেহারা নিয়েছে। সেটার থেকে একটা কিছু নেমে আসছে যেন, হাতির পায়ের মতো। এবারে ছবিটাকে দেখাচ্ছে একটা স্তনের মতো কিছু।'

এলিসন হেসে ফেললেন, 'না-না ওসব কিছু নয়।'

ইতিমধ্যে ছবি আঁকা শেষ। টেলিপ্যাথিকারক জানতে চাইল আসল ছবিটি কিসের। এলিসন জানালেন, 'ওটা একটা পুলিশের গাড়ির ছবি।'

ও প্রান্তের টেলিফোনে উত্তেজনায় ফেটে পড়ল টেলিপ্যাথিকারক। 'গাড়ি গাড়ি গাড়ি। এই দেখ কতবার কথাটা আমি লিখেছি। গাড়ির কথাটাই আমার মনে এসেছে সবার আগে। একটা উজল লম্বাটে গাড়ি।'

প্রতিবেদন

যোশেফ হ্যানলন লিখছেন৩, 'গাড়ির কথাটা সে একবারও উচ্চারণ করে নি। সে একটা ছবি এঁকেছে যেটা একটা জন্তুর, একটা টেবিলের, একটা পর্বতের অথবা পৃথিবীর যে কোনো বস্তুর বলে দাবি করা যেতে পারে। ছবিটি একটা হাতিরও হতে পারে একটা স্তনেরও হতে পারে।' অথচ সেই ব্যক্তি উচ্চকণ্ঠে দাবি করে বসলেন— 'আমি খুশি, কারণ আমি সফল হয়েছি ছবিটি দেখতে।' এলিসন জানালেন, 'পরীক্ষাটিতে অভাবনীয় সাফল্য দেখা গেছে।'

সংবাদপত্রে সংক্ষিপ্ত সমাচার[২]—'অতলান্ত সাগর পেরিয়ে টেলিপ্যাথির যোগাযোগ।' সংবাদপত্র থেকে আমরা জানলাম শুধু এটুকু। ওপরে সংগৃহীত অংশটুকু থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে, আসল ঘটনা কিভাবে সংবাদপত্রে মুদ্রিত হয়ে জনসাধারণকে ভুল দিকে পরিচালিত করেছে। যে কোনো প্রতিবেদনে প্রত্যক্ষদর্শীর সঠিক বর্ণনার প্রয়োজন। প্রয়োজন সমগ্র ঘটনাটির প্রতিটি খুঁটিনাটির সৎ বিবরণ। বর্ণিত ঘটনাটি থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, প্রথমত এলিসনের সক্রিয় সহায়তা না পেলে টেলিপ্যাথিকারক ব্যক্তিটি কোনো কিছুই আন্দাজ করতে পারত না। দ্বিতীয়ত এত সহায়তা সত্ত্বেও প্রকৃত ছবিটির বর্ণনা দিতে সে ব্যর্থ হয়েছে। তৃতীয়ত তাঁর আঁকা ছবিটি প্রকৃত অর্থে অর্থহীন হয়েছে। সর্বোপরি সাংবাদিকের অসৎ কলমে সম্পূর্ণ ঘটনাটির একটি অসত্য ও বিকৃত চিত্র পরিবেশিত হয়েছে।

যোশেফ্ হ্যানলন সম্পূর্ণ ঘটনাটি প্রকাশ করে দেবার পরে কিন্তু কোনো মহল থেকেই কোনো রকম প্রতিবাদ শোনা গেল না। কিন্তু মস্ত বড়ো ফাঁক থেকে গেল একটা জায়গায়। টেলিপ্যাথির সাফল্যের খবরটা প্রকাশিত হয়েছিল একটি বহুল প্রচলিত জনপ্রিয় পত্রিকায় এবং জনসাধারণের চাহিদা পূরণের জন্য অন্যান্য পত্র-পত্রিকাতেও বিষয়টিকে প্রচারের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ডক্টর হ্যানলনের প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছিল একটি বিজ্ঞান পত্রিকায়, যার প্রচার পূর্বোক্ত পত্রিকাগুলো থেকে অনেক কম; এবং জনসাধারণ এই খবরটিকে মোটেই পছন্দ করবে না এই অজুহাতে অন্যান্য পত্র-পত্রিকাও এ ব্যাপারে নীরব রইল। ফাঁকটা কিন্তু আর ভরাট হলো না। জনসাধারণের বিরাট অংশ 'টেলিপ্যাথি সম্ভব' এই ধারণা নিয়ে মহানন্দে রইল। আমার সেই বিজ্ঞানী বন্ধুটিকে সমস্ত কাগজপত্র দেখালাম, *নিউ সাইন্টিস্ট* পত্রিকাটির জেরক্স কপি পড়তে দিলাম। তারপর, কিছুদিন পরে তিনি আবার এলেন আমার কাছে। 'সব পড়লাম। কিন্তু, ডক্টর হ্যানলন্ যে সত্যি কথা বলেছেন, তার প্রমাণ কী?'

'কোনো প্রমাণ নেই।' আমার একমাত্র উত্তর। 'কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে, যদি কোনো অভিযোগের প্রত্যুত্তর না পাওয়া যায়, অর্থাৎ যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি যদি সে অভিযোগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না জানান, তাহলে অভিযোগটিকে সত্যি বলেই ধরা হয়ে থাকে। ডক্টর হ্যানলনের লেখার কোনো প্রতিবাদ হয় নি।'

তর্কের শেষ নেই। তিনি বললেন 'কি করে জানলে? পৃথিবীর সব কাগজ কি তুমি খুঁজে দেখেছ?'

আমি নিরুপায়। কারণ আমার বিজ্ঞানী বন্ধু টেলিপ্যাথিতে বিশ্বাস করে আনন্দ পান। অতএব....

১৯৭৩ সালের ২৫ নভেম্বর এবং ঠিক তার পরের রবিবারের অর্থাৎ ডিসেম্বরের ২ তারিখে *সানডে টাইম্‌স্* পত্রিকা দুটো হাতে দিলাম। পত্রিকাটির বিজ্ঞান সাংবাদিক ব্রায়ান সিলককের দুটি প্রতিবেদন দুটো কাগজে প্রকাশিত হয়েছে।

২৫ নভেম্বরের সংখ্যায় তিনি লিখেছেন, 'গতকাল ট্যাক্সিতে লণ্ডন বিমান বন্দরে

যাবার সময় ইউরি গেলার আমার অফিসের দেরাজের চাবিটিকে স্পর্শ না করেই বেঁকিয়ে ফেললেন। সে সময় ফটোগ্রাফার ব্রায়ান ওয়ারটোনের হাতের তালুর ওপর চাবিটি রাখা ছিল। আমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম।'

প্রতিবেদনটি পড়ার পরে বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ঘটানাটি কি বিশ্বাসযোগ্য?'

'হতেও তো পারে! প্রকৃতির কতটুকু আমরা জানি বল! তা ছাড়া ওরকম একটা কাগজ কি মিথ্যে কথা লিখবে?'

'মিথ্যে কথা নয়, লিখেছে সত্যি কথাই। শুধু একটু আধটু কাটছাঁট করে, এই যা।'

'কি করে তুমি বুঝলে?'

অতঃপর ২ ডিসেম্বর সংখ্যাটি তার হাতে তুলে দিলাম। সেখানে সিলকক লিখছেন, 'দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ বিষয় আমি লক্ষ করি নি। প্রথমত গেলার চাবিটা তাঁর হাতে নিয়েছিলেন এবং দ্বিতীয়ত যখন চাবিটা বাঁকা অবস্থায় পাওয়া যায় তখন ওয়ারটোনের হাত ছিল মুঠো করা। গেলার ভালোভাবে চাবিটাকে পরীক্ষা করে তারপর ওয়ারটোনের হাতে দেয়। ওয়ারটোন দু-হাতের তালুর ভেতরে চাবিটাকে রাখে। তারপর গেলার দু-হাত দিয়ে ওয়ারটোনের দুটি হাত চেপে ধরে। হাত সরালে দেখা যায় চাবিটা সামান্য বাঁকা। অনেক ভাবার পর আমি বাধ্য হলাম একথা স্বীকার করতে যে, কোনো না কোনো কৌশল এর ভেতর ছিল। গেলার যখন চাবিটি হাতে নেয় তখনই সে আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে কোনো কৌশল করে চাবিটি বেঁকিয়ে ছিল।'

পড়ার পর বন্ধুকে বললাম,'২ ডিসেম্বরের সংখ্যাটি হাতে না পেলে আপনার ধারণাটি কেমন হতো।'

বিজ্ঞানী বন্ধুটি কিন্তু বিশেষ খুশি হলেন না। তাঁর কল্পনার রাজ্যে এই ওলোট পালোট হাসি মুখে মেনে নিতে তিনি অপারগ। একটু ভেবে নিয়ে বললেন,'যোশেফ হ্যানলন যে সত্যি কথা বলেছেন এ ঘটানাটি কি সেকথা প্রমাণ করে?'

আমি হেসে ফেললাম, 'না, তা অবশ্যই করে না।'

মনে পড়ে গেল আমেরিকা থেকে প্রকাশিত *উৎস মানুষ*-এর সমধর্মী পত্রিকা *দ স্কেপটিক্যাল ইনকোয়ারার* সম্পর্কে জন সেলডেকের মন্তব্য,'১৯৭৭সাল থেকে একটি প্রচলিত ফ্যাসান বিরুদ্ধ পত্রিকা *দ স্কেপটিক্যাল ইনকোয়ারার* এই সব জালিয়াতির মহাপ্লাবনের বিরুদ্ধে একাকী সাঁতরে চলেছে!'

***

লন্ডন টাইম্‌স পত্রিকা থেকে একটি নিবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে কলকাতার *দ স্টেটসম্যান* পত্রিকায়[৪]। সেই নিবন্ধ থেকে জানতে পারা গেল, পাশ্চাত্যের শতকরা ৭০-৮০ ভাগ মানুষ অতীন্দ্রিয় ভাবনায় বিশ্বাসী। প্রাচ্যের হিসেব জানা নেই কিন্তু সন্দেহ হয় সংখ্যাটি সেখানে কিছুটা বেশিই হবে। সাধারণ বিজ্ঞান না জানা মানুষের

সঙ্গে বিজ্ঞান জানা মানুষও সেই দলে আছেন। আছেন পেশাদার বিজ্ঞানী। তাঁদের বিশ্বাসই সাধারণ মানুষের বিশ্বাস আর চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এর সাথে ব্যবসাদারী মনোবৃত্তি আর জালিয়াতির মিশ্র ধূম্রজালের কুয়াশা দৃষ্টিপথকে করে তোলে অস্বচ্ছ। এই কুয়াশাচ্ছন্ন রাস্তা ধরেই এগোতে হচ্ছে আমাদের।

উল্লেখপঞ্জী :

১. John Sladek, *New Scientist*, Vol. 91, No. 268, p. 547 (1981)

২. S. Krippner, *Impact of Science on Society*, Vol.24, No.4, p. 339 (1974)

৩. J. Hanlon, *New Scientist*, 17 Oct. 1974

৪. *The Statesman* (Calcutta), 25, 26 March, 1984

শঙ্কর ঘটক

অক্টোবর ৮৬

অলৌকিক ক্ষমতা বনাম বৈজ্ঞানিক ক্ষমতা

"বিশ্বাস হারিয়েছেন?... তাহলে পাগলা বাবা আছেন যে কোন সমস্যার সমাধানের জন্য। ভারত বিখ্যাত তান্ত্রিক (বারাণসী)..."। দাড়ি-গোঁফ আর লম্বা চুলওয়ালা 'পাগলাবাবা'র বিজ্ঞাপন কে না দেখেছেন পত্রপত্রিকার পাতায়। তাঁর সামনে গিয়ে বসলেই নাকি তিনি সাদা কাগজে আপনার মনের প্রশ্ন বা দুশ্চিন্তাটি লিখে জানিয়ে দেবেন, স্রেফ মুখ দেখে— কোন্ এক 'অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা' বলে। তারপর সমাধানের উপায়ও বাত্‌লাবেন।

বারাসাত লাইনের কামদেবপুরের পীরবাবার আশীর্বাদ-পুষ্ট 'অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাধর' চিকিৎসক সুর্যকুমার-এর কথাও জানেন বহুজন। চিত্রতারকা সুচিত্রা সেনের লিউকিমিয়া ভালো করে দেওয়ার গুজবও রয়েছে। এই ব্যক্তি তাঁর গুরু গোরাচাঁদ পীরের সমাধির ওপর বসে (ছোটো একটি ঘর) দরজা বন্ধ করে দেন। বাইরে এক এক করে দর্শনার্থীরা এসে বসেন। ভেতর থেকে ভরাবিষ্ট 'ফকিরবাবা' দর্শনার্থীর রোগশোক বা সংকটের কথা নিজ থেকেই বলে যান।

নৈহাটি লাইনের ভাটপাড়ায় আছেন নামজাদা 'অলৌকিক চিকিৎসক' অমিয় ভট্টচার্য। প্রচুর পসার। রোগী বা সংকটাপন্ন মক্কেলকে নিজে না গেলেও চলে, তার একটি ফটোই যথেষ্ট। সে অন্য শহর,অন্য রাজ্য বা অন্য দেশে থাকলেও কিছু এসে যায় না। মক্কেলের ফটোগ্রাফের ওপর ওলোন-দড়ির মতো একটি তামার টুকরো ঝুলিয়ে 'ডাউজিং' (উপলব্ধি দিয়ে অনুসন্ধান) করে সমস্যার কারণ বা উৎস বুঝে ফেলেন কোন্ এক অজ্ঞাত ক্ষমতায়। তারপর ইলেকট্রনিক বক্স-এ 'কালার হান্টিং' করে দুরবর্তী ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ 'ভাইব্রেটার' যন্ত্রের সাহায্যে। এলাহি ব্যাপার। প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানকে টেক্কা দিয়ে ডাক্তার (?) ভট্টাচার্যের ফটোথেরাপি বা রেডিও-এসথেসিয়া টেকনিকের ব্যবসা চলে।

কোন্ এক প্রথম শ্রেণীর দৈনিকে দেখেছিলাম টেলিফোনে সমস্যামোচনের 'অব্যর্থ' উপায়ের বিজ্ঞাপন। সেই অলৌকিক ক্ষমতার ব্যক্তি টেলিফোনের মাধ্যমেই তড়িৎ-তরঙ্গ পাঠিয়ে দিয়ে সমস্য মিটিয়ে দেবার দাবি করেন। সাউণ্ড থেরাপি আর রে-থেরাপি-র গুরুগম্ভীর বক্তৃতাও দিয়ে ফেলেন তিনি কাগজের পাতায়।

"সব জ্যোতিষী বারবার অমৃতলাল একবার"— দেখেছেন না রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিরাট হোর্ডিং? তিনি মেটাল ট্যাবলেটের জনক। বিভিন্ন ধাতুর রাসায়নিক প্রভাব ও কেমোথেরাপিক এফেক্ট্ মেশানো ওই মেটাল ট্যাবলেট কি করে জানি মানুষের শরীরের দুষ্ট গ্রহের অনিষ্টকারী প্রভাব ঠেকিয়ে দেবে—পাঁচ আঙুলে দশটা বড় রত্ন ধারণ করতে হবে না।

অলৌকিক ক্ষমতাধর সাঁইবাবা, রজনীশ, বালক ব্রহ্মচারী, আনন্দময়ী মা—

এনাদের কীর্তিকলাপের ব্যাখ্যাতেও আসে সেই অতীন্দ্রিয়বাদের কথা। ধরা ছোঁয়া যাবে না, মাপা যাবে না, বিজ্ঞানের নিয়মকানুন দিয়ে সমর্থনও মিলবে না। দর্শন, শ্রবণ, স্বাদগ্রহণ, ঘ্রাণ আর স্পর্শ, এই ইন্দ্রিয়গুলির বোধ যে কোনো সুস্থ সাধারণ মানুষের আওতার মধ্যে থাকে। তাই কোনো অদ্ভুত, অলৌকিক, অতি-প্রাকৃত ঘটনার সমর্থনে যদি কারুর অতি-ইন্দ্রিয় ক্ষমতার কথা বলা যায় কৌশলে ও সাজানো পরিবেশে তাহলে সাধারণ মানুষের সম্ভ্রম, বিভ্রম, সমীহ, অন্ধবিশ্বাস আদায় করা খুব কঠিন হয় না।

এই অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার ধোঁয়াটে জগৎটা এমনই ব্যাপক ও বিপুল সংগঠিত যে শুধু আমাদের দেশ কোন্ ছার, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই অতীন্দ্রিয় শক্তির প্রদর্শন আর, 'বিজ্ঞান-সুবাসিত' তরঙ্গের মাধ্যমে দূর-যোগাযোগের বিচিত্র অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের বিস্তর খবর পাওয়া যায়। বছর খানেকের মধ্যেই একাধিক বিদেশী খবরের কথা আপনার মনে পড়বে যেখানে 'উইল পাওয়ার' বা ইচ্ছাশক্তি দিয়ে (কোনো ওষুধ-বিষুধ বা অন্য কোনো প্রত্যক্ষ বস্তু প্রয়োগ ছাড়াই) রোগ সারিয়ে দিচ্ছেন এক পোলিশ রমণী; কিংবা তীব্র মনঃসংযোগে ইচ্ছাশক্তির তরঙ্গ নিক্ষেপ করে টেব্‌লের ওপর সিগারেট দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন (স্পর্শ না করেই) এক আমেরিকান। আর একটু অতীতে চোখ ফেরালে তো অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার দাবিদারদের হদিশ মিলবে অগুণতি।

১৮৭০-৭৫ সাল নাগাদ রুশ মহিলা মাদাম ব্লাভাৎস্কির অলৌকিক শক্তির কথা প্রচারিত হচ্ছিল দেশে-বিদেশে, বিস্মিত বিমোহিত হচ্ছিল হাজার হাজার মানুষ। [দ্র.— বর্তমান গ্রন্থের সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের *মৃতদের সঙ্গে কথোপকথন* নিবন্ধ, পৃ ১৬]... বিশ্বখ্যাত বিবর্তনবাদী রাসেল ওয়ালেস, পদার্থ বিজ্ঞানী উইলিয়ম ক্রুকস্ (উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে) আত্মা ও পরলোকচর্চার প্রবক্তা হয়েছিলেন; অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় এই বিজ্ঞানীরাও প্রবল বিশ্বাসী ছিলেন—অদৃশ্য-আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ ও অন্যান্য অতি-প্রাকৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন তাঁরা।

আর একটু আধুনিক যুগে এগিয়ে আসি যদি তাহলেই মনে পড়বে চমক-নায়ক ইউরি গেলারের কথা। ইজরায়েলি ম্যাজিশিয়ান গেলার ক্রমশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল দারুণ অতীন্দ্রিয় শক্তির অধিকারী রোমাঞ্চকর পুরুষ। অতিলৌকিক উপলব্ধি আর কেন্দ্রীভূত ইচ্ছাশক্তি দিয়ে অজস্র বিচিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে আমেরিকা তথা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ঝড় তুলেছিল গেলার এই শতাব্দীরই সত্তরের দশকে। [দ্র.— বর্তমান গ্রন্থের শঙ্কর ঘটকের *সুনিপুণ জালিয়াতি* নিবন্ধ, পৃ...।] বিজ্ঞানীদের চ্যালেঞ্জ জানাতেও সাহসী হয়েছিল সে। .... চল্লিশের দশকের ব্রিটিশ গণিতবিদ এস.জি. সোয়ালকেও দেখা গেছে ইন্দ্রিয়-বর্হিভূত এক শক্তির উমেদারি করতে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে সোয়াল তো পরামনোবিদ্যাকে (Parapsychology) রীতিমতো মর্যাদার আসনে তুলে দিয়েছিল সে সময় (যদিও সাম্প্রতিককালে সে আসন ধ্বসে পড়েছে সোয়ালের জালিয়াতির তথ্য প্রকাশ হওয়ার কারণে)।

এই সত্তর দশকেই (১৯৭৩-৭৪) বিখ্যাত ইংরাজী পত্রিকা *সানডে মিরার* প্রকাশ করল এক চমকে দেওয়া দূর যোগাযোগ (টেলিপ্যাথি) পরীক্ষার খবর যেখানে লন্ডন আর নিউ ইয়র্কের মধ্যে মনের শক্তি বা 'মনঃসংযোগ ক্ষমতা' দিয়ে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছিল। আধুনিক যুগে অতীন্দ্রিয় শক্তির অন্যতম প্রবক্তা আর্থার এলিসন ছিলেন নাটের গুরু । [দ্র.— বর্তমান গ্রন্থের শঙ্কর ঘটকের *অতীন্দ্রিয় গণমাধ্যম ও আমাদের বিশ্বাস*, নিবন্ধ, পৃ ২৩]

ফর্দ বাড়াতে থাকলে আর শেষ হবে না। আপাতভাবে ব্যাখ্যাহীন, চমক লাগানো ঘটনার সংবাদ যেমন রয়েছে অজস্র তেমনি রয়েছে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের আস্ফালনের খবর। কিন্তু এসবের সত্যতা কতটা? সত্যিই কি এমন সব ক্রিয়াকাণ্ড করা যায়, অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা বিজ্ঞানের ওপর টেক্কা দিতে পারে? এই স্বাভাবিক প্রশ্নগুলির উত্তর আসে সরাসরি তদন্ত , পরীক্ষা আর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে। গোড়া থেকেই ধরা যাক্। 'বিশ্বাস-এর আধার' পাগলা বাবা-র নাগের বাজারের অফিসে গিয়েছিলেন আমাদের এক বন্ধু বাবা-র ক্ষমতার পরিচয় নিতে। তার সব বিশ্বাস একদিনেই ভেঙে গেছে ফাঁকিবাজীর ভোঁতা কৌশল দেখে। [দ্র.—বর্তমান গ্রন্থের রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারীর *অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা* নিবন্ধ, পৃ ৯] কামদেবপুরের ফকিরবাবা-র চালাকি সম্পর্কে ইদানিং অনেক কথাই শোন যায়; মাইনে করা দালালরা কৌশলে খবর পাচার করে— এমন কথাও অনেকে বলেন। হাতেনাতে প্রমাণ না মিললেও 'বাবা'র অলৌকিক ক্ষমতায় সন্ধিহান অনেকেই। ... ভাটপাড়ার ডাক্তার (?) ভট্টাচার্যের চেম্বারে আমরা রোগী সেজে গিয়ে দেখেছি চর্তুদিকে যন্ত্রপাতির চমক, আর ডাউজিং, টেলি-থেরাপি, কালার ফ্রিকুএন্সি, অ্যাণ্ড বডি সেল অস্‌সিলেশন, রে কমিউনিকেশন, ম্যাগনেটিক ফোর্স এরকম বৈজ্ঞানিক ভাষার ফুলঝুরি দিয়ে দুর্বলচিত্ত লোকেদের 'বধ' করার ক্ষমতাটুকু অবশ্যই তাঁর রয়েছে যথেষ্ট। বাকি সব কথাবার্তা নেহাৎই ভুয়ো বিজ্ঞান (pseudo science) ছাড়া আর কিছু নয়। ...অমৃতলালের 'মেটাল-ট্যাবলেট'ও তেমনি এক ভুয়ো বিজ্ঞানের অতি-আধুনিক নজির। কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব দিয়ে অমৃতলালের দাবির সমর্থন মেলে না, যদিও বিজ্ঞাপনে তিনি অত্যন্ত চাতুরির সঙ্গে কোনো এক বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানীর নাম জুড়ে দিচ্ছেন (*আজকাল*, ২৮ এপ্রিল, ১৯৮৪)। ....বহুজনের দেবতাপ্রতিম সাঁইবাবাকে তো পি. সি. সরকার (জুনিয়র) হাতেনাতে জালিয়াত প্রমাণ করেছেন পাল্টা ম্যাজিক দেখিয়ে। এ ব্যাপারে দক্ষিণ-ভারতীয় মনোবিজ্ঞানী ড. আব্রাহাম কোভুরের দুর্ধর্ষ চ্যালেঞ্জ-এর কথাও আজ অনেকের কাছে বেশ পরিচিত। তিনি গুরু-বাবা আর তথাকথিত 'অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাধর' পুরুষদের দাবিকে নস্যাৎ করেছেন, প্রতারক প্রবঞ্চক হিসাবে তাদের চিহ্নিত করেছেন বারবার।........থিওসফিক্যাল সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাত্রী ধুরন্ধর মহিলা ব্লাভাৎস্কির স্বরূপও ফাঁস হয়েছে ১৮৮৫ সালে লণ্ডন সোসাইটি ফর সাইকিক্যাল রিসার্চ-এর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পর। তদন্ত দলের নেতা রিচার্ড হডসন ম্যাডামের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপকে জুয়াচুরি বলে প্রমাণ করে

ছেড়েছেন। (দ্র.—*উৎস মানুষ,* মে, ১৯৮১)।........প্রথিতযশা বিজ্ঞানী হয়েও ওয়ালেস বা ক্রুক্স্ কিভাবে অবৈজ্ঞানিক বোধের শিকার হয়েছিলেন সে ব্যাপারে বলিষ্ঠ বিশ্লেষণ রেখেছেন ফ্রেডরিক এঙ্গেল্স্ তাঁর *Dialectics of Nature* বই-এর 'Natural Science in the Spirit World' প্রবন্ধে। এঙ্গেলস ওই বিজ্ঞানীদের অভিজ্ঞতাবাদে অন্ধ এবং যুক্তির সামগ্রিক সামঞ্জস্য রচনায় অনাগ্রহী বলে অভিহিত করেছেন।...........ইউরি গেলারের ম্যাজিকের অন্তরালে চোখ-ধাঁধানো ক্ষমতা প্রদর্শন ১৯৭৪ সালের পর এক এক করে জালিয়াতি বলে প্রমাণ হতে থাকে। আমেরিকার বিখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকা *নিউ সাইন্টিস্ট্* নিয়োজিত পর্যবেক্ষক বিজ্ঞানী ড. যোসেফ হ্যানলন গেলারের *'অতি-প্রাকৃত ক্ষমতা'*র দাবির বারোটা বাজিয়ে ছাড়লেন। আন্তর্জাতিক ঐন্দ্রজালিক সমিতি থেকেও ইউরিকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল 'অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা'র ভাঁওতা প্রচারের অভিযোগে।

এইভাবে বারবার ফাঁকিবাজি, প্রতারণা, বোকামি আর মিথ্যা সংবাদ প্রচারের ঘটনা প্রকাশিত হলেও কিন্তু অতীন্দ্রিয়বাদের ধোঁয়া কাটে নি। মানুষ (শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে) স্বভাবত রহস্যপ্রিয় অপার্থিব অলৌকিক ঘটনা সহজে বিশ্বাস করতে চায়, অতীন্দ্রিয় শক্তির প্রতি সন্দেহ চট করে লোকে পছন্দ করে না (এই প্রবণতার পেছনে অবশ্যই আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও বিজ্ঞানসম্মত সাংস্কৃতিক চেতনার ব্যাপক অভাববোধ কাজ করে)। প্রতিটি 'আশ্চর্য' ঘটনা বিশ্লেষণ করে ও 'অলৌকিক ক্ষমতাধর পুরুষে'র পিছু ধাওয়া করে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালিয়ে সত্য উদ্‌ঘাটন করা কার্যত সচেতন বিজ্ঞানীদের পক্ষে অসম্ভব। এর ফলে, সমস্ত অলৌকিক ঘটনার অসারতা প্রমাণিত হচ্ছে না বলেই, রহস্যপ্রিয় অধ্যাত্মবাদী চিন্তার প্রবক্তাদের গলার জোর বেড়ে যায়।

প্রকৃতপক্ষে আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের অগ্রগতি যতই প্রযুক্তিগত সাফল্য এনে দিক না কেন, পাশাপাশি পরামনোবিদ্যা (Parapsychology), মনোগতিতত্ত্ব (Psychokinesis) এবং অতি-প্রাকৃতিক (Para-normal) বিদ্যার চর্চা বিজ্ঞানী মহলেও কমবেশি গুরুত্ব পেয়ে আসছে। এদের পুরোপুরি বাতিল করার মতো উপযুক্ত বিরোধী বিজ্ঞানচর্চা এখনো অতটা ব্যাপকতা পাচ্ছে না।

এরকমই হয়, কখনো ব্যাখ্যা মেলে কখনো মেলে না; তবু মানুষের মনে প্রশ্ন থাকে, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকে। সত্যিই কি কিছু নেই? কোনো শক্তি, কোনো তরঙ্গ যোগ? পৃথিবী জুড়ে অনেক সৎ অনুসন্ধান, অনেক তদন্তে বেশ কিছু রহস্য উদঘাটিত হয়েছে (যার উল্লেখ করা হয়েছে আগেই) কিন্তু তবুও কিছু 'কিন্তু' থেকে যায়। আধুনিক বিজ্ঞানের খাপছাড়া জ্ঞানগম্যি আর আকর্ষণীয় [অপ]বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার জৌলুষে অতীন্দ্রিয়বাদীদের রাজত্ব রীতিমতো জাঁকিয়ে বসে আছে এখনো। এর জন্য নির্দিষ্ট রাষ্ট্র কাঠামোয় আর্থ-সামাজিক অবস্থা যেমন দায়ী, তেমনি দায়ী যোগ্য মানের ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রকল্পের অভাব যা সরাসরি 'অতীন্দ্রিয় শক্তি'কে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে। বিজ্ঞানে এহেন সামাজিক প্রায়োগ একবার হয়েছিল ১৯৬০ সালে আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটে (SRI)। এই গবেষণা প্রকল্পে প্রস্তুতির ঘাটতি ছিল

না কিন্তু শেষ অবধি অসততা এবং অর্থলোভের খপ্পরে পড়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে নৈতিক বিচ্যুতি ঘটে। সত্য উদঘাটন করতে গিয়ে অসত্যের প্রচার বাড়িয়ে দেয় SRI এবং অতীন্দ্রিয়বাদীরা তাদের জয়ডঙ্কার দ্বিগুণ আওয়াজ তোলে (দ্র— "PSI. a New Dimension in the Seiences" by C. A. Muses, *Impact of Science on Society*, Vol. 24, No. 4.1, 1974)।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা

এই দুঃখজনক ঘটনার পর কিন্তু সৎ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেমে থাকে নি। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সমাজ-সচেতন বিজ্ঞানীরা অপবিজ্ঞানের বিপজ্জনক প্রভাবকে ঠেকাতে চেষ্টা চালিয়েছেন একাগ্রভাবে। এরকম একটি মূল্যবান গবেষণা ও সত্যোদঘাটনের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞান পত্রিকা *নেচার*-এর জুন ১৯৭৯ সংখ্যায় (Vol. 279, p. 631-632)। গবেষণা প্রবন্ধটির লেখক লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংস্ কলেজের দু-জন গণিতের অধ্যাপক, জে. জি. টেলর এবং ই. বালানভ্স্কি।

ওই গবেষকরা পুরো বিষয়টিকে সম্পূর্ণ খোলামনে পক্ষপাতমুক্ত হয়ে গ্রহণ করেছেন। উদ্দেশ্য একটাই—সত্যিই অলৌকিক বা অতীন্দ্রিয় শক্তির কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে কিনা তা বিচার করা। অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার দাবিদারদের বক্তব্যে একটা মজার ব্যাপার দেখা যায়—যেহেতু আধুনিক যুগটাই বিজ্ঞানের নানান আবিষ্কার দিয়ে মানবজীবনকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে রেখেছে সেইজন্য বিজ্ঞানবিরোধীরাও কিন্তু সবসময় বিজ্ঞানের একটা খোলস গায়ে চড়িয়ে রাখতে চায় যাতে মানুষের বিশ্বাস উৎপাদন করার কাজটাও সহজ হয়। অতীন্দ্রিয়বাদীরা, দেখা গেছে, প্রধানত তড়িৎ-চুম্বকীয় (electro-magnetic) শক্তি ও তরঙ্গের কথা বারবার তাদের ব্যাখ্যায় এনে ফেলেন। তাই গবেষক টেলর ও বালানভ্স্কি প্রধানত তড়িৎ-চুম্বকীয় বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের ভিত্তিতে তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

প্রকৃতপক্ষে মানুষের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের বাইরেকার কোনো উপলব্ধি বা শক্তি দিয়ে যদি কোনো কাণ্ড আদৌ ঘটানো সম্ভব হয় তাহলে তা তড়িৎ-চুম্বকীয় (EM) শক্তি তরঙ্গের সাহায্যে হতে পারে, কেননা এই তরঙ্গ যে-কোনো মাধ্যমের মধ্য দিয়ে (কিংবা বিনা মাধ্যমেই) প্রবাহিত হয়ে বহু বহু দূরত্ব পাড়ি দিতে পারে অবিকৃতভাবে। সূর্য থেকে যে আলো, তাপ ও অন্যান্য তড়িৎ চুম্বকীয় (EM) রশ্মি পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় তা মহাশূন্য পাড়ি দিয়েই আসে—সেখানে কোনো বস্তু মাধ্যম নেই, কিচ্ছু নেই, তবু EM তরঙ্গ বয়ে চলে আসে। এই EM শক্তিকে অন্য শক্তিতে রূপান্তর ঘটিয়ে ইচ্ছামতো কাজ করানো আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অন্যতম কৃতিত্ব। রেডিও টেলিভিশনে শব্দ বা ছবি দূরান্তরে পাঠানো, মহাকাশে বা গ্রহান্তরে যান পাঠিয়ে পৃথিবীর স্পেস কন্ট্রোল স্টেশনে বসে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা, যান্ত্রিক হাত দিয়ে পাথর সংগ্রহ করানো বা ক্যামেরায় ছবি তোলানো—এই সব রোমাঞ্চকর ক্রিয়াকলাপ

আধুনিক বিজ্ঞানই ঘটাচ্ছে ওই তড়িৎ চুম্বকীয় বা EM তরঙ্গের সংকেত পাঠিয়েই। মনে রাখতে হবে, যে-কোনো সজীব বা নির্জীব পদার্থই EM তরঙ্গ ছাড়ে এবং তাকে সূক্ষ্ম যন্ত্র দিয়ে মাপাও চলে।..........বর্তমান দুই গবেষক এর আগে ১৯৭৮ সালে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা করেছিলেন (দ্র.— *Nature*, Vol. 2., November 1978)। অতি-প্রাকৃত ঘটনার সঙ্গে জড়িত কিছু বস্তু ও ব্যক্তির ওপর পরীক্ষা চালানো হয়; তথাকথিত অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা প্রদর্শনের সময় এরা যে EM তরঙ্গ ছাড়ছে সেগুলি পরীক্ষাগারে নিখুঁতভাবে মাপা হয়। এরপর প্রতিষ্ঠিত EM তত্ত্বের ভিত্তিতে অঙ্ক কষে ওই গবেষকরা বের করেন যে, পরীক্ষিত বস্তু বা ব্যক্তিটি সত্যিই অতি-প্রাকৃত ক্রিয়া ঘটাতে চাইলে কতটা পরিমাণ তরঙ্গশক্তি তাদের দেহ (বা মস্তিষ্ক) থেকে ছাড়া দরকার ছিল। পরীক্ষা শেষে দেখা যায়, অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে গেলে যত মাত্রার EM শক্তির দরকার ছিল (theoretical), পরীক্ষাগারে পরিমাপ করা EM শক্তি মাত্রা (experimental) সে তুলনায় ছিল অনেক গুণ কম। অর্থাৎ 'ক্ষমতাধর'দের দাবির সঙ্গে পরীক্ষার ফলাফল মেলে না। এই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা ও তত্ত্বের সমন্বয়ে পাওয়া গবেষণার ফলাফল অতীন্দ্রিয়বাদ বা অলৌকিকতার অস্তিত্বকে সরাসরি আঘাত করে। এরপর গবেষকরা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত বিবিধ তত্ত্বগুলি নিয়ে অলৌকিকের সবরকম সম্ভাব্যতা বিচার করতে থাকেন এক এক করে।

শক্তির নিত্যতা সূত্র (Energy Conservation law) আমাদের জানা। তড়িৎ-চুম্বকীয় শক্তি দিয়ে দূরবর্তী কোনো বস্তুর নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে বা চামচ বাঁকিয়ে দিতে গেলে (psychokinesis) পাঠানো ওই EM শক্তি আর রূপান্তরিত যান্ত্রিক শক্তির সমতা থাকা দরকার। তত্ত্বগতভাবে গবেষকরা দেখেছেন, ওই দুটি ক্ষেত্রে এ-সমতা বজায় থাকা অসম্ভব, তাই ওই অতীন্দ্রিয় ঘটনাগুলি বিজ্ঞান সমর্থন পেতে পারে না। ডাউজিং (উপলব্ধি দিয়ে অনুসন্ধান), টেলিপ্যাথি, অলোকদর্শন আর মনঃ- সংযোগে রোগ নিরাময়ের ঘটনাগুলির সঙ্গে জড়িত যান্ত্রিক শক্তির পরিমাণ হবে কয়েক 'মিলিজুল'-এর মতো ('জুল' হলো যান্ত্রিক শক্তির একক), যদি ধরে নেওয়া যায় এরা ওই 'ক্ষমতাধর' ব্যক্তির মস্তিষ্কের কিছু অংশের উদ্দীপনার সঙ্গে জড়িত। কেবলমাত্র এই কয়েকটি ঘটনা নিয়েই আলোচনা এগোনো চলে, কেন না বাকি সমস্ত অলৌকিক ঘটনার সঙ্গে জড়িত শক্তির পরিমাণ অসম্ভব রকমের বেশি—এক জুল বা তারও কয়েক গুণ বেশি। এত বেশি পরিমাণ শক্তি কোনো EM (তড়িৎ চুম্বকীয়) তরঙ্গ শক্তির রূপান্তর থেকে আসবে না, সুতরাং বিজ্ঞান তাদের স্বীকারও করতে পারে না।

প্রকৃতিতে শক্তির উৎস রয়েছে অনেক। এদের মধ্যে কয়েকটির সঙ্গে অতি-প্রাকৃতিক ঘটনার সম্পর্ক দাবি করা হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন মহাজাগতিক বা কসমিক রশ্মি, পারমাণবিক শক্তি, নিউট্রিনো শক্তি, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। শক্তি মাত্রার বিচারে এরাও কিন্তু বৈজ্ঞানিক সমর্থন পায় নি। ভবিষ্যত দর্শন (precognition) ক্ষমতার ব্যাখ্যার জন্য আলোর চেয়ে বেশি গতিশীল ট্যাকিয়ন শক্তি আর অগ্রবর্তী

বিভব (advanced potential) শক্তির কথা বলেছেন কেউ কেউ, কিন্তু কোনো তাত্ত্বিক ভিত্তি এদের সমর্থনে কেউ দিতে পারেন নি। মজা হলো, এত সব শক্তির ভূমিকা দাবি করলেও কোন্ প্রক্রিয়ায় (mechanism) যে একজন মানুষ অতি-লৌকিক ঘটনায় এসব শক্তির প্রয়োগ করতে পারে তা বলা হয় না।.........পদার্থবিদ্যার নবতম আবিষ্কার 'কোয়ান্টাম তত্ত্ব' দিয়েও বর্তমান গবেষকদ্বয় কিছু কিছু অলৌকিক ঘটনার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন, প্রতি ক্ষেত্রেই ব্যর্থতা হয়েছে একমাত্র ফল।

কাজেই সেই EM (তড়িৎ চুম্বকীয়) তত্ত্ব ছাড়া ESP ঘটনাবলীর সঙ্গে অন্য কোনো শক্তিতত্ত্বের সঙ্গতি বাতিল হয়ে যাচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞানের চোখে। এখন, EM-এর ক্ষেত্রে গবেষণাগারে মাপা শক্তির মাত্রা আর তত্ত্ব থেকে অঙ্ক কষে মাপা শক্তিমাত্রার গরমিল খুঁজে পাওয়ার বিষয়টা আরেকটু গভীরে ঢুকে বিচার করা যেতে পারে। মানবদেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা প্রায় ৩৭° সেন্টিগ্রেড বা ৯৮° ফারেনহাইট। এই তাপমাত্রায় মানুষের শরীর নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক মাত্রার মধ্যে কতো পরিমাণ EM রশ্মি ছাড়তে পারে তা সহজেই জানা যায় ও মাপা যায়। প্রধানত তাপরশ্মি হিসেবে EM শক্তি শরীর থেকে নির্গত হয়। এই রশ্মির বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সম্ভাব্যতা ধরে নিয়ে গবেষকরা দেখিয়েছেন যে, কোনো মতেই তা দিয়ে ডাউজিং বা অলোকদর্শনের মতো মানসিক ক্রিয়া ঘটানো সম্ভব নয়।

ভরাবিষ্ট অবস্থায় ভারী ওজন মনের জোরে নাড়িয়ে দেওয়া, ছুরি-চামচ-রড বাঁকানো ইত্যাদি ঘটনায় খুব বেশি শক্তি রূপান্তরের প্রয়োজন, যা মানবদেহ থেকে কোনো মতেই EM শক্তি বিকিরণের মাধ্যমে আসা সম্ভব নয় (এটা আগেই উল্লেখ করেছি)।

টেলর ও বালানভ্স্কি মানবদেহ থেকে তাপরশ্মি ছাড়া অন্য সবরকম সম্ভাব্য তড়িৎ-চুম্বকীয় EM বিকিরণ মাপার চেষ্টা করেছেন এবং অতিপ্রাকৃতিক ঘটনার সঙ্গে মেলানোর চেষ্টা করেছেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শক্তি মাত্রা এত কম দেখা গেছে যে, বস্তুজগৎ বা মনোজগতে কোনো রকম দূর নিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনার কোনো সমর্থন সূচক সূত্রই খুঁজে পাওয়া যায় নি। প্রকাশিত গবেষণা পত্রটিতে প্রতিটি পরীক্ষার খুঁটিনাটি তথ্য ও পরিসংখ্যান দিয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা রাখা হয়েছে (যা এখানে তুলে দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি নেই)। তবে একটি পরীক্ষা বা গণনার সরলীকৃত উল্লেখ রাখা যায় উদাহরণ হিসেবে।

টেলিপ্যাথিতে একজন প্রেরক কিছু তথ্য বা সংবাদ মনে মনে পাঠিয়ে দেবে গ্রাহকের কাছে। গ্রাহক সেই সংকেত উপলব্ধি দিয়ে গ্রহণ করবে, মর্মোদ্ধার করবে এবং সেটা প্রকাশ করবে। তখন মিলিয়ে দেখা হবে প্রেরিত তথ্যের সঙ্গে সেটা মিলছে কি না। একজন সাধারণ মানুষের দেহ থেকে যে কম্পাঙ্ক মাত্রার (Frequency range) EM শক্তি আসতে পারে তা তো খুবই কমজোরী আগেই বলা হয়েছে, কিন্তু যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, প্রেরক তার দৈহিক বৈশিষ্ট্যের জন্য ব্ল্যাক-বডি EM পাঠাতে পারে যার কম্পাঙ্ক মাত্রা ১০ কিলো হার্টজ্-এর বেশি সেক্ষেত্রেও

দেখা যাচ্ছে পাঠানো সংকেতের শক্তি মাত্রা এত দ্রুত কমে যেতে থাকে (প্রেরক গ্রাহকের মধ্যে দূরত্ব ১কিলোমিটার থাকলে শক্তি হ্রাসের পরিমাণ ১০^{৫} বা ১ লক্ষ ভাগ অনুপাতে কমে) যে গ্রাহক কোনোভাবেই সে বার্তা গ্রহণ করে উপলব্ধিতে আনতে পারবে না।

অতএব এই সমস্ত সম্ভাবনা চষে ফেলার পর বলা চলে তড়িৎ-চুম্বকীয় EM বা অন্য কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অতীন্দ্রিয় (ESP) ঘটনাবলীর কোনোটিরই ব্যাখ্যা করতে বা সমর্থন করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে গবেষকরা আরো বলেছেন—এতকিছুর পরেও হয়ত কেউ বলবেন যে, এখনো অনাবিষ্কৃত কোনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই হলো অতীন্দ্রিয় শক্তির আসল রহস্য। এ দাবিও একেবারেই ভিত্তিহীন কারণ মানবদেহের আওতার মধ্যে আসে এমন সবরকমের শক্তি দিয়েই সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়েছে। কোনো দাবিই ধোপে টেঁকে নি। তাছাড়া যে পদ্ধতি আজও অনাবিষ্কৃত, কেউই যার সম্পর্কে কোনো ধারণা দিতে পারবে না, তা নিয়ে আলোচনা করাটাইতো বাতুলতা।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

ডিসেম্বর '৮২

অলৌকিক প্রভা

'মানুষের অলৌকিক প্রভার ছবি তোলার যন্ত্র নির্মাণ করা হয়েছে'
দ স্টেট্‌সম্যান (কলকাতা) ২০.২.৮৪।

শুধু *স্টেট্‌সম্যান* নয়, ভারতের প্রায় সবকটি রাজ্যের সংবাদপত্রেই এ-খবর ছাপা হয়েছে। কেউ বলেছেন অলৌকিক প্রভা, কেউ বলেছেন দেবদ্যুতি; মূলত সংবাদ একই। কাগজ থেকে আরো জানা গেল যে, ভারতের মাটিতে এ-জাতীয় যন্ত্র নির্মাণ এই প্রথম। মাদ্রাজের গভর্নমেন্ট জেনারেল হাসপাতালে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করে এই বিশেষ যন্ত্রটি নির্মিত হয়েছে।

পৃথিবীর যাবতীয় সবকিছুর ওপরই নাকি একটা অলৌকিক প্রভা (Aura)-র আস্তরণ আছে। প্রাণীজগতের অলৌকিক প্রভা সৃষ্টি হয় এ-যাবৎ অনাবিষ্কৃত এক বিশেষ ধরনের শক্তি দিয়ে। এই শক্তির নাম 'প্রাণশক্তি' (Bio-energy)। এতদিন নাকি এই প্রাণশক্তি সম্পর্কে একটা ভাসা ভাসা ধারণা ছিল, ছিল কিছুটা অনুমান। এখন অন্যান্য উন্নত দেশে তো বটেই, ভারতবর্ষেও এই শক্তির ছবি তোলা সম্ভব হয়েছে।

যন্ত্রটি নির্মাণ করা হয়েছে রোগ নির্ণয়ের জন্য। খবরে প্রকাশ যে, আবরিত এই প্রভার আকার, আকৃতি এবং বর্ণ ব্যক্তি বিশেষের মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত। সুস্থ প্রাণীর প্রভার আকৃতি এবং বর্ণ, অসুস্থ অবস্থায় পাল্টে যায়। শারীরিক অবস্থা যত সংকটপূর্ণ হয়, এই প্রভার তীব্রতা ততই কমে যেতে থাকে। মৃত্যুর অব্যবহিত আগে এই প্রভা হয়ে যায় অস্থির, আর মৃত্যুর ঘন্টা ছয়েক পরে এই প্রভার ছবি তুলে দেখা গেছে যে 'প্রভাটি দেহ ছেড়ে ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে (Slowly leaving the body)' এবং 'শেষ পর্যন্ত দেহের সঙ্গে থেকে যাচ্ছে একটা ম্রিয়মাণ (dull) আভা'—বলছেন মাদ্রাজ জেনারেল হাসপাতালের নিউরোলজি বিভাগের প্রধান ড. পি. নরেন্দ্রন।

পুরো সংবাদটি পাঠ করার পরে যে ধারণা হয় তা হলো—এক জাতীয় অলৌকিক প্রভা যা প্রাণশক্তিরই বহিঃপ্রকাশ, সব সময়েই প্রাণীদেহকে আস্তরণের মতো ঘিরে থাকে। প্রাণীর মৃত্যু ঘটলে এই প্রভা দেহ ছেড়ে চলে যায়। তাহলে এই কি সেই বহু কথিত 'আত্মা'?

সেন্ট-এলমোর আগুন!

মধ্য যুগের কথা। খ্রিস্ট পরবর্তী পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভূমধ্যসাগর আর প্রশান্ত মহাসাগরের নাবিকেরা আরাধনা করত এক অতিপ্রাকৃত শক্তির। সেন্ট এলমো (St. Elmo) তার নাম। সেন্ট এরাসমাসের ইতালীয় অপভ্রংশ।

আনুমানিক ৩০৩ খ্রিস্টাব্দে ফরমিয়া দেশে একজন খ্রিস্টান ধর্মযাজক (Bishop) ছিলেন যাঁর নাম সেন্ট এরাসমাস।[২] রোমের সম্রাট ডাইওক্লেসিয়ানের খ্রিস্টান নিধন পর্বে ইনি শহীদ হন। ফরমিয়ার ক্যাথিড্রালে এরাসমাসের শবদেহ শায়িত হয়। তারপর ৮৪২ খ্রিস্টাব্দে যখন সারাসিয়ানরা (Saraceans) ফরমিয়া ধ্বংস করেন তখন এরাসমাসের দেহটিকে ইতালির গায়েটা (Gaeta) শহরে নিয়ে এসে সমাধিস্থ করা হয়। ইতালিতেই এরাসমাসের তথাকথিত 'আত্মা'কে নাবিকদের দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল সর্বপ্রথম। তারা মনে করত এরাসমাসের 'পুণ্যাত্মা' সমুদ্রের আকাশে বাতাসে বিচরণ করছে। কোনো জাহাজ যখন ঝড় বৃষ্টির কবলে পড়ে তখন সেই 'আত্মা' আগুনের রূপ ধরে দেখা দেয় নাবিকদের কাছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই লোককথা প্রচলিত হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন নামে বিভিন্ন দেশে এরাসমাসকে সমুদ্রের নাবিক-দেবতারূপে আরাধনা করা শুরু হয়। এরাসমাসের বহু নাম। কেউ বলে রামুস (Ramus), কেউ বলেন এরমাস (Ermus)। কোথাও তিনি এরমো (Ermo), কোথাও বা টেল্‌মো (Telmo)। পর্তুগালে এই দেবতার আত্মপ্রকাশ—সমুদ্রবক্ষের আলো—'পিটারের আলো'র (Peter's lights) রূপ ধরে।

এই আলো, নাবিকদের আশার আলো। সেন্ট এরাসমাস বা সেন্ট এলমো বিস্তীর্ণ সমুদ্রের ভয়ঙ্কর জলরাশির মাঝে ভাসমান তৃণতুল্য জাহাজে নাবিকদের বুকে বল সঞ্চার করেন। ভয়ঙ্কর দুর্যোগের রাতে, জল ঝড় আর বিদ্যুৎ চমকের মাঝে নাবিকদের অসহায় একাকিত্বের মুহূর্তে নিজের অস্তিত্ব প্রকাশ করেন, জাহাজের মাস্তুল আলোকিত করেন।

প্রলয়ের মতো দুর্যোগ যখন জাহাজটাকে নিয়ে লোফালুফি খেলে, অসহায় নাবিকরা তখন সেন্ট এলমোর প্রার্থনায় বসে যায়। একমাত্র ত্রাণকর্তা সেন্ট এলমো।

আর তখনই দেখা যায় সেই অলৌকিক শক্তির প্রকাশ। ঘন অন্ধকারকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়ে জাহাজের মাস্তুল আর মাস্তুল টেনে ধরে রাখার ধাতুর দড়িগুলো আশ্চর্য আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সেন্ট এলমোর উপস্থিতি জানান দিয়ে। অন্ধকার সমুদ্র বক্ষে জাহাজের ওপর দেওয়ালির উৎসব যেন! নাবিকেরা সাহস ফিরে পায়। সেকালে কিন্তু এই রহস্যের কোনো বাস্তব ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নি। রহস্যময় ঘটনাটি রহস্যের অন্তরালেই রয়ে গেছে দীর্ঘদিন। বিংশশতাব্দীর মাঝখান পর্যন্ত।

কিরলিয়ান (Kirlian) ফোটোগ্রাফি

উচ্চ বিভবে (High Voltage) ফোটোগ্রাফি সংক্রান্ত গবেষণা করতে গিয়ে সোভিয়েত যন্ত্রবিদ সেমিয়ান কিরলিয়ান (Semyon Kirlian) সর্বপ্রথম সেন্ট এলমোর আলো জ্বাললেন গবেষণাগারের চার দেয়ালের মাঝে। [৩,৪]

দীর্ঘ তিরিশ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে গড়ে তুললেন কয়েকটি যন্ত্র। গড়ে তুললেন ফোটোগ্রাফির একটি শাখা — 'কিরলিয়ান ফোটোগ্রাফি' নামে প্রচলিত হলো সেই বিশেষ পদ্ধতিটি।

জৈবিক প্রভা এবং রোগ

[হাল আমলের বিচিত্র সংবাদ]

প্রাচীন শাস্ত্র এবং সাহিত্যে অনেকেই আপনারা মুনিঋষিদের কথা পড়েছেন। তাঁদের শরীর থেকে নির্গত হতো ঐশ্বরিক জ্যোতি। সেই জ্যোতি নাকি খালি চোখে দেখা যেত। পরে জানা গেছে মুনি-ঋষিরাই একমাত্র ব্যতিক্রম নন। সাধারণ মানুষ তো বটেই, এ ধরনের ঘটনা পৃথিবীর তাবৎ উদ্ভিদ এবং প্রাণীদের মধ্যেও দেখা যায়। জীবদেহে জীবরাসায়নিক প্রক্রিয়ার দরুন প্রতি মুহূর্তে নির্গত হয় এক ধরনের প্রভা। এই জৈবিক প্রভা (bioluminiscence) যে সবার ক্ষেত্রে খালি চোখে দেখা যাবে এমন কোনো কথা নেই। সংবেদনশীল যন্ত্রের সাহায্যেই তার অস্তিত্ব জানা সম্ভব। মাদ্রাজের একটি খবরে প্রকাশ, সেখানকার জেনারেল হসপিটালের নিউরোলজি ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী ড. পি নরেন্দ্রন বিচিত্র একটি যন্ত্র তৈরি করেছেন। যন্ত্রটি মানুষের জৈবিক প্রভার ছবি তুলতে পারে। বলতে কি ইতিমধ্যে তিনি ১০০০ জনের জৈবিক প্রভার ছবিও তুলেছেন। এদের মধ্যে অনেকেই কোনো না কোনো রোগের শিকার।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ড. নরেন্দ্রন বলেছেন, বিচিত্র এই জৈবিক প্রভা কার ক্ষেত্রে কতটা উজ্জ্বল এবং কেমন দেখতে হবে সেটা নির্ভর করে তার আধ্যাত্মিক, মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার ওপর। যিনি যোগ সাধনা করেন, তাঁর দেহ-নিঃসৃত জৈবিক প্রভা যথেষ্ট উজ্জ্বল। তুলনায় মৃত্যুর যিনি কাছাকাছি তাঁর জৈবিক প্রভা খুবই ক্ষীণ। মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যে যাঁরা ভরপুর তাঁদের জৈবিক প্রভা সব সময়ই ভাস্বর, দীপ্তিময়। যাঁরা মানসিক রোগে ভুগছেন তাঁদের প্রভা ছাড়া ছাড়া অস্পষ্ট। রোগ-বিশেষে এই প্রভার প্রকৃতিও হয় ভিন্নতর। ড. নরেন্দ্রন দেখিয়েছেন, যাঁরা মস্তিষ্কের টিউমারে ভোগেন তাঁদের প্রভার চেহারা হয় বোতলের মতো। যাঁরা যকৃতের সিরোসিস রোগে আক্রান্ত তাঁদের জৈবিক প্রভার প্রকৃতি হয় শাখাপ্রশাখার মতো অবিন্যস্ত। কলেরা বা উদরাময় রোগীদের প্রভা যেন সৃষ্টি করে কতকগুলি সমান্তরাল রেখা। তাঁর দাবি, এই প্রভা বিশ্লেষণ করে এ-পর্যন্ত তিনি বহু রোগ নির্ধারণ করতে সমর্থ হয়েছেন।

দেশ, ২১.৩.৮৯

এই বিশেষ ধরনের ফোটোগ্রাফি বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করল বিজ্ঞানী মহলে। কটি গাছের পাতা, সেটিকে ছিঁড়ে এনে বিশেষ যন্ত্রে রেখে তার একটি ছবি তোলা লো। দেখা গেল, পাতাটির ছবির চারধারে কি এক অজানা আবছা ছায়া—একটি জ্জ্বল আলোর প্রতিকৃতি। রঙীন ছবিতে রহস্যটি আরো জমজমাট। মূল পাতাটির

চারপাশে নানা রঙের বিন্দু দিয়ে উজ্জ্বল ছায়া, অনেকটা মহাপুরুষদের ছবিতে মাথার চারপাশ থেকে যেমন আলোর ছটা বেরয় সেরকম।

বহু দেখা সাঁইবাবার ছবিটির কথাই ভাবা যাক। মাথা ভর্তি একরাশ ঘন চুল। তার ভেতর থেকে উজ্জ্বল আলোর দ্যুতি বেরিয়ে মাথার পেছনটা আলোকিত করে রেখেছে।

বর্ণাঢ্য এইসব ছবি দেখে কেউ কেউ বললেন, পাতাটিকে গাছ থেকে ছিঁড়ে আনার ফলে তার 'প্রাণশক্তি' চলে যাচ্ছে। রেখে যাচ্ছে তার শেষ চিহ্ন ফোটোগ্রাফিক ফিল্মের ওপর।

শুধু গাছের পাতা নয়, ধীরে ধীরে অনেক কিছু পেরিয়ে এবার মানুষ। মানুষের আঙুলের ছাপের ছবি। ছবি তোলা হলো কিরলিয়ান কায়দায়। এখানেও সেই প্রভা। মূল আঙুলের ছাপ, তার আঁকা-বাঁকা রেখা আর সবকে ঘিরে আছে এক অপূর্ব অলৌকিক (!) প্রভা! আরো আশ্চর্যের বিষয়, এই বিশেষ প্রভাটির তীব্রতা, আকৃতি এবং বর্ণ নির্ভর করে যে-ব্যক্তির আঙুলের ছাপের ছবি তোলা হচ্ছে তার মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার ওপর। সুস্থ অবস্থায় যে-প্রভাটি দেখা যায়, অসুস্থ অবস্থায় তার পুরো চেহারাটি যায় পাল্টে।

আর এখানেই এলো বিজ্ঞানীদের অলৌকিক কল্পনা। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরাও বললেন—শরীরের থেকে যে বিশেষ ধরনের শক্তি সর্বদা বিকিরিত হচ্ছে, যার ছবি পাচ্ছি আমরা, সেই শক্তিটি হলো 'বায়োপ্লাস্‌মিক এনার্জি (Bio-plasmic Energy)' বা 'বায়ো এনার্জি'—প্রাণশক্তি!

কল্পনার ঘোড়া ছোটে

অলৌকিক আর 'অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি'র কারবারীরা মস্ত সুবিধা পেল। 'আলোক দৃষ্টি'র ব্যাখ্যা পেল তারা। অতীন্দ্রিয়বাদীদের দাবি—বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন কতিপয় ব্যক্তি অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাবলে অদৃশ্যবস্তুও দেখতে পায়। যেমন খামে মোড়া ছবি, কিংবা বন্ধ বাক্সের ভেতরে রাখা কোনো বস্তু। যদিও পৃথিবীর সমস্ত যাদুকরেরাই এই খেলাটি দেখাতে সক্ষম, তবুও 'অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা' সম্পন্ন ব্যক্তিরা 'বিশেষ ক্ষমতা' বলেই এই আশ্চর্য কাজটি করতে পারেন এবং এর পেছনে কোনো 'যাদুকরী কৌশল' নেই বলেই তারা দাবি করেন। ওই 'অতীন্দ্রিবাদী'রা এবার ওই ঘটনার ব্যাখ্যায় একটা বলার মতো 'বিজ্ঞানভিত্তিক' যুক্তি পেলেন। এই যে অলৌকিক প্রভা প্রতিনিয়ত (জড় কিংবা অজড়) যে কোনো বস্তু থেকে বিকিরিত হচ্ছে, যে বিকিরণ সাধারণ অবস্থায় খালি চোখে দেখা যায় না অথচ যার ফটো বিশেষ অবস্থায় তোলা যায়, সেই বিকিরণ বা প্রভা যে দেখতে পায় তারই আছে 'অলোক প্রভা', আছে 'অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা'।

'বায়ো-এনার্জি'র আকার দেখে রোগ নির্ণয় হচ্ছে

[হাল আমলের বিচিত্র সংবাদ]

মাদ্রাজ, ১৯ ফেব্রুয়ারি—পৃথিবীর সব কিছুর চারদিকেই (মানুষ বা পশু বা পাথর যাই হোক না কেন) একটা জ্যোতি রয়েছে। জীবন্ত প্রাণীদের চারদিকে এই জ্যোতি খুব উজ্জ্বল হয়ে থাকে। নিষ্প্রাণ বস্তুর ক্ষেত্রে এই জ্যোতি খুব একটা উজ্জ্বল আভা বিকিরণ করে না।

এই জ্যোতি আসলে 'বায়ো-এনার্জি'। মানুষের ক্ষেত্রে এই জ্যোতির ঔজ্জ্বল্য এবং আকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মানসিক, আধ্যাত্মিক ও শারীরিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। একজন যোগীর চারদিকে এই জ্যোতি অত্যন্ত উজ্জ্বল। আবার একজন মুমূর্ষু ব্যক্তির চারধারে যে জ্যোতি বিরাজ করে, তা খুবই ক্ষীণ। মানসিকভাবে সুস্থ এবং সবল ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই জ্যোতি হয় খুব মসৃণ। আবার মানসিক রোগগ্রস্ত বা উন্মাদ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে জ্যোতি অত্যন্ত রুক্ষ হয়ে থাকে।

এখানকার সরকারি হাসপাতালের গবেষকরা এই জ্যোতির ছবি তুলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। এর ফলে নাকি বিভিন্ন রোগ নির্ণয় এবং রোগের চিকিৎসার খুব সুবিধা হবে।

হাসপাতালের নিউরোলজি বিভাগের প্রধান ড. পি. নরেন্দ্রন জানিয়েছেন যে, ১০০০ ব্যক্তির চারধারে এই জ্যোতির ছবি তোলা হয়েছে। সেজন্য তৈরি করা হয়েছে একটা বিস্ময়কর মেসিন। দেখা গেছে যে, অসুস্থ ব্যক্তিদের জ্যোতির আকার এবং ঔজ্জ্বল্য, সুস্থ সবল ব্যক্তিদের জ্যোতি থেকে আলাদা। তাছাড়া রোগভেদে রোগীর জ্যোতির আকার ও ঔজ্জ্বল্য ভিন্ন হয়ে থাকে। ড. নরেন্দ্রন জানিয়েছেন যে, সাত লক্ষ টাকা খরচ করে এই মেসিনটি তৈরি করা হয়েছে।

একটি বিশেষ প্রকল্প অনুযায়ী ৭২টি ভিন্ন ভিন্ন রোগে ভুগছেন এরকম ৯৩৪ জনের জ্যোতির ছবি তোলা হয়েছে। এ-সম্পর্কে একটি বিশদ রিপোর্ট ড. নরেন্দ্রন কেন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। রোগভেদে যে জ্যোতির আকার ও ঔজ্জ্বল্য বদলায় এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। এ-পর্যন্ত জ্যোতি দেখে ৩০টি রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে বলে ড. নরেন্দ্রন জানান।

একটি মাত্র ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, মানসিকভাবে সুস্থ ও সবল একজন ব্যক্তির জ্যোতির ঔজ্জ্বল্য অত্যন্ত ক্ষীণ। ঠিক এক সপ্তাহ পর তার জন্ডিস হয়। তার অর্থ এই জ্যোতি থেকে আগে থেকেই রোগের আভাস পাওয়াও যেতে পারে।

পি টি আই, *আজকাল,* ২০.২.৮৪

এতক্ষণ পর্যন্ত যতটা আলোচনা করা হলো সেখানে বস্তুর ছবি তোলার পর তার ছবির চারপাশে প্রভা দেখা গেছে। এরপর আরো একটু এগিয়ে বলা হতে লাগল,

প্রভাটি বস্তুর অবর্তমানেও সস্থানে থেকে যাচ্ছে। অর্থাৎ কোনো প্রাণী মারা গেলে তার প্রভাটি, Auraটি, দেহকে ছেড়ে দেয় কিন্তু তার নিজের (প্রভাটির) অস্তিত্ব বজায় রাখে। ধরা যাক গাছ থেকে একটি পাতাকে ছিঁড়ে আনা হলো। এবারে গাছের ছবি তুললে হয়ত দেখা যাবে ছিন্ন পাতাটির পূর্বস্থানে পাতার একটি আবছা ছায়া। পাঁঠা বলি দেবার পর ধড়টির ছবি তুললে হয়ত দেখা যাবে, ধড়ের সঙ্গে মাথাটিও আছে, কিন্তু মাথাটির ছবি অস্পষ্ট। ছায়া ছায়া। অর্থাৎ কোনো বস্তুকে স্থানচ্যুত করলেও তার প্রভাটি কিন্তু পূর্বস্থানেই থেকে যায়—এরকমই একটা দাবি শোনা গেল 'অতীন্দ্রিয়বাদী'দের মুখে। অতীন্দ্রিয়বাদী ম্যারিনো বলছেন[৬] 'আমাদের আগের সাফল্য, যেখানে একটি গাছের একটি পাতা ছিঁড়ে নেবার পর পুরো গাছটির ছবি তুলে দেখা গেল যে, ছিন্ন পাতাটির *অপচ্ছায়া* পূর্বস্থানে অবিচল, আমাদের উৎসাহিত করল টিকটিকির লেজ নিয়ে পরীক্ষা করতে। ছবি তুলে দেখা গেল যে, টিকটিকির লেজটি খসিয়ে দেবার পরও পূর্বস্থানে লেজের একটা *ভূচুম্বক ক্ষেত্র* বিদ্যমান। লেজের আবছা ছায়া দেখা যাচ্ছে।'

কিরলিয়ান ফোটোগ্রাফিতে গাছের পাতার ছবি তুলে তার চারদিকে একটা প্রভা দেখা গেছে। আর এক্ষেত্রে পাতাটি নেই অথচ তার ছবি এসে যাচ্ছে ক্যামেরায়। এই অবাস্তব ঘটনাটির সঙ্গে কিরলিয়ান ফোটোগ্রাফির কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু একথাও অবশ্যই বলা যায় যে, এই ধরনের অবাস্তব দাবির সুযোগ বিজ্ঞানীরাই করে দিয়েছেন।

'অলৌকিক প্রভা' কি সত্যিই অলৌকিক?

প্রথমেই দেখা যাক বিশেষ যন্ত্রটি কেমন। আমরা সরলতম যন্ত্রটি দিয়েই শুরু করি, যে যন্ত্রটি কিরলিয়ান সাহেব নিজে হাতে তৈরি করেন।

কিরলিয়ান ক্যামেরা
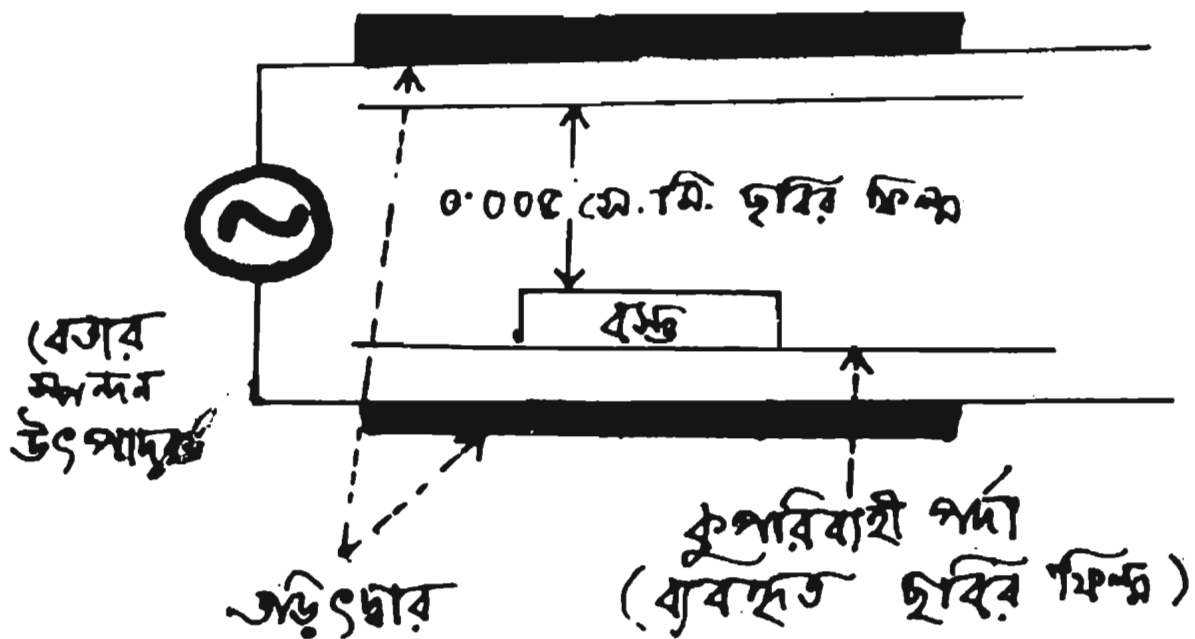
ছবিতে দেখানো ব্যবস্থামতো কোনো বস্তু, তা গাছের পাতা, টিকটিকির লেজ কিংবা টাকাপয়সা যাই হোক না কেন, একটি কুপরিবাহী পর্দার ওপর রাখা হয়। কিরলিয়ান কুপরিবাহীর কাজটি একটি ব্যবহৃত ছবির ফিল্ম দিয়ে করেছিলেন। বস্তুর খুব কাছাকাছি (স্পর্শ করেই) অব্যবহৃত ছবির ফিল্মটি লাগানো হলো। ব্যবস্থাটির দুপ্রান্তে তড়িৎদ্বার লাগানো আছে, যেখানে উচ্চ বিভবের (high voltage) ও উচ্চ কম্পাঙ্কের (high frequency) তড়িৎ প্রবাহ পাঠানো যাবে।

এই অবস্থায় তড়িৎ প্রবাহ চালনা করলেই বস্তুটির ছবি উঠবে ফোটোগ্রাফির ফিল্মে। আর সেই ছবিতে দেখা যাবে বস্তুকে ঘিরে আছে বলয়াকারে আলোকিত অংশ, যে আলো তড়িৎপ্রবাহ চালনা না করে সাধারণ ক্যামেরার সাদা আলোয় ছবি তুললে দেখা যাবে না।

এখানে একটি পর্যবেক্ষণ না করলেই নয়; এই যন্ত্রেও কিন্তু বস্তুটিকে থাকতেই হবে ক্যামেরায়, নয়ত ছবি উঠবে না। অতএব লেজহীন টিকটিকির লেওজয়ালা ছবি, দুবারে তোলা সুপারইমপোজ্ড বা পরস্পর আপতিত ছবি ছাড়া আর কিছু হওয়ার কথা নয়। এ-প্রসঙ্গে পরে আসছি।

আবারো সঙ্গত একটি প্রশ্ন এসেই যায়—যে আলোকিত অংশটির ছবি কিরলিয়ান ক্যামেরায় উঠল, যাকে সাধারণ অবস্থায় খালি চোখে দেখাও যায় না, সাধারণ ফোটোগ্রাফির ক্যামেরায় যার ছবিও তোলা যায় না—সেই প্রভা কি সব সময়েই বস্তুটিকে ঘিরে থাকে, না বিশেষ অবস্থায় ঐ আলোর সৃষ্টি হয়?

এর উত্তর পেতে হলে আমাদের জানতে হবে পদার্থের একটি বিশেষ প্রাথমিক ধর্মের বিষয়ে। উচ্চ কম্পাঙ্কের বেতার স্পন্দন (pulse) উচ্চ বিভব প্রভেদে কোনো পরিবাহীর ভেতরে পরিচালিত করলে কী ঘটে?

একটি বিশেষ তড়িৎ বর্তনীতে একটি ক্যাথোড এবং একটি অ্যানোড আছে। মাঝে আছে বায়ু। এই বর্তনীতে যদি উচ্চ বিভব প্রভেদ সৃষ্টি করা যায় এবং যদি ক্যাথোড ও অ্যানোডের মধ্যে দূরত্ব যথেষ্ট কম হয় তবে কতকগুলো বিশেষ ঘটনা ঘটতে থাকবে।

ক্যাথোড থেকে ইলেকট্রন নির্গত হবে। বায়ুতে এসেই সেই নির্গত ইলেকট্রন বায়ুর উপাদানগুলোকে আয়নিত করবে। এইভাবে দুটো তড়িৎদ্বারের মাঝে অসংখ্য ইলেকট্রন সৃষ্ট হবে, এবং সেই সঙ্গে সৃষ্টি হবে অসংখ্য ধনাত্মক আয়নের। ইলেকট্রনের ভর অত্যন্ত কম। এই কারণে সে তীব্রবেগে অ্যানোডের দিকে ধেয়ে যাবে। এইভাবে অ্যানোডের গায়ে ইলেকট্রনগুলো ধাক্কা খাবার ফলে অ্যানোড থেকে আরো ইলেকট্রন বেরিয়ে আসবে এবং বায়ুর উপাদানের অণুগুলোকে আবার আয়নিত করবে। এভাবে মধ্যবর্তী অঞ্চলে ধনাত্মক আয়নের সংখ্যাও প্রচুর বেড়ে যাবে এবং ধনাত্মক আয়নগুলোও তীব্রবেগে ($১০^{৭}$-$১০^{৮}$ সে. মি./সেকেণ্ড) ক্যাথোডের দিকে ধেয়ে যাবে। উৎপন্ন হবে 'ইলেকট্রনের স্রোত' আর 'ধনাত্মক আয়নের স্রোত'—

পরস্পরের বিপরীত দিকে। এই স্রোতগুলোর মাথার দিকে উজ্জ্বল আলোকিত অংশ থাকে, ছোটো ছোটো বিন্দু বিন্দু আলোর বলের মতো। এই স্রোত আবার ক্যাথোড এবং অ্যানোড থেকে আরো বেশি সংখ্যক 'ফোটো ইলেকট্রনের' বিযুক্তি ঘটাবে। সব মিলিয়ে এই অঞ্চলে শক্তির একটা ঝড় উঠবে, যার থেকে আলোকশক্তি বেরিয়ে আসবে প্রচুর পরিমাণে।

আমরা কী দেখব?

আমরা দেখব ছোটো ছোটো আলোর 'বল' বিভিন্ন দিকে ছুটে যাচ্ছে। প্রতিটি বল পেছনে ফেলে যাচ্ছে অন্ধকার অন্তঃস্তল। এই গোলাগুলো বিভিন্নবর্ণের আর বিভিন্ন আকৃতির। এই ঘটনাটির নাম 'করোনা ক্ষরণ' (CoronŒ discharge)।

জড় এবং জীবিত যে কোনো বস্তু থেকেই বিশেষ অবস্থায় এই আলো বেরুবে। বিশেষ অবস্থার অর্থ, উচ্চ বেতার স্পন্দন যুক্ত উচ্চ বিভব প্রভেদের ক্ষেত্র। বস্তুটিকে অবশ্যই একটি তড়িৎদ্বার হতে হবে। আলোর বর্ণ নির্ভর করবে দুই তড়িৎদ্বারের মাঝে যে গ্যাস (বায়ুর ক্ষেত্রে প্রধানত নাইট্রোজেন) থাকবে তার প্রকৃতির ওপর এবং নির্ভর করবে তড়িৎদ্বারের রোধ বা resistance-এর ওপরেও।[৭]

অতএব যে অলৌকিক প্রভার কথা খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে, তার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্কই নেই। মানুষ মারা যাবার পরে 'প্রভাটি দেহ ছেড়ে ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে' এই ধারণাটি একেবারে ভুল। অধুনা প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রাণীদের ত্বকের রোধ তার শারীরিক এবং মানসিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে। অতএব মৃত ব্যক্তির ত্বকের রোধ অবশ্যই জীবিতাবস্থায় তার ত্বকের যে রোধ ছিল তার থেকে ভিন্ন হবে। অতএব 'করোনা ক্ষরণের' বর্ণ ও আকৃতিও অবশ্যই ভিন্ন হবে। সে কারণেই জীবিত এবং মৃত এই দু-অবস্থায় তোলা দুটো ছবি ভিন্ন রকমের দেখতে হয়েছে। একটা কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, সাধারণ অবস্থায় জড় বা জীবিত কোনো বস্তুরই কোনো প্রভা থাকে না। কিন্তু দুটো বস্তুই প্রভা সৃষ্টি করে একটি বিশেষ অবস্থায়। ইলেকট্রিক বাল্বের কথা ভাবুন। সুইচ না টিপলে অর্থাৎ বিদ্যুৎ বিভব বৈষম্য সৃষ্টি না করলে, বাল্বের ভেতরের তারটি মোটেই আলো বিকিরণ করে না। এখানেও ঠিক একই জিনিস। শুধু প্রকৃতি ও পদ্ধতিগত তফাত।

লেজহীন টিকটিকির লেজওয়ালা ছবি

কিরলিয়ান ফোটোগ্রাফির নাম করে অনেক জালিয়াতি হয়। এর ভেতরে একটি হলো লেজহীন টিকটিকির লেজওয়ালা ছবি। অথবা গাছের পাতা ছিঁড়ে নিয়ে গাছের ছবি তুলে দেখানো যে, যদিও পাতাটি ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে, তবুও তার অপচ্ছায়া গাছটির সঙ্গে জুড়ে আছে।

যতদূর মনে পড়ে কয়েক বছর আগে কলকাতার একটি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক এ-জাতীয় ছবি তুলে বেশ হৈ-হল্লা জুড়ে দিয়েছিলেন। এখানকার

পত্রপত্রিকা সে নিয়ে বেশ কদিন বাজার গরম করে রেখেছিল। কয়েকটি সেমিনারও তিনি করেছিলেন এবং সেখানে যথেষ্ট সংখ্যক লোক সমাগমও হয়েছিল। কিন্তু কিছু সচেতন বিজ্ঞানপ্রেমীর প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে এবং তাঁর কেরামতি ফাঁস হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখে তিনি 'সুবুদ্ধির পরিচয়' দিয়ে সে কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। অথচ এই বাঙলারই একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু বহু দিন আগে কিরলিয়ান ফোটোগ্রাফিকে গবেষণার কাজে লাগিয়েছিলেন। কোনো অলৌকিক প্রভার দাবি কিন্তু জগদীশ বসু করেন নি।[৮]

ছবি নিয়ে চাতুরি খুবই চমকপ্রদ এবং বিভ্রান্তিকর। চাতুরি ধরা পড়ে গেলে অবশ্য এতে আর বিভ্রান্তি থাকে না। লেজহীন টিকটিকির লেজওয়ালা ছবি কি করে তোলা যায় একটু ভাবা যাক।

একটা কাগজের ওপরে দুটো টিকটিকি রাখা হলো। জ্যান্ত টিকটিকি পালিয়ে যাবে অতএব হয় মৃত না হয় রবারের টিকটিকি নেওয়া যেতে পারে। একটি ক্যামেরা (কিরলিয়ান ক্যামেরার প্রয়োজন নেই) সেই ফ্রেমে ফোকাস করা হলো। এবারে কম 'অ্যাপারচার' দিয়ে (আবছা ছবি হবে) একবার 'সাটার' টেপা হলো। ক্যামেরা এবং ছবির ফ্রেমকে স্থানচ্যুত না করে সাবধানে একটি টিকটিকির লেজ কেটে নেওয়া হলো। এবারে বেশি 'অ্যাপারচার' দিয়ে (উজ্জ্বল ছবি হবে) একই ফিল্মে আবার ছবি নেওয়া হলো। এই ছবিতে দেখা যাবে একটি লেজওয়ালা স্পষ্ট টিকটিকির পাশে লেজকাটা আরেকটি টিকটিকি রয়েছে যার লেজের আবছা একটা ছায়া ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

এই ছবি তুলতে প্রয়োজন একজন দক্ষ ফোটোগ্রাফারের আর একটি ভালো সাধারণ ক্যামেরার। কিরলিয়ান ক্যামেরার কোনো প্রয়োজনই নেই এখানে। সুতরাং বিগত বস্তুর চিত্র তুলে ধরার যে 'অতীন্দ্রিয়' কেরামতি তার স্বরূপ নিশ্চয়ই আর অপ্রকাশ থাকে না।

ছবি দিয়ে আরো নানারকমের কৌশল করা যায়, যা নিয়ে একটি পৃথক আলোচনা করার সুযোগ আছে। তাই অন্যান্য কৌশলের আলোচনা এখানে আর করা হচ্ছে না।

আবার সেন্ট এলমো

মধ্যযুগে সেন্ট এলমোর আত্মপ্রকাশ—একই ভাবে করোনা ক্ষরণ-এর ফলেই ঘটেছিল। বজ্রবিদ্যুতের দিনে বায়ুতে তড়িতাধানের ঘনত্ব বেড়ে যায়। সেই সময়ে মাস্তুল আর তার সঙ্গে লাগানো ধাতব দড়িগুলো একটা তড়িৎদ্বার আর অন্য তড়িৎদ্বার আকাশের মেঘ। মাঝে বায়ু। উচ্চ বিভব প্রভেদে মাস্তুলের গায়ে করোনা ক্ষরণ হয়। কিন্তু মধ্যযুগে এই কারণটি জানা ছিল না। কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসে জর্জরিত মানুষের মনে অলৌকিক চিন্তার উদয় হয়েছিল। অন্য কোনো কারণ খুঁজে না পেয়ে তারা ভেবেছিল সেন্ট এরাসমাসের আত্মাই তাদের ত্রাণকর্তার ভূমিকায় উপস্থিত।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে যখন সেই ঘটনা ব্যাখ্যাত হলো, আবিষ্কৃত হলো আধুনিক যন্ত্র রোগ নির্ণয়ের জন্য তখনও মধ্যযুগীয় বিশ্বাস থাকল অটুট! দায়িত্বজ্ঞানহীন বিজ্ঞানী সহজেই তার যন্ত্রের ভেতরে অলৌকিকতার বীজ বপন করলেন। কাগজের পাতায় লক্ষ মানুষ তা পড়ল। এ এক অমার্জনীয় অপরাধ। অপরাধ সেই বিজ্ঞানীদের যারা 'অরা' বা অলৌকিক প্রভার পরিবর্তে 'করোনা ক্ষরণ' শব্দটি ব্যবহার করার জন্য আবেদন করা সত্ত্বেও নির্বিকার চিত্তে 'অলৌকিক প্রভা'কেই ব্যবহার করে চলেছেন, সমাজ-মনে এর ক্ষতিকর প্রভাব থাকার সম্ভাবনার কথা মনে না রেখেই কিংবা উদ্দেশ্যমূলকভাবেই তাঁরা এটা করছেন।

সূত্রপঞ্জী

1. *The Statesman* (Calcutta). 20 Feb. 1984
2. *Micropaedia (Encyclopaedia Britanica).* Vol 3. 15th ed.
3. O.Ostrander and L. Schroeder. *Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain,* Prentice-Hall. N.Y. 1970
4. W.A Tiller. *Proceedings of the First Western Hemisphere Conference on Kirlian Photography. Acupuncture and Human Aura.* May. 1972. Gordon and Breach. N.Y. 1972.
5. D.G Boyers and W.A Tiller. *J.App. Phys..* Vol. 44. p. 3102 (1973)
6. J.G. Marinho. *Impact of Science on Society.* Vol. 4. No. 4. pp.. 369
7. E. Nasser and L.B. Loeb.. *J. Appl. Phys..* Vol. 34. p. 3340 (1963)
8. P. Tompkins and C. Bird. *The Secret Life of Plants* Harper and Row. N.Y. (1973)

শঙ্কর ঘটক

ম ১১৮৫
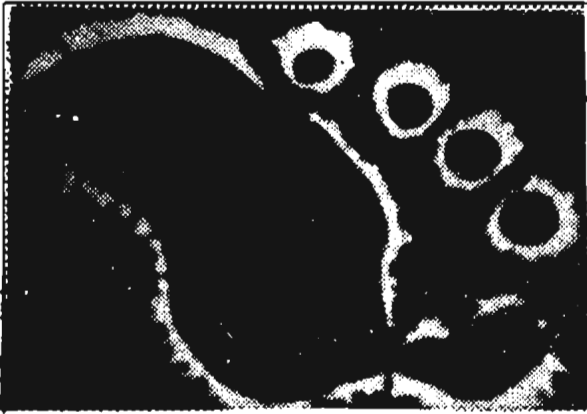
পাশের ছবিটা (নিউ ইয়র্কের মার্শাল ক্যাভেণ্ডিস প্রকাশনার *The Unexplained—the mystries of mind, space and time'*বই থেকে উদ্ধৃত) এক ব্যক্তির পায়ের চিত্র— জৈবিক প্রভা বা Aura দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। দাবি করা হচ্ছে— পায়ের চারপাশে ফুটে ওঠা প্রভার ধরন থেকে ওই ব্যক্তির শারীরিক সমস্যা জেনে ফেলা যায়। যেমন, এখানে বুড়ো আঙুলের ভেঙে যাওয়া প্রভার প্যাটার্ন- মানে হলো ওই ব্যক্তির কঠিন মাথাব্যথা রয়েছে। আর, নিচের ছটো ছবি দেখুন। একটা টিকটিকি । পাশে তার শরীর জুড়ে স্পষ্ট বিচ্ছুরিত হচ্ছে প্রভা বা Aura, তাই না? এরকম জ্যোতি কেবল দেবতা বা যোগী মহাপুরুষদের দেহ থেকে নিঃসৃত হয় বলেই শোনা যায় (যদিও সচক্ষে আমরা দেখি নি কেউ)। এখানে বেচারা টিকটিকির দেবত্ব বা

অলৌকিকত্ব অর্জনের কোনো সুযোগ নেই— নেহাৎ রব্যারের একটা টিকটিকি। অসুখ-বিসুখেরও বালাই নেই। ওর শরীর-জোড়া প্রভা বা জ্যোতি অবশ্যই স্বেচ্ছায় নির্গত হয় নি— ফটোগ্রাফি রুমে তৈরি করা হয়েছে। ফটোগ্রাফির এই কায়দাকে বলা যায় 'হ্যালো এফেক্ট'। পেছনে রাখা পর্দায় আলো ফেলে কিংবা ডার্করুমে নেগেটিভ থেকে ছবি প্রিন্ট করার সময় 'ডজার' ব্যবহার করে (অভিজ্ঞ হাতের কায়দায় আলো নিয়ন্ত্রণ করে) এরকম প্রভা বা জ্যোতি তৈরি করা যায়। অতি সহজ পদ্ধতি। একটু ফটোগ্রাফির অভিজ্ঞতা ও অভ্যাস থাকলে যে-কেউ এই প্রভা তৈরি করতে পারেন। ফটোগ্রাফার যত নিপুণ-হাতের হবেন, তত ভালো হবে প্রভার কাজ। এবার, ফটো বা ক্যালেণ্ডারে দেখা মহামানবদের জ্যোতি কিংবা ওপরের চিত্রে শা-এর জৈবিক প্রভা যে ফটোগ্রাফির কৌশলে তৈরি করা সম্ভব এ দাবি করা কি অসঙ্গত হবে?

টিকটিকির প্রভার ছবি কৃষ্ণচন্দ্র মাইতি ও সুব্রত নারায়ণ চৌধুরী

ভূত-প্রেত-আত্মার চিত্র

আপনি কি ভূতে বিশ্বাস করেন?

— দ্যুর! ভূত বলে আবার কিছু আছে নাকি? ওসব স্রেফ গাঁজা-গল্প। ... এরকম উত্তর প্রায় সকলেই দেবেন। এমনকি আজ-কালকার ছোটো ছেলেমেয়েরাও ভূতকে বেজায় অভক্তি করে থাকে।

আচ্ছা, আপনি কি আত্মা কিংবা অশরীরী কোনো অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন?

— ?? ... এবার কিন্তু অত সহজ স্বচ্ছন্দ উত্তর আসবে না। মনের ভেতর অনেক দ্বন্দ্ব, অনেক ধাঁধা নড়াচড়া করবে। প্রেতাত্মা বা পরলোকের প্রতি লুকোনো একটা বিশ্বাসের বীজ মনে আছে বটে, কিন্তু জোর করে বলার উপায় নেই কারণ যুক্তি-প্রমাণ কিছু নেই। তবে বেশ কিছু জনপ্রিয় বই আছে, প্রখ্যাত ব্যক্তির রচনাও আছে। ভরসা বলতে ওগুলোই। আত্মা-পরমাত্মা, অধ্যাত্মশক্তি, পরলোকচর্চা, মৃত্যুর পরের জগৎ, এরকম বিষয়ে নানাবিধ বাজার-চলতি বই আছে, আছে আর্ট পেপারে ছাপা অশরীরী আত্মার স্পষ্ট ছবি। এইসব বই আর ছবিগুলোই আধুনিক বিজ্ঞানের 'অবিশ্বাসী' বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রমাণ আর অকাট্য যুক্তি হিসেবে খাড়া হয়ে যায় ... কিন্তু সত্যিই কি ওগুলি প্রামাণ্য? সত্যিই কি অকাট্য তাদের দাবির যৌক্তিকতা? নাকি বৃহৎ কিছু ফাঁকি রয়ে গেছে ওইসব সচিত্র বক্তব্যে! দোদুল্যমান মনের সন্তুষ্টি আসে না, সংশয় যায় না। এহেন পরিস্থিতিতে সত্যিটাকে জানার বোঝার উপায় কি?

উপায় হিসেবে কোনো তাত্ত্বিক বিতর্কের অবতারণা আপাতত আমরা করছি না কারণ ওতে প্রকৃতপক্ষে মনের ধোঁয়া কাটে না। দুর্বলতা যেন থেকেই যায়। ঘুরেফিরে ভেতরের মনটা বলতে থাকে —কি জানি, হয়তো কোনো 'স্পিরিট' বা শক্তি কিছু সত্যি আছে, নাহলে ওরকম ছবি আসে কি করে। ছবি কিন্তু আনা যায় সহজেই। দিব্যি হাতে করে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক কায়দায় ওরকম 'বিদেহী আত্মা'র ছবি তৈরি করা যায় স্রেফ ফটোগ্রাফির কৌশল (trick) দিয়ে। যে-কেউ চেষ্টা করে করতে পারেন এটা। কোনো আধ্যাত্মিক বা আধিভৌতিক শক্তি লাগে না। কেমন করে সেটাই বলছি।

দু-জোড়া ফটো কম্পোজিশনের কাজ এখানে দেখানো হচ্ছে। চিত্র ১, আর চিত্র ২। চিত্র ১-এ অবিকল একই ধরনের পাশাপাশি দুটো চিত্র, মিডিয়াম ও বিদেহী আত্মা। বাঁদিকের ছবিটি স্বামী অভেদানন্দের লেখা বিখ্যাত বই *মরণের পারে* থেকে তোলা (বই-এর ২ নং ফটো প্লেট)। লেখকের দাবি অনুযায়ী প্ল্যানচেট বা প্রেতচক্রের

আসরে নিচের 'মিডিয়াম' ব্যক্তি মারফৎ ওপরের মহিলা প্রেতাত্মাকে ডেকে আনা হয়েছে পরলোক থেকে, তারই চিত্র। এবং ডানদিকের ছবি আমাদের নিজেদের তৈরি করা, পরীক্ষাগারের ফটোগ্রাফির ঘরে। কোনো প্রেতচক্রের ব্যাপার নেই। নিচে 'মিডিয়াম'-এর জায়গায় রয়েছেন ফটোগ্রাফার-শিল্পী স্বয়ং, চিত্রের কৌশল বা ট্রিক (trick)-এর কাজগুলি ইনিই করেছেন। ওপরে প্রেতাত্মার ভূমিকায় যার ছবি রয়েছে তিনি বর্তমানে পরলোকে নন, ভরপুর ইহলোকে বিদ্যমান; কলকাতারই এক ল্যাবরেটরিতে কর্মরত বিজ্ঞানী। প্রয়োজনে এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে সাধারণভাবেই দেখাসাক্ষাৎ করা সম্ভব, কোনো প্ল্যানচেট আসর বসানোর প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ বিদেহী আত্মা এখানে মানুষেরই হাতে তৈরি করা।

চিত্র ২-এও প্রায় একই চরিত্রের দুটো ছবি ওপরে-নিচে, যেন অনৈসর্গিক ধোঁয়ার সাম্রাজ্যে কিছু সন্নিবিষ্ট মুখ।

ওপরের ছবিটি সেই *মরণের পারে* গ্রন্থ থেকেই নেওয়া (৬ নং ফটো প্লেট)। ফটোটি একটু পুরনো তাই কোণায় পোকা-কাটার দাগ। গ্রন্থকার বলছেন, এখানে কয়েকটি বিদেহী-আত্মার সমাবেশ ঘটানো হয়েছে দেহ-নিঃসৃত এক বিশেষ পদার্থ 'এক্টোপ্লাজম'-এর সাহায্য নিয়ে। কিন্তু নিচের ছবিতে অনুরূপ ধোঁয়াচ্ছন্ন আধিভৌতিক প্রেক্ষাপটে কিছু মুখ-কে আমরা সন্নিবিষ্ট করেছি স্রেফ ফটোগ্রাফির কারিকুরির সাহায্যে, কোনো 'এক্টোপ্লাজম' (আধুনিক বিজ্ঞানে যার হদিশ আদৌ জানা নেই)-এর সাহায্য নিয়ে নয়। এখানে যাদের মুখগুলি দেখা যাচ্ছে কম্পোজিশনের মধ্যে, তাদের কেউই আজ পর্যন্ত পরলোকের সন্ধান পান নি, দিব্যি জীবিত রয়েছেন এই সমাজেরই এখানে-ওখানে। আমরা স্বেচ্ছায় পরীক্ষাগারে বসে এদের 'প্রেতাত্মা' বানিয়েছি কেবল ওপরের তথাকথিত 'প্রামাণ্য' দলিলের সঙ্গে তুলনা করতে। ... পাঠক সহজেই এবার ফটোর ফাঁকি আর ফন্দিবাজী বুঝে যাবেন।

কেমন করে হয়

প্রেতাত্মা সৃষ্টির কৌশল যে-কেউ আয়ত্ত করতে পারেন আগেই বলেছি, কেবল ফটোগ্রাফির কাজে কিছু অভিজ্ঞতা আর উপযুক্ত নিপুণতা অর্জন করা দরকার।

আমাদের ১নং চিত্রের কাজে প্রথমে প্রেতাত্মার ভূমিকায় অবতীর্ণ মহিলা-বিজ্ঞানীর ছবি, আর মিডিয়াম-এর ভূমিকায় চিত্রকুশলীর নিজের ছবিটি আলাদা করে তোলা হয় একদম কালো ব্যাকগ্রাউণ্ড রেখে (পেছনে বড় কালো বোর্ড বসিয়ে নেওয়া হয়)। এতে দুটো নেগেটিভ হলো। এবার অন্ধকার ফটোগ্রাফি-ঘরে ফটো পেপারের ওপর প্রথমে মিডিয়াম-এর ছবি ফেলা হলো নিচের দিকে। তারপর এনলার্জার যন্ত্র থেকে মিডিয়াম-এর নেগেটিভ সরিয়ে মহিলার নেগেটিভ ঢোকানো হলো এবং ওই একই ফটো পেপারটির ওপরদিকে মহিলার ছবি ফেলা হলো ঝাপসা করে, যাকে বলে 'আউট অফ ফোকাস' করে নিয়ে। ব্যস্, এরপর শুধু পেপারটা ডেভেলাপ করে নেওয়া। একে বলা হয় মনটাজ পদ্ধতি। পদ্ধতিটা সহজ, তবে দুটো ছবি মেলানো,

আলোর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ এবং ফিনিশিং টাচ-এর জন্য আলোকচিত্রীর দক্ষতা বড়ো ব্যাপার।

২ নং চিত্রের কাজে প্রথমে কিছু পছন্দ মতো মুখের ফটো জোগাড় করে নেওয়া

[illegible]

হয়। যে মূল ছবির 'ডুপ্লিকেট' করা হবে সেই ছবির মুখের সাইজের সঙ্গে মানানসই মুখ খুঁজে নিতে হবে। একটি কালো শিট পেপারের ওপর সাদা পোস্টার কালার দিয়ে ধোঁয়ার মতো ছবি এঁকে নেওয়া হলো। তারপর সংগৃহীত মুখের ফটোগুলি

চিত্র ১: [illegible] তৈরি চিত্র

সাবধানে কেটে কেটে আঠা দিয়ে ওই রং-করা কালো কাগজের ওপর জায়গা মতো সেঁটে দেওয়া হলো। ম্যাটার তৈরি হয়ে গেল। এবার শুধু ক্যামেরায় এর ছবি তুলে সাইজ মাফিক প্রিন্ট করে নিলেই হয়। এ-ছাড়াও অন্য একাধিক পদ্ধতিতে এ রকম

চিত্র ২

একটোপ্লাজমের সাহায্য নিয়ে বিদেহী-আত্মার প্রকাশ। [বই]

ফটোর প্লেটে প্রেতাত্মার সমাবেশ ঘটানো যায়, তবে সব ক্ষেত্রেই আলোকচিত্রীর হাতের নৈপুণ্যের ওপর ছবির গুণাগুণ নির্ভর করবে।

চিত্র ২ : পরীক্ষাগারে তৈরি ছবি

উপসংহারে

সুতরাং ফটোর কারিকুরি দিয়ে যে ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও প্রতারণা করা অসম্ভব নয়, সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

বলে রাখা ভালো, বর্তমান রচনাটিতে আমরা স্বামী অভেদানন্দের *মরণের পারে* বইটিকে নিছক নমুনা হিসেবেই নিয়েছি। এরকম আরো বিস্তর বই রয়েছে দেশী বিদেশী সব ভাষাতেই। পরলোক, প্ল্যানচেট, অলৌকিক, দৈবিক, ধর্ম-মাহাত্ম্যের নানা বইতে চমকপ্রদ সব তথাকথিত 'অতি-প্রাকৃত' চিত্র দিয়ে অপার্থিব কোনো অস্তিত্বকে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এদের যে-কোনো একটিকে নিয়ে ঠিকমতো পরখ করলেই প্রকৃত সত্য বের করা যাবে।

এর জন্য অবশ্য সবার আগে দরকার অতি যত্নে লালিত নিজের গোপন অনড় বিশ্বাসের আগলটিকে ভাঙা। তা নাহলে প্রতারিত হতেই হবে কি বাইরের জগতে, কি ভেতরের।

উপস্থাপনা : অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোকচিত্রী : সুব্রত নারায়ণ চৌধুরী এবং আরো তিনজন ফটোগ্রাফার-এর একটি দল

[illegible]

সত্যি না ভাঁওতা

১

ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ করে অন্ধকার করে নিন ভেতরটা। এবারে টেবিলের ওপর রাখুন একটি বস্তু। পেপার ওয়েট কিংবা জলের গ্লাস। একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে তার আলোটা ফেলুন বস্তুটার ওপরে। আপনি একটা চেয়ারে বসুন, বস্তুটির সামনে। ঠিকমতো মনঃসংযোগ করুন বস্তুটির ওপর। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে। যদি ঠিকঠাক সব কাজ করতে পারেন আর আপনার মনঃসংযোগ যদি যথেষ্ট হয় তাহলে ওদের কথামতো অবশ্যই এক অভাবিত ঘটনা দেখতে পাবেন।

বস্তুটি নিজের থেকেই সরে সরে যাচ্ছে। পৃথিবীর অভিকর্ষজ টান অথবা টেবিলের ঘর্ষণজনিত বাধা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, বিজ্ঞানের সূত্রগুলোকে কাঁচকলা দেখিয়ে, এমনি একটি চমক লাগানো ঘটনা ঘটতে পারে। বস্তুটিকে তখন আপনি আপনার ইচ্ছাশক্তি দিয়ে যত্রতত্র নাড়াচাড়া করাতে পারবেন। শূন্যে তুলে আবার টেবিলের ওপর আছাড় মারতেও পারবেন। এই ঘটনাটিকেই বলে সাইকোকাইনেসিস (PK) সাইকোর অর্থ মনস্তাত্ত্বিক, আর কাইনেসিস্ অর্থে গতি। বাংলা করলে দাঁড়াবে মনস্তাত্ত্বিক গতি।

ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত লাগছে কি? কিন্তু এমনই চেষ্টা শতসহস্র নরনারীকে করতে দেখা গেছে কয়েক বছর আগেই, এদেশে নয়, বিদেশে। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত চেষ্টা করেও কিন্তু কাউকে সফল হতে দেখা গেল না। ... একাদিক্রমে দু-মাস চেষ্টা করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল এডমণ্ড চার্লস—আমাদের কাহিনীর নায়ক।

কিন্তু স্বচক্ষে দেখা যে ব্যাপারটা! তাহলে...

২

ইউরি গেলারের নাম তখন বিদেশ ডিঙিয়ে এদেশেও এসে পৌঁছেছে। অতি-সংবেদনশীল ক্ষমতার (ESP) অধিকারী ইউরি গেলার সোরগোল তুলেছে বিশ্বের সর্বত্র। প্রকৃতির কড়া নিয়মের অনুশাসন না মেনে সব জড়বস্তুগুলো গেলারের ইচ্ছাশক্তির দাসে পরিণত হয়েছে। ধরা যাক, চার্লস্‌ও ছিল সেদিনের সেই অনুষ্ঠানে।

বিশাল প্রেক্ষাগৃহের অন্ধকার একটি কোণে একা একা তন্ময় হয়ে চার্লস লক্ষ্য করছে মঞ্চে বসে থাকা ESP ক্ষমতাধরের অপূর্ব কর্মকুশলতা।

একটা টেবিলের ওপর শক্ত করে বাঁধা লম্বা উঁচোনো ছুরিটা। চারদিক থেকে অতি উজ্জ্বল আলো ঝকমকে রিফ্লেক্টারে প্রতিফলিত হয়ে এসে মিলিত হচ্ছে ছুরিটার ওপর। একাগ্রচিত্তে গভীর মনঃসংযোগ নিয়ে টেবিলের অপরপ্রান্তে বসে আছেন

বিস্ময়কর ক্ষমতার অধিকারী, ইউরি গেলার। তাঁর তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি ছুরিটার দিকে নিবদ্ধ। আর, সমগ্র প্রেক্ষাগৃহের অগণিত দর্শক নির্বাক, নিস্তব্ধ। চোখ তাদের মঞ্চের দিকে।

দু-ঘণ্টা কেটে গেল এভাবে। অনেকেই ইতিমধ্যে ধরে নিয়েছেন প্রেক্ষাগৃহের প্রবেশমূল্যটাই জলে গেল। মঞ্চে ওসব অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ কিছুতেই সম্ভব নয়।

একাগ্রচোখে তাকিয়ে আছে চার্লসও। সে বুঝতে চায়। এত যখন ঘটনা, এত যখন সোরগোল, একটা কিছু যে এর মধ্যে আছে এ-ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই তার। যারা ধরে নিয়েছিলেন পুরো ব্যাপারটাই ধোঁকাবাজি আর যারা বসেছিলেন অসীম আগ্রহে অপেক্ষা করে—সবাইকেই সমানভাবে অবাক করে দিয়ে ঘটল ঘটনাটা। ছুরিটা ধীরে ধীরে বেঁকতে শুরু করল। প্রেক্ষাগৃহ ফেটে পড়ল তুমুল করতালি ধ্বনিতে। যখন প্রায় ধনুকের মতো বেঁকে গেল ছুরি, মঞ্চে পর্দা নেমে এলো ধীরে ধীরে।

ইউরি গেলার ধন্য! ... আর, আমরা দেখতে পেলাম, এডমণ্ড চার্লস্ চিন্তিত!!

৩

স্ট্যান্ডফোর্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটে ইউরি গেলারের ওপর পরীক্ষা চালানো হবে।[১] অধ্যাপক এইচ. পুটহফ্ পরীক্ষাটি পরিচালনা করবেন। উপস্থিত আছেন বিজ্ঞান জগতের অনেক দিক্‌পাল।

নেচার পত্রিকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি এসেছেন সাইকোকাইনেসিস সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করতে। এই বিখ্যাত পত্রিকাটিতে যদি সমর্থনসূচক কোনো প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তবে সোরগোল-তোলা এই অবাক প্রক্রিয়াটি বিজ্ঞানের আসরে নিজের স্থান করে নিতে পারবে।

আর এসেছেন পাশ্চাত্যের একটি দূরদর্শন সংস্থার প্রযোজক ও পরিচালক গেনে রোভেনবেরিস্। 'স্টারট্রেক' নামের অনুষ্ঠানটি আজ জনপ্রিয়তার শীর্ষে। বিগত এক দশকের দূরদর্শন অনুষ্ঠানের জনপ্রিয়তার রেকর্ড এই 'স্টারট্রেক', যেখানে দিনের পর দিন মাসের পর মাস ধরে একনাগাড়ে দেখানো হয়েছে সাইকোকাইনেসিসের বহু খেলা। অনুষ্ঠান চলাকালে বহু ব্যক্তি তাদের ছুরি অথবা চামচ ধরত দূরদর্শনের পর্দার সামনে বেঁকে যায় কিনা দেখার জন্য? 'স্টারট্রেক' অনুষ্ঠানের প্রযোজক সেই বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিটি তাঁর ক্যামেরা নিয়ে উপস্থিত।

আসবার কথা আর একজনের—অচেনা অজানা। (কিন্তু আমাদের পাঠকদের চেনা) পনেরো ষোল বছরের একটি তরুণ, এডমণ্ড চার্লস্।

পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হবার আগে একটি আলোচনা সভা। সেই সভায় ভাষণ দিচ্ছেন এ. পি. ডুব্রোভ। ডুব্রোভ তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে সাইকোকাইনেসিস সম্পর্কে কিছু তত্ত্ব ও তথ্য[২] পেশ করলেন :

'... দেখা গেছে মানুষ বিশেষ মানসিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে যে কোনো বস্তুকে

স্থানচ্যুত করতে পারে। এ-প্রসঙ্গে ই. গিরডেম[৩] এবং জে. প্র্যাট ও এইচ. নকেইলের[৪] নাম করা যেতে পারে। কিন্তু সমস্ত মানুষই একই মাত্রায় এই ক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম নয়। এই ব্যাপারে বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন এম. কুলাগিনা; ই. এরমোলিয়েভ; টি. ভাভাসেভ; আই. সোয়নি এবং ...' বলেই একটু ইঙ্গিত পূর্ণ হাসলেন ডুব্রোভ—'আমাদের ইউরি গেলার।'

একটু থেমে তিনি আবার শুরু করলেন। 'আমাদের চেতনাকে এমন পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব যখন সেটি (চেতনা) শরীরের অণুগুলোকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করবে। সে (চেতনা) এমনকি শরীরের বাইরের অণুগুলোকেও প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম হবে। অর্থাৎ আমরা শরীর-বহিঃস্থ যে কোনো বস্তুকে হাত দিয়ে না ছুঁয়ে, তড়িৎ প্রয়োগ না করে, চুম্বক ধর্মকে কাজে না লাগিয়ে এবং কোনো যন্ত্র প্রয়োগ না করেই ইচ্ছেমতো স্থানচ্যুত করতে পারব।'

কথাগুলো আরেকবার রোমাঞ্চিত করল এডমণ্ড চার্লসকে।

'এবার সংক্ষেপে এই বিশেষ ধরনের বলের বৈশিষ্ট্যগুলো বলছি : ১. এই বল কাছ থেকে অথবা দূর থেকে প্রযুক্ত হতে পারে। ২. এই বলকে বিশেষ দিকে পরিচালনা করা এবং একবিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করা সম্ভব। ৩. এই বল ঋণাত্মক অর্থাৎ বিকর্ষক এবং ধনাত্মক অর্থাৎ আকর্ষক হতে পারে। ৪. এই বলক্ষেত্র সংবাদ বহন করতে সক্ষম। ৫. এই বল কোনো বলক্ষেত্রের শক্তিকে ভরযুক্ত পদার্থে রূপান্তরিত করতে পারে। ৬. এই ধরনের বলক্ষেত্র বলের উৎসের অবর্তমানেও কার্যকর থাকে। ৭. এই বিশেষ বল অন্য যে কোনো ধরনের শক্তি ও বলে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে।' ডুব্রোভের বক্তৃতা শেষ হলো।

এডমন্ড চার্লস আবার গভীর মনোনিবেশে দেখল মঞ্চের ওপর অদ্ভুত সব কার্যকলাপ— গেলার শুধু চোখের দৃষ্টি দিয়ে একটা ছুরি, একটি চামচ এবং একটি চাবি অবলীলাক্রমে বেঁকিয়ে দিল।

***

এডমন্ড চার্লস ছুটছেন এক পত্রিকা অফিস থেকে অন্য পত্রিকা অফিসে। 'স্যার, আপানারা পাতার পর পাতা ছেপেছেন ইউরি গেলারের অলৌকিক কৃতিত্বের কথা। আমার জন্য অন্তত দু-সেন্টিমিটার জায়গা দিন আপনাদের কাগজে। আমার কিছু বলার আছে।'

বক্তব্য ওর অনেকেই শুনল, ছাপল না কেউ। গরম গরম খবর ছাপিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা হচ্ছে। এই ছেলেটি উল্টোপাল্টা যুক্তি দিয়ে সে-সব ভেস্তে দিতে চায়। শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে গিয়ে শেষ চেষ্টা করল চার্লস। সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানাল তাবৎ বড় বড় সাইকোকাইনেসিস প্রবক্তাদের। নিজেই আয়োজন করল একটি অনুষ্ঠানের। সেখানে সে দেখাবে ছুরি, চামচ বা চাবি বেঁকাবার কায়দা। নিমন্ত্রণ করল বড় বড় কাগজওয়ালাদের।

সভায় ভিড়ও হলো। ESP ক্ষমতাধরদের মতো একই ঢঙে সে সাজালো মঞ্চ। খানিকটা কৌতুকভরা চোখে দর্শকরা উপভোগ করতে লাগল এই ছোটো ছেলেটির

খেলা এবং আশ্চর্য হয়ে গেল সবাই, ঠিক প্রখ্যাত 'ক্ষমতাবানদের' মতোই ছুরি, চামচ বা চাবি সবই সে বেঁকিয়ে ফেলেছে শুধু চোখের দৃষ্টি দিয়ে।

দিগ্বিজয়ী বীরের মতো মঞ্চে উঠে দাঁড়াল চার্লস্—'এই খেলাটি কিন্তু খুবই সোজা। আপনারাও অনায়াসেই দেখাতে পারেন এটি। এর জন্য কোনো মনো-সংযোগের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন একটি দ্বিধাতব পাতের। দুটি ভিন্ন ধাতুর পাতলা পাত, যেমন লোহা আর তামা। একসঙ্গে পাতদুটিকে জুড়ে দিয়ে তারপর ঐ জোড়া পাতকে উত্তপ্ত করলেই তা বেঁকে যাবে। প্রাথমিক বিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞান দিয়েই এটি ব্যাখা করা যায়।

যে কোনো বস্তুকে উত্তপ্ত করলেই তা প্রসারিত হয়। এই তাপীয় প্রসারণ কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় হয়। একই তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে লোহার পাত যতটা প্রসারিত হবে, তামার পাত হবে তার চাইতে বেশি। যদি ধাতুদুটিকে জুড়ে নেওয়া যায় তবে ভিন্নমাত্রায় প্রসারণের জন্য জোড়াপাতটি একদিকে বেঁকে যায়। উত্তপ্ত করার কাজটা আমি করেছি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাতির উজ্জ্বল আলো-কে ব্যবহার করে। বাতি থেকে অপেক্ষাকৃত কম তাপ আসে বলে উত্তাপণের কাজটা হতেও বিলম্ব ঘটেছে। ফলে আমার সুবিধা হয়েছে মনোসংযোগের অভিনয় করতে। তামার ছুরি, চামচ বা চাবি, সবই এই দ্বিধাতব পাত দিয়ে তৈরি।

এই প্রসঙ্গে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার প্রবক্তাদের তাত্ত্বিক আলোচনাটিরও একটু ব্যাখ্যা চাই। বিশেষ ধরনের মনোসংযোগজনিত বলের বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে যা বলা হচ্ছে (ডুব্রোভের বক্তৃতা) তা একবার ভেবে দেখুন। ছয় নং বৈশিষ্ট্যটি বাদ দিলে বাকিগুলো প্রকৃতিবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সূত্র। নতুন কিছু নয়। ওগুলো আলোচনা করা হয়েছে সাধারণ মানুষকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্ত করার জন্য। আর ছ-নং সূত্রটি ভুল। একটা প্রজ্জ্বলিত বাতিকে নিভিয়ে দিলে, তার আলোও আর থাকে না। একথা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন হয় না।'— একনাগাড়ে বক্তৃতা করতে করতে একটু থামে চার্লস। তারপর হাল্কা হাসির ছটায় তার সুন্দর তাজা মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। 'আর ওদের কথা?' সবাই বুঝতে পারে কাদের কথা বলছে ও। গিরডেন, প্র্যাট, কেইল, কুলাগিনা, এরমোলিয়েভ, ডাভাসেভ, গেলার, সোয়ান, এরা সব। সাইকোকাইনেসিস দেখিয়ে যারা রাতারাতি বিখ্যাত হয়েছে।

'ওদের কথা বিশেষ কিছু বলার নেই। ওদের থেকে ভালো ও দক্ষ যাদুকর পৃথিবীর সর্বত্রই আছে। তফাৎ শুধু একটাই যে, সৎ যাদুকরেরা কখনই বলেন না তাঁরা অলৌকিক কিছু করছেন। তাঁরা বলেন, যাদুকরের কাজ মানুষকে আনন্দ দেওয়া। এদের কাজ মানুষকে ঠকানো এই যা; এদের কথা ভাবলে ভারতবর্ষের "বাবা" দের কথা মনে পড়ে। তারাও এ-ধরনের অনেক যাদুবিদ্যা দেখান। তফাৎ শুধু একটাই, ভারতবর্ষের "বাবারা" ধর্মের নামে যে কাজটি করেন , এরা তা করার চেষ্টা করেন বিজ্ঞানের নামে। "বিশ্ববিখ্যাত সাইকোকাইনেসিস প্রবক্তারা" কেউ বা আলোক বিভ্রম (optical illusion) কে ব্যবহার করে, আবার কেউ বৈদ্যুতিক ঘূর্ণায়মান মোটরকে ব্যবহার করে এইসব খেলা দেখান। আবার কেউ কেউ সহজতম পদ্ধতি,

দ্বিধাতুপাতের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তাপীয় প্রসারণের ধর্মকেও কাজে লাগাতে পারেন।'

প্রচণ্ড হৈ হট্টগোলের মধ্যে সভা শেষ হলো। কোনো কাগজেই অবশ্য ও খবর প্রকাশিত হলো না। কেননা চার্লসের অনুষ্ঠানের খবরটা বাস্তবে প্রকাশিত হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু *নেচার*পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল একটি সংবাদ। তাতে মন্তব্য করা হয়েছিল 'স্ট্যানফোর্ডের সমীক্ষাকারী দলটি এমন সমস্ত উপায়ে পরীক্ষাটি পরিচালনা করেছেন যা সন্দেহজনক এবং বিশ্বাসযোগ্য নয় এবং পরীক্ষা পরিচালনার পদ্ধতি তারা ইচ্ছাকৃতভাবেই পরিষ্কার করে জানান নি।'

অর্থাৎ, ইউরি গেলারের পরীক্ষাটি বিজ্ঞান সমর্থিত নয়।

[লেখাটির কথা ভাবতে ভাবতে মনে হয়েছে এডমণ্ড চার্লসের কথা। এমনই একটি দ্বান্দ্বিক চরিত্র যদি সত্যিই সেদিন বাস্তবে উপস্থিত থাকত স্ট্যানফোর্ড ইনস্টিটিউটে! তাহলে গেলারের যাদুকরী কৌশল সেদিনই কি ধরা পড়ে যেত না? কার্যত ঠিক এমনটি ঘটে নি, কারণ চার্লস বাস্তব কোনো চরিত্র নয় —কাল্পনিক, যুক্তিবাদী মন একটা। সে ছাড়া রচনার বাকি সব চরিত্রগুলিই বাস্তব, ঐতিহাসিক। তাঁরা এখনও বেঁচে আছেন আর চেষ্টা করে চলেছেন নতুন কোনো ধোঁকাবাজির চটক দেখানোর জন্য। মানুষকে বোকা বানিয়ে অর্থ উপার্জনের ফিকির, যার উপরি-পাওনা হলো সাধারণ মানুষগুলোর মনে যুক্তিবিচারের প্রবণতাকে তিলে তিলে নির্জীব, পঙ্গু ও নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া। অবশ্যই চার্লস্-এর কাল্পনিক দ্বিধাতব পরীক্ষা ও তার দু-চারটে মন্তব্য থেকেই অতীন্দ্রিয়বাদ-এর ধ্বজাধারীদের অপদার্থতা প্রমাণিত হয়ে যায় না। তবে যে ধরনের আপাত-অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডকে সামনে রেখে ঐ অধ্যাত্মশক্তির দাবিদাররা তাদের ক্ষমতা প্রমাণের চেষ্টা করেন সে-রকম একটি ঘটনার ফাঁকি (বা জালিয়াতি) উন্মোচনের মাধ্যমে ESP-র নায়কদের স্বরূপ উদ্ঘাটনের প্রক্রিয়ার দিকটি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে—লেখক]

গ্রন্থপঞ্জী

1. Muses.C.. " Pri a new diemnsion in the Science." *Impact of Science on Society.* 24.309 (1974)
2. Dubrov, A. P. "Biogravitation & Psychotronics" *ibid.* 24.311 (1974).
3. Girden, E.. " A Review of Psychokynesis (PK)" *Psychological Bulletin.* 59.353 (1962)
4. Pratt.J & H Keil. " Firsthand Observations of Nina Kulagina Suggestive of PK Upon Static Objects". J Amer. *Soc. Psych. Res.* 67. 38 (1977).
5. Forward.H.. "Mind Matter & Gravitation" *Parapsychological Monograph.* No. 11 (1969)

শঙ্কর ঘটক

১৯৮৫

সুনিপুণ জালিয়াতি ও বিজ্ঞানীরা

কিছুকাল আগেও যা ছিল ধর্মের আস্তাকুড়ে, কুসংস্কারের আচ্ছাদনে ভাববাদী দর্শনের ছত্রছায়ায়, ঊনবিংশ শতকের শেষ দিক থেকে তা-ই চলে আসার চেষ্টা করল বিজ্ঞানের পক্ষপুটে। ক্ষমতাশালী বিজ্ঞান-জানা সব ব্যক্তিদের আশ্রয়লাভে ধন্য হলো 'অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার' চটকদার ঘটনাবলী—টেলিপ্যাথি, আলোকদর্শন (Clairvoy-ance), পূর্বোপলব্ধি (Precognition), মনোবল গতি (Psychokinesis)। তথাকথিত পরাবিজ্ঞানীরা পরীক্ষাগারের চার দেয়ালের মাঝে 'অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি'র পরীক্ষা করলেন। বিশ্বের অন্যতম সেরা বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশিত হলো টেলিপ্যাথি-অলোক দর্শন সংক্রান্ত 'অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা'র নিবন্ধ। কিন্তু তবুও 'পরাবিজ্ঞান' বিজ্ঞানের মর্যাদা পেল না। অন্তরালের জালিয়াতি ফাঁস হয়ে গেল ক্রমে ক্রমে।

***

বিশ্বের বিস্ময়! অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অভূতপূর্ব সমাহার হয়েছে যে ছেলেটির মধ্যে তার নাম ইউরি গেলার। দামী আংটি, সৌখিন ঘড়ি এই ধরনের মহার্ঘ্য বস্তুসামগ্রীকে ভেঙে ফেলেছেন, উধাও করে দিয়েছেন, পাল্টে ফেলেছেন চোখের নিমেষে ইউরি—তার অলৌকিক ক্ষমতাবলে। পাশ্চাত্য জগৎ বিস্ময়ের সঙ্গে চেয়েছে এই অবিশ্বাস্য ক্ষমতাধর ছেলেটির দিকে...। ইউরি গেলার!

বিজ্ঞানী ডক্টর অ্যানড্রিজা পাহারিক এই ছেলেটিকে খুঁজে এনেছিলেন ইজরায়েল থেকে। নিয়ে এসেছিলেন আমেরিকার শহরে, নিয়ে গিয়েছিলেন ইংল্যাণ্ডে—ইউরোপে। পাহারিক বলেন, 'এ ছেলেটি অ্যালকেমিস্টদের ধাঁধিয়ে দিয়েছে, সিসাকে পরিণত করেছে সোনায়, উড়ন্ত চাকির সঙ্গে সে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে, হাজার হাজার মাইল দূর থেকে চোখের নিমেষে নিয়ে আসতে পারে যে কোনো বস্তু (Teletransportation) শুধুমাত্র মানসিক ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে।'

গেলারের কথা ভারতবর্ষের পত্রপত্রিকায়ও বহুবার লেখা হয়েছে। তবে এদেশের কম মানুষই তাকে চেনেন। হয়তো কারণটা এই যে, এরকম চরিত্র এ-দেশেও আছে অনেক, যাদের কার্যকলাপ ইউরিরই মতো।

এখন পত্রপত্রিকায় প্রায়ই একটি বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। 'আপনার একটি ছবি পাঠান। তার সঙ্গে পঁচিশটি টাকা। ম্যাগনেটো থেরাপি করে আপনার সমস্ত রকম রোগের নিরাময় করা হবে।' জলপড়া, তেলপড়া, মন্ত্রতন্ত্রের প্রভাব এখন শহর ছেড়ে গ্রামাঞ্চলের দিকে সরে সরে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের প্রতি মানুষের ক্রমবর্ধমান আস্থার ফলে পুরনো কায়দায় ফললাভের সম্ভাবনা কমে যাচ্ছে। এমন অবস্থায় 'ক্ষমতাধর পুরুষ'দের

নতুন কায়দা অবলম্বন করতেই হবে। অতএব বিজ্ঞানের গন্ধ গায়ে লাগিয়ে পুরনো বুজরুকি বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে। বিজ্ঞাপনে দেখছি, কোষ্ঠিবিচার করা হচ্ছে কম্পুটারে, জ্যোতিষশাস্ত্র চলে যাচ্ছে কম্পুটারের মগজে, ইত্যাদি।

এই সুযোগে অর্থ-খ্যাতি-প্রতিপত্তির লোভে বিজ্ঞানীরা এসেছেন অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার ব্যাখ্যায়। কিছু বিজ্ঞানী সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেছেন অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অস্তিত্বের তত্ত্বে। আর বেশিরভাগ বিজ্ঞানী এ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। একটা ক্ষুদ্র অংশ অবশ্য এর প্রতিবাদ করছেন কিন্তু প্রচার মাধ্যমগুলোতে এই প্রতিবাদ স্থান পায় না, স্থান পায় অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা অস্তিত্বে বিশ্বাসী বিজ্ঞানীদের বক্তব্য। তেমনি একজন বিজ্ঞানী ডক্টর অ্যানড্রিজা পাহারিক। ডক্টর পাহারিক একজন বিত্তবান ডাক্তার যার পেটেন্টের সংখ্যা ষাটের ওপর। ১৯৬০ সালের পর তার আবিষ্কারগুলো ছিল মূলত বধিরদের শ্রবণদানের জন্য নানা ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি।

ইজরায়েলে ভ্রমণকালে তিনি দেখলেন একজন অখ্যাত যাদুকরের যাদু প্রদর্শন। দেখে তিনি মুগ্ধ। খবর নিয়ে জানলেন, মঞ্চে যাদু প্রদর্শন ছাড়াও ছেলেটি 'পুরুষ মডেল' হয়ে বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে কাজ করে। চমৎকার দেখতে, ফুটফুটে, চালাকচতুর ছেলে। মনোমুগ্ধকর ব্যবহার, মিষ্টি হাসি দিয়ে জগৎ জয় করতে পারে। দেখলেই যে কেউ ছেলেটির প্রতি মমত্ব অনুভব করবে।

ঠিক এমনি একটি ছেলে তার প্রয়োজন। ক্ষিপ্র চালচলন, অনর্গল কথা বলে যাবার ক্ষমতা, এক সাথে একাদিক্রমে একাধিক কাজ করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেওয়া!!

পাহারিক মনে মনে তার পরিকল্পনা ঠিক করে নিয়েছেন। এবারে তার উদ্ভট তত্ত্বটি বাজারে ছাড়া চলবে। তত্ত্বটি বেশ কয়েক বছর ধরেই তার মাথায় ঘোরাফেরা করছিল। অতীন্দ্রিয় জগতের এক বিশেষ শক্তি, যার নাম দিয়েছেন তিনি হুভা (Hoova) . সেই শক্তিটি তার সঙ্গে নাকি পারলৌকিক অবস্থা নিয়ে প্রায়ই বিশেষ এক ভাষায় আলাপ আলোচনা করে। সেই ভাষার তিনি নাম দিলেন স্পেকট্রা (Spectra)[১]। দানিকেন বাজার মাত করে ছেড়েছেন, বারমুডা ট্রাঙ্গেল, ইউ এফ কাহিনীর প্রবক্তারা লক্ষ লক্ষ ডলার রোজগার করেছেন, অতএব সময়মতো আরেকটি উদ্ভট তত্ত্ব! তত্ত্বের সমর্থনে প্রমাণ দেওয়া যাচ্ছিল না। পাহারিকের চিন্তা ছিল সেটাই। অবশেষে খুঁজে পেলেন তিনি ইজরায়েলের যাদুকর ছেলেটিকে। এই সেই ইউরি গেলার।

দূরদর্শনের পর্দায় অনুষ্ঠানের পর অনুষ্ঠান। মঞ্চে, অফিসে. ক্লাবে, সাংবাদিক সম্মিলনে, সিনেমায় সর্বত্র ইউরি গেলার।

অভূতপূর্ব অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী ইউরি গেলার!

তাল বুঝে বই লিখলেন পাহারিক—তার তত্ত্ব দিয়ে, আর ইউরিকে প্রমাণ রেখে। ইউরির সঙ্গে পরলোকের সেই শক্তিটির যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছেন তিনি। এই চমৎকার পরিকল্পনার ফল লাভ হলো হাতে হাতে। *ইউরি* নামের বইখানি লক্ষ লক্ষ

কপি বিক্রি হয়ে গেল।

রাতারাতি বিখ্যাত হলেন অ্যানড্রিজা পাহারিক। আর ইউরি গেলার? তাকে নিয়ে চলছে তখন তুমুল আলোড়ন। অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার প্রবক্তারা তত্ত্বের[২] বান ডাকালেন। 'আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মিলন' করলেন পরপর। ঢক্কানিনাদে ঘুম ভাঙল অনেকের। চাপে পড়ে বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানও এবারে এই বিষয়ে মাথা ঘামাবর চেষ্টা করতে শুরু করল। ইউনেস্কো থেকে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হলো শুধু পরাবিজ্ঞান নিয়ে।[৩] *নেচার* পত্রিকায় প্রকাশিত হলো প্রবন্ধ। সবেরই কেন্দ্রবিন্দু ইউরি গেলার। ছেলেটির সত্যিই অলৌকিক ক্ষমতা আছে—একথা প্রায় প্রমাণিত হতে চলেছে, এরকম একটা অবস্থায় *নিউ সাইন্টিস্ট* পত্রিকার পক্ষ থেকে এই বিশেষ বিষয়ের ওপর অনুসন্ধান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। ইউরির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলো। ধার্য হলো পরীক্ষার দিন। কিন্তু ইউরি শেষ পর্যন্ত এলেন না। তিনি জানিয়ে দিলেন[৪], 'আমি ইতিমধ্যেই বিজ্ঞানীদের সামনে অনেক কঠিন কঠিন পরীক্ষায় সামিল হয়ে উত্তীর্ণ হয়েছি। এখন নতুন করে আমাকে অবিশ্বাস করার সঙ্গত কারণ আমি খুঁজে পাচ্ছি না।'

অনেক চেষ্টা করে তাকে আবার রাজি করানো গেল। কিন্তু এবারেও তিনি এলেন না। সে নাকি একটি চিঠি পেয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, *নিউ সাইন্টিস্ট* আয়োজিত পরীক্ষায় অংশ নিলে তাকে বোমা মারা হবে। চেষ্টা এর পরেও হলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে আর কিছুতেই পাওয়া গেল না। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, 'আমি আমার মত পরিবর্তন করেছি। আপনাদের সঙ্গে কাজ করার বর্তমানে আমার কোনো ইচ্ছা নেই।'

ডক্টর যোশেফ হ্যানলনের ওপরে ছিল সেই পরীক্ষা পরিচালনার ভার। তিনি অগত্যা অন্য পথ ধরলেন।[৪] ইউরির ওপরে তোলা যাবতীয় চলচ্চিত্র এবং দূরদর্শনের ভিডিও টেপের কপি সংগ্রহ করলেন তিনি। বিভিন্ন সংবাদ সূত্র থেকে ইউরির সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করলেন এবং বহু ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে ওর সম্পর্কে খোঁজ খবর নিলেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই কিন্তু প্রমাণিত হলো গেলার স্রেফ ম্যাজিক দেখিয়েছেন। তিনি সব সময়ে কিন্তু একই ধরনের কৌশল অবলম্বন করতেন না, কৌশল পাল্টাতেন। তার সবকটি কৌশলই অবশ্য শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে যায়। তিনি যে সমস্ত কৌশল অবলম্বন করে তার 'বিশেষ অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার' পরিচয় দিতেন তার কয়েকটি নিচে দেওয়া যাক।

মনোবল গতির প্রদর্শনী (Psychokinesis)

ইউরি গেলার বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন সাইকোকাইনেসিসের ঘটনাগুলো দেখিয়ে। যে-কোনো কঠিন বস্তুকে স্পর্শ না করে তিনি শুধুমাত্র মনঃসংযোগ করে তা বেঁকিয়ে ফেলতে বা ভেঙে ফেলতে পারতেন বলে সংবাদে প্রকাশ। তিনি এই বিশেষ কাজটি করার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতেন। দ্বিধাতুর পাতকে তাপের সাহায্যে উত্তপ্ত করে বেঁকিয়ে দিতেন। (বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্র.—

বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ৫৭-৬১)। যদিও সংবাদ পরিবেশনের সময়ে বলা হয়ে থাকে যে, তিনি স্পর্শ না করেই চাবি বা চামচ বাঁকাতেন, তা কিন্তু সব সময় সত্যি নয়। অনেক সময়েই তিনি জিনিসগুলো অল্প সময়ের জন্য হলেও ছুঁয়ে দেখতেন এবং কৌশলে কাজ হাসিল করতেন। অত্যন্ত শক্ত পদার্থ, যেমন কার্বনস্টিল, তিনি শতচেষ্টা করেও বাঁকাতে সমর্থ হন নি। সরাসরি হাত দিয়ে বাঁকানোর কায়দা দেখে ফেলেছেন অনেকেই; এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ওয়াণ্ডারামা' দূরদর্শনের প্রযোজক বব্ ম্যাক্ অ্যালিস্টার (Bob Mc Alister) এবং থেম-এর শব্দযন্ত্রী স্যান্ডি ম্যাকক্রি (Sandy McCrae)।

অত্যন্ত শক্ত মনে হলেও চাবি বা চামচ কতগুলো বিশেষ অবস্থায় সহজেই বাঁকানো যায়। একটি চেয়ারে, দুটো পা ফাঁক করে বসতে হবে। এবারে যে জিনিসটি বাঁকাতে হবে তার দুটি প্রান্ত দু-হাত দিয়ে ধরে চেয়ারের বসার জায়গার সামনের প্রান্তে কোনাকুনি করে রাখতে হবে। এই অবস্থায় বস্তুটির মধ্যভাগ চেয়ারের বসার জায়গার প্রান্তভাগে একটি সরলরেখায় স্পর্শ করবে। এবার শরীরের পুরো ভারটাই চাবির ওপর দেওয়া যাবে। সব ক্ষেত্রেই দেখা গেছে চাবি (বা চামচটি) অবিশ্বাস্যভাবে অত্যন্ত সহজেই বেঁকে যাবে। একটু অভ্যেস করলেই অত্যন্ত দ্রুত এ-কাজটি করা সম্ভব।

আলোক দর্শন

কোনো দুরবর্তী বা গোচরের বাইরেকার বস্তুকে মনের চোখ দিয়ে দেখতে পাওয়াকেই আলোক দর্শন বলে। খামের মধ্যে আগে থেকেই রেখে দেওয়া কোনো ছবি বা লেখা খাম না খুলেই গেলার দেখে ফেলতেন, বলে দিতেন খামে কী আছে।

এই খেলা দেখাবার সময় গেলার নানা অজুহাতে তার যোগ্য সহকারী মেলানি টয়োফুকুর (Melanie Toyofuku) সাহায্য নিতেন। যে সমস্ত বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে তিনি খামের ভেতরে রাখা ছবি বা লেখা দেখতেন তা হলো— ক. খামের এক কোনায় একটি ছোটো ফুটো করে সেখান দিয়ে সূক্ষ্ম আলোক রশ্মি প্রবেশ করিয়ে ভেতরের ছবি দেখে নেওয়া, খ. তীব্র আলোর উল্টো দিকে খামটিকে ধরে পেছন দিক থেকে ভেতরের ছবি দেখা, গ. খামটিকে নিপুণ কৌশলে খুলে ছবিটি দেখে আবার খামটি অবিকল বন্ধ করে দেওয়া এবং ঘ. খামটিকে অ্যালকোহলে ভিজিয়ে নিয়ে ছবিটি দেখা। এর মধ্যে সহজতম পদ্ধতি হলো অ্যালকোহলে ভিজিয়ে নেওয়ার পদ্ধতি। একটি খামে যে কোনো ছবি বা লেখা ভাঁজ না করে রেখে খামটি সীল করে দেওয়া হলো। এ অবস্থায় বাইরে থেকে ছবি বা লেখা দেখা যাবে না। এবারে যদি খামটিকে যে কোনো দ্রুত উদ্বায়ী তরলে (অ্যালকোহল, পেট্রল, ইথার বা এ-জাতীয় জৈব দ্রাবক) ভেজানো যায় তাহলে ভেতরের ছবি বা লেখা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে খামের ওপরই ফুটে ওঠে। অল্প সময় বাতাসে রেখে দিলেই তরলটি উবে যায়, খামটি আবার আগের মতো অস্বচ্ছ হয়ে যায়। বর্তমান লেখকের এই পরীক্ষাটি করতে সময় লেগেছে এক মিনিট। তরলটি ছিল 'নর্মাল হেক্সেন'।

ক্লেয়ারভয়েন্স বা আলোক দর্শনের আরেকটি প্রচলিত পরীক্ষা হলো বাক্সের ভেতর কি আছে তা বলে দেওয়া। এমন একটি খেলা, যা ইউরি প্রায়ই দেখাতেন, সেটা এরকম। অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি ফিল্ম রাখার কৌটো নেওয়া হতো দশটি। এর একটির মধ্যে কোনো বস্তু রাখা হতো। কৌটো দশটি টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখা হতো। ইউরি বলে দিতেন ঠিক কোন্ কৌটোটিতে বস্তুটি আছে।

ইউরি টেবিলের কাছে এগিয়ে যেতেন। মাথাটাকে কৌটোগুলোর ঠিক ওপরে নিয়ে যেতেন—খুব কাছে। এরপর টেবিলটাকে সামান্য ঝাঁকাতেন, অবশ্যই লোকচক্ষুর অন্তরালে। টেবিলের মৃদু কম্পনে কৌটোগুলোও কম্পিত হতো। খালি কৌটো আর ভর্তি কৌটোর কম্পনের তফাত থেকেই কোন্ কৌটোতে জিনিস আছে তিনি বলে দিতেন।

একটি অনুষ্ঠানে একবার তার এই কৌশলটি ধরা পড়ে যায়।[৪] এরপর তাকে টেবিল স্পর্শ করতে দেওয়া হয় নি। কিন্তু এতে তিনি এতটুকুও ঘাবড়ে না গিয়ে 'মানসিকভাবে ক্লান্ত' এই অজুহাতে সেদিনের মতো বিশ্রাম নিলেন। পরদিন সকালে তিনি আবার আসবেন বিশ্রামের পর। তারপরেই ঘটেছিল সেই চাঞ্চল্যকর ঘটনা যা ধামা চাপা দিতে অতীন্দ্রিয়ের প্রবক্তাদের প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল।

অনুষ্ঠান পরিচালকদের একজন ফোন করে যাদুকর ফেলিক্স গ্রীনফিল্ডকে জানালেন যে, যদিও অনুষ্ঠানটি সকাল সাতটায় পুনরারম্ভ হওয়ার কথা কিন্তু ভোর পৌনে ছটায় তিনি অনুষ্ঠান কক্ষে এসে দেখেন ইউরি তখন সেখানে উপস্থিত। ইউরি সেই পরিচালককে অনুরোধ করলেন কৌটোগুলো খুলে দেখাতে। সেই পরিচালকও তাই করেছেন।

গ্রীনফিল্ড তখন ফোনে নির্দেশ দিলেন কৌটোগুলো আবার উল্টো-পাল্টা করে সাজাতে। গেলার এই দ্বিতীয় ঘটনাটি জানেন না। তিনি যথা সময়ে মঞ্চে এসে গভীর আত্মবিশ্বাসের সংগে অত্যন্ত অল্প সময়ের ভেতরে একটি কৌটো তুললেন।

কৌটোটি শূন্য! ইউরি অসফল।

খবরটি কিন্তু তখনকার মতো বেমালুম চেপে যাওয়া হয়। প্রকাশ হয়েছে পরে।

টেলিপ্যাথি

যা নিয়ে অতীন্দ্রিয়বাদীরা সবচাইতে বেশি প্রচার করেন এবং সাফল্যের পর সাফল্য দাবি করেন, সেটি হলো ইউরির টেলিপ্যাথির ক্ষমতা। স্টানফোর্ড রিসার্চ ইনস্টিট্যুটের যে পরীক্ষাটি বিশ্ববিখ্যাত হয়ে আছে, তার মধ্যে একটি ছিল টেলিপ্যাথির পরীক্ষা। এই পরীক্ষাতে কয়েকজন পরীক্ষক ছিল একটি ঘরে, যারা এক একটি ছবিকে বর্ণনা করবে। অন্য ঘরে বসে ইউরি টেলিপ্যাথি করে সেই ছবিগুলো আঁকবে।[৫] এই পরীক্ষায় ঘরদুটি শব্দনিরোধক আচ্ছাদনে মোড়া ছিল। অর্থাৎ এক ঘরের শব্দ অন্য ঘরে কিছুতেই যাবে না।

এই পরীক্ষাটিতে কিন্তু ইউরি সফল। ওর এই সাফল্যের বহর দেখে (যেখানে

অন্যান্য পরীক্ষাগুলোয় তার অসাফল্যের সংখ্যাও কম নয়) একজন পরীক্ষক ইউরির দেহ তল্লাশ করতে চাইলেন। তার সন্দেহ ইউরির ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া মাথার চুলে, কিংবা মস্তবড় হাতঘড়িতে কিংবা অন্য কোথাও লুকোনো কোনো বেতার গ্রাহক যন্ত্র (রেডিও রিসিভার) আছে। অন্য ঘরে আছে প্রেরক যন্ত্র (ট্রান্সমিটার)। পরীক্ষা পরিচালন কতৃপক্ষ সরাসরি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন ; অজুহাত, 'ইউরি তার দেহ তল্লাশী বরদাস্ত করবে না।' সুতরাং সন্দেহ ঢুকে গেল অনেকের মনে। তাহলে সত্যিই কি তার দেহে কোনো বেতারযন্ত্র ছিল?

উত্তর পেতে কিছুটা দেরি হয়েছিল কিন্তু উত্তর পাওয়া গেছে। উত্তর মিলেছে যখন ইউরি খ্যাতির তুঙ্গে। যশ আর অর্থে উপছে পড়ছে তার ভাণ্ডার। বেশিরভাগ যশলোভী লোকেদের ক্ষেত্রে যা হয় এখানেও তাই হলো। ইউরির দুই সহকারী ইয়াসা কাজ (Yasha Katz) এবং শিপি শট্রাং (Shipi Shtrang) ফাঁস করে দিল ইউরির সমস্ত কৌশল।[৬] শিপি স্বীকার করল সে বহুবার ইউরির দর্শকদের গাড়ির নম্বর টুকে এনেছে আর ইউরি সেই সংবাদ কাজে লাগিয়েছে তার অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার প্রদর্শনীতে। একটি দূরদর্শনের অনুষ্ঠানে ইউরি যখন দর্শকদের অন্যকিছুতে আবিষ্ট করে রেখেছিলেন সেই ফাঁকে কাজ (Katz) খাম খুলে কাজ হাসিল করেন। খামের ভেতরের গোপন খবর পাচার করে দেন ইউরির কাছে, ইউরি তার পরেই করেন বাজিমাত । এমনি সব বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

ওই দুই সহকারীই বলেছিলেন ইউরির দাঁতগুলো পরীক্ষা করতে। ইউরির দাঁতেই নাকি আছে টেলিপ্যাথির রহস্য।

কান ছাড়া কী শব্দ শোনা সম্ভব?

'সম্ভব'—বলেছেন বিজ্ঞানীরা। দেহের অন্যান্য অংশের স্নায়ুতন্ত্রকে যদি ঠিকমতো ব্যবহার করা যায় তবে কান ছাড়াই যে কোনো লোক শব্দ শুনতে পাবে। এ-ব্যপারে সংবেদনশীল প্রত্যঙ্গ হলো গাল, ঘাড় এবং জিভ। তবে সবচাইতে বেশি সংবেদনশীল হলো দাঁতের গোড়ার স্নায়ুতন্ত্র—সবার সেরা। এভাবে বধিরদের শব্দ শোনার জন্য একাধিক যন্ত্র বিদেশের বাজারে বিক্রিও হয়—রয়েছে একাধিক পেটেন্ট।[৭] এরকমই একটি পেটেন্ট বলছে—'এই ব্যবস্থার মধ্যে আছে রেডিও কম্পাঙ্কের তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ গ্রহণক্ষম একটি ক্ষুদ্র যান্ত্রিক ব্যবস্থা যা একটি দাঁতকে উপড়ে ফেলে সে জায়গায় বসানো থাকবে। এই ক্ষুদে যান্ত্রিক ব্যবস্থাটি বাইরের তড়িৎ চুম্বকীয় সংকেতকে ধরে শ্রবণযোগ্য তরঙ্গে পরিণত করবে। তারপর দাঁতের প্রান্তভাগ থেকে নির্গত স্নায়ু মাধ্যম দিয়ে মস্তিষ্কের উদ্দেশ্যে তড়িৎ সংকেত প্রেরণ করবে।' অর্থাৎ এই অবস্থায় কান ছাড়াই পরিষ্কার শব্দ শোনা যাবে। যিনি কানে শুনতে পান না, তিনি পকেটে একটি ছোট্ট বেতার প্রেরক যন্ত্র রাখলেই অন্যদের কথাবার্তা কিংবা আশপাশের শব্দ দিব্যি শুনতে পাবেন। যন্ত্রটির আবিষ্কর্তা অ্যানড্রিজা পাহারিক এমনই একটি ছোটো যন্ত্র ইউরির দাঁতে বসিয়ে দেন এরকম সন্দেহ করার অনেক কারণ খুঁজে পাঁওয়া গেছে।[৮]

টেলিপ্যাথি প্রদর্শনীর সময় ছোটো একটি গ্রাহক যন্ত্র ছিল ইউরির দাঁতে আর প্রেরক যন্ত্রটি ছিল অন্য ঘরে—যে ঘর থেকে 'চিন্তা প্রেরিত হচ্ছিল।' সমগ্র ব্যবস্থাটিতে আরো যারা ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন দুই প্রখ্যাত বিজ্ঞানী এবং অতীন্দ্রিয়বাদের একনিষ্ঠ সেবক ডক্টর হ্যারল্ড পুটহফ এবং রাসেল টার্‌গ্‌। এই প্রক্রিয়ায় টেলিপ্যাথি পরীক্ষাটি সম্পন্ন করে একটি 'পেপার' তারা *নেচার* পত্রিকায় ছাপলেন। জালিয়াতির এতবড় ঘটনা বিজ্ঞান জগতে আর হয় নি। পরবর্তীকালে সবকিছু প্রকাশ হয়ে পড়ায় এরা একটু স্তিমিত হয়ে পড়েন। ইউরিরও দাপট কিছু কমে। আপাতত অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাধারী নতুন মুখও বেশি চোখে পড়ছে না। কিন্তু অনুকূল পরিস্থিতি পেলেই যে এরা আবার মাথা তুলবে, এ-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই— অতীন্দ্রিয়বাদীদের অতীত কার্যকলাপের ইতিহাস তা-ই বলে।

এস.আর.আই (SRI)-এর পশ্চাদপট

অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার ওপর বিজ্ঞানধর্মী পরীক্ষার প্রয়োগ কোনো বিজ্ঞান গবেষণাগারে মাত্র একবারই হয়েছে এবং সেটি স্টানফোর্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট বা এস. আর. আই-তে। এস. আর. আই-র একটি ইতিহাস আছে। স্টানফোর্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট বা এস.আর.আই. সংস্থার প্রতিষ্ঠা—মূলত যুদ্ধ সংক্রান্ত গবেষণা কাজের জন্য। ১৯৬০ সালে সেখানে একটি ছাত্র-আন্দোলন হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও এস. আর. আই. দুটি পৃথক সংস্থায় পরিণত হয়। তখন যুদ্ধ সংক্রান্ত কাজের জন্য বরাদ্দ টাকার পরিমাণও কমিয়ে দেওয়া হয়। অর্থের সংস্থানের জন্য তখন ওই সংস্থাটি নানাজাতের চুক্তিবদ্ধ গবেষণা শুরু করে। চুক্তিবদ্ধ গবেষণার মানে হলো কোনো প্রতিষ্ঠানের হয়ে বিশেষ বিষয়ে গবেষণা করার চুক্তি; অর্থ দেবে সেই প্রতিষ্ঠান যার হয়ে গবেষণা করা হবে। অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার ধ্বজাধারীরা এই গবেষণা সংস্থাটির (SRI) সাথে মোটা টাকার চুক্তি করেছিল অতীন্দ্রিয় সংক্রান্ত গবেষণা কাজের জন্য। বিজ্ঞানী পুটহফ এবং টার্‌গ্‌ পরীক্ষাটির সাফল্যের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। অ্যানড্রিজা পাহারিকের সংগে ব্যবস্থা করে বিতর্কিত টেলিপ্যাথির পরীক্ষাটিকে চমকপ্রদ সাফল্য এনে দিলেন তারা। বিভিন্ন মহলে প্রভাব বিস্তার করে প্রখ্যাত পত্রিকা *নেচার*-এ ছাপলেন সে প্রবন্ধ। তারপর, সেই প্রবন্ধ যেহেতু *নেচার*-ও ছেপেছে অতএব প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু সম্পূর্ণভাবে 'বিজ্ঞানভিত্তিক' এই যুক্তিতে বিশ্বব্যাপী প্রচার চালালেন অতীন্দ্রিয়ের প্রবক্তারা।

নেচার কী ভেবেছে ?

কিন্তু একটি বিতর্কিত বিষয়ে জালিয়াতির সম্ভাবনা মেশানো কোনো পরীক্ষার খবর *নেচার*-এ ছাপা হলো কেন?

কোনো বিজ্ঞান নিবন্ধ একটি বিজ্ঞান পত্রিকায় ছাপবার আগে পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলী বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে থাকেন। কিন্তু *নেচার* পত্রিকা সম্পূর্ণ রীতিবিরুদ্ধ কাজ করল এস.আর.আই-এর প্রবন্ধটি ছাপার ব্যপারে। পত্রিকার প্রথম পাতাতেই

'অতীন্দ্রিয়ের অনুসন্ধান' (Investigating paranormal) এই শিরোনামে তারা একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় লিখল, তাতে তিনজন সমালোচকের সমালোচনার সংক্ষিপ্তসার তুলে দিল। *নেচারের* কতৃপক্ষ জানতেন যে, 'বিজ্ঞান সম্প্রদায়ের ভেতরে এই প্রবন্ধটি আলোড়ন সৃষ্টি করবে।' এতে পত্রিকার প্রচার বাড়ে। *নেচার* লিখছে—'তিনজন সমালোচকদের মধ্যে একজন সরসরি প্রবন্ধটি প্রকাশের অযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন, একজন ছাপাবার ব্যপারে কোনো মন্তব্য করতে নারাজ এবং তৃতীয় সমালোচক অত্যন্ত সতর্কতার সংগে ছাপবার পরামর্শ দিয়েছেন।' অর্থাৎ সমালোচকদের কেউই কিন্তু প্রবন্ধটিকে সরাসরি ছাপাবার সুপারিশ করেন নি। তবু ছাপা হলো। ঘটনাটা যে স্বাভাবিক নয় তা বুঝতে কষ্ট হয় না। *নেচার* কতৃপক্ষ দায়িত্ব এড়বার জন্য আগেভাগেই বলে রেখেছেন, কোনো বিজ্ঞান পত্রিকায় কোনো কিছু ছাপার অর্থ এই নয় যে, সে বিজ্ঞান সম্প্রদায়ের কাছ থেকে অনুমোদনের শীলমোহর (Seal of approval) পেল।'

ইউরি গেলার কোনো বিচ্ছিন্ন চরিত্র নন। যুগে যুগে অতীন্দ্রিয়বাদের প্রবক্তারা প্রমাণ হিসেবে অনেক 'বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ'কে সামনে খাড়া করেছেন। পরবর্তীকালে সেই 'বিশেষ মানুষটির' জালিয়াতি ধরা পড়েছে। বিখ্যাত যাদুকর হ্যারি হুডিনি তার জীবনের বেশ একটা বড়ো অংশ ব্যয় করেছিলেন এসব অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলীর বিশ্লেষণে এবং তিনিও বহু ব্যক্তির জালিয়াতি ধরে ফেলেছেন।[৯] বর্তমানে আমেরিকার জেমস্ র‍্যাণ্ডি একই কাজ করে চলেছেন। আমাদের দেশের আব্রাহাম কভুরের কথাও এ প্রসঙ্গে মনে পড়বে। কিন্তু যে অসুবিধার মধ্যে সাধারণ মানুষ পড়ে যান, যার ফলে সাময়িকভাবে হলেও তাদের চিন্তাভাবনাগুলো উল্টোপাল্টা হয়ে যায় তা হলো, একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটে যাবার পরে বেশ কিছুদিন লেগে যায় তার স্বরূপ উদঘাটনে। এই মধ্যবর্তী সময়ে সংবাদ মাধ্যমগুলো দারুণ কৌশলে প্রচারের বান ডাকায়। কিন্তু ঘটনাটির স্বরূপ যখন উদঘাটিত হয়ে যায়, তখন এই প্রচারকবৃন্দ একদম চুপচাপ হয়ে যায়। ভ্রান্তিমোচন বা সত্য প্রকাশের দিকটা তারা আর সাধারণ্যে প্রচার করেন না। ফলে সাধারণ মানুষের মনে অলৌকিকতা বা অতিপ্রাকৃতের ধোঁয়া কাটতেও চায় না। এর পরেও আবার অনেক বিজ্ঞানী অর্থ-যশের লোভে নিজেরাই জালিয়াতিতে অংশগ্রহণ করে সম্পূর্ণ বিষয়টিকে আরো বেশি জটিল করে তোলেন। এরকম ঘটনার সংখ্যা অনেক (যদিও যথেষ্ট প্রচারিত নয়)। উদাহরণ হিসেবে একটির কথা উল্লেখ করছি :

এস. জি. সোয়াল (S. G. Soal) একজন ব্রিটিশ গণিতবিদ। প্রথমে তিনি ছিলেন কট্টর পরাবিজ্ঞান-বিরোধী। পরবর্তীকালে তিনি সুকৌশলে পরাবিজ্ঞানেরই একজন নামডাকওয়ালা ব্যক্তি হয়ে যান। পরাবিজ্ঞান-বিরোধী থাকাকালীন তিনি বেসিল স্যাক্ল্টন এবং শ্রীমতী গ্লোরিয়া স্টেওয়ারট্ নামে দুই ব্যক্তির অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার পরীক্ষা করে দেখেন যে, তাদের বিশেষ কোনো ক্ষমতা নেই, তারা ভূয়া দাবিদার ছাড়া কিছু নন। কিন্তু ১৯৩৯ সালে সোয়াল নিজেই তার পুরোনো ফলাফল পুনর্গণনা
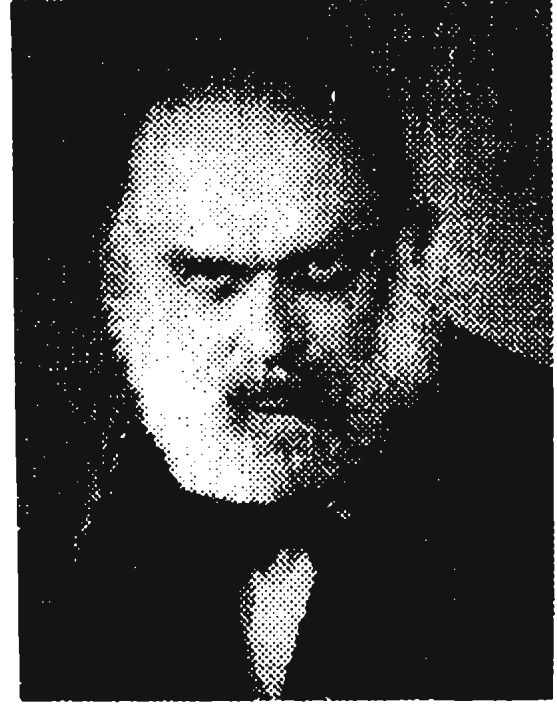
ইউরি গেলারি বনাম জেমস র‍্যাণ্ডি

করে দেখান যে, ওই দুই ব্যক্তির অদ্ভুত রকমের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা ছিল। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় সোয়ালকে পরাবিজ্ঞানের কাজের জন্য ডক্টর অফ সায়েন্স দিয়েছিল।

প্রায় চল্লিশ বছর পরে ১৯৭৮ সালে বেটি মার্কউইক্ কম্প্যুটারে সোয়ালের গণনার পর্যালোচনা করে দেখালেন যে, সোয়াল তার ফলাফল নিয়ে জালিয়াতি করেছিলেন।

সাধারণ মানুষ বিজ্ঞানীদের কথা চাল-চলন, এমনকি পোশাক-পরিচ্ছদ-এর দিকেও তাকিয়ে থাকেন। শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেন তাদের প্রতিটি কাজকর্ম। সেখানে বহু বিজ্ঞানীই কিন্তু লজ্জাজনকভাবেই দায়িত্বজ্ঞানহীন। তাঁরা আঙুলে জ্যোতিষ নির্দেশিত প্রস্তর ধারণ করেন, কোষ্ঠী বিচারে বিশ্বাস করেন, ধর্মে তাদের অবিচল মতি, আর অনেকসময়ে নিজেরাই অর্থ এবং যশের লোভে জালিয়াতি করেন। বিজ্ঞানী 'টেলিপ্যাথি'র বই-এর ভূমিকা লিখে দেন। শুধু এদেশে নয়, সারা বিশ্বের চেহারা এই। আজও 'করোনা ক্ষরণ' নামক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াটি 'অলৌকিক প্রভা' বা 'অরা' হয়েই বেঁচে আছে। ক-দিনের মধ্যেই হয়ত দেখব কোনো সাপ্তাহিক কিংবা পাক্ষিক পত্রিকায় রঙিন ছবি-টবি দিয়ে রগরগে কাহিনী ছাপা হচ্ছে 'অলৌকিক প্রভা' নিয়ে। আর হাজারে হাজারে সে কাহিনী পৌঁছে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের হাতে।

বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের কিছু অনৈকিত কার্যকলাপ মানুষের মনে কত সহজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে সে সম্পর্কে সচেতন হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

সূত্রপঞ্জী

১. Andrija Puharich, '*Uri*'. Publ. W. H. Allen Inc. (N. Y. 1974)

২. Dobbs, A., *Proc. Soc. Psych. Res.* Vol. 57, *Sect.* 197, August 1965
৩. *Impact of Science on Society*, Vol. 24, No. 4, Oct-Dec. 1974
৪. *New Scientist*, 17 October, 1974
৫. *Nature*, Vol. 251, 1974
৬. *Science Today*, December 1983
৭. U. S. Patent No. 3,563,246; 3,586,791; 2,995,633; 3,267,931; 3,156,787
৮. C. A. Muses., "Psi, a New Dimention In the Science"., *Imp. of Science on Society* Vol. 24, No. 4.1 309 (1974)
৯. *Houdini on Spooks*—in *Houdini on Magic*, Ed. W. B. Gibron and M. N. Young, Dover Publications, Inc. N. Y (1953)

শঙ্কর ঘটক

জুন ১৯৮৪

অপবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

হাটে-বাজারে, রাস্তার মোড়ে আশ্চর্য ক্রিয়াকলাপ দেখিয়ে মাদুলি বা স্বপ্নাদ্য ওষুধ বিক্রি করে মাদারি বা কৌশলী ঠগেরা। একটা বাচ্চা ছেলের মুখচোখ ঢাকা দিয়ে চারপাশের ঘটনা বলে দেওয়া, সকলের চোখের সামনে গামছা ছিঁড়ে পুড়িয়ে আবার জোড়া দেওয়া, কিংবা মাটির ওপর লেবু চিপে ফেলে আগুন তৈরি করা—এরকম সব চমকপ্রদ ঘটনার প্রদর্শনী চলতে ফিরতে প্রায়শই চোখে পড়ে। তবে এসব ক্রিয়াকাণ্ড যে প্রকৃতপক্ষে 'অলৌকিক' কিছু নয়, নিছক হাতসাফাই বা ম্যাজিক, তা এখন অনেকেই জেনে ফেলেছেন। অল্পশিক্ষিত নিম্নবিত্তের মানুষরাই সাধারণত এরূপ পথ চলতি 'যাদুশক্তি'র শিকার হন। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এরকম নিম্নমানের প্রতারণার প্রভাব কমেছে বটে কিন্তু উচ্চমার্গের বিভ্রান্তি বা তথাকথিত অতীন্দ্রিয় শক্তির প্রভাব বিকশিত হয়েছে, মানুষের মনকে তা বিভ্রান্ত করে চলেছে। বিশ্ব রাজনীতির গতি পরিবর্তন, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির দ্রুত প্রসার এবং সাংস্কৃতিক চিন্তার সূক্ষ্ম ধারাগুলির সঙ্গে নানান কায়দায় তাল মিলিয়ে অতীন্দ্রিয়বাদ তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে, এর প্রকৃত অসারত্ব প্রকাশ পায় না সহজে।

এইসব অলৌকিক ক্ষমতা কিংবা অতীন্দ্রিয় শক্তির ব্যাপারগুলি মধ্যযুগ থেকেই ধর্মের ছত্রছায়ায়, কুসংস্কারের আচ্ছাদনে, ভাববাদী চিন্তার বাতাবরণে লালিত হয়ে এসেছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকেই এদের উঠে আসতে দেখা যায় বিজ্ঞানের নববিকশিত অঙ্গনে। বেশ কিছু বিজ্ঞানী ও প্রখ্যাত ব্যক্তি টেলিপ্যাথি, অলোকদর্শন, পূর্বোপলব্ধি, প্ল্যানচেট, মনোগতিবিদ্যা (psychokinesis), ভৌতিক চিত্রগ্রহণ (ফ্যানটম ফটোগ্রাফি) ইত্যাদি নানাবিধ চমকপ্রদ বিষয়গুলিতে আগ্রহী হয়ে চর্চা শুরু করে দেন। এইসব প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা অনেক সময়ই অলৌকিক ঘটনার এমন আপাত-বিশ্বাস্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা খুব গভীর বিশ্লেষণে না গেলে রীতিমতো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা বলেই মনে হয়। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক :

বছর কয়েক আগে ব্রিটিশ দূরদর্শনের পর্দায় শ্রীমতি রোজমেরি ব্রাউন আত্মপ্রকাশ করে লক্ষ লক্ষ দর্শককে চমকে দিয়েছিলেন। সংগীত বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞা, অতি সাধারণ, গান না-জানা এক গৃহবধূ ব্রাউন কিছু উচ্চাঙ্গের স্বরলিপি সর্বসমক্ষে পেশ করে বললেন—তিনি স্বরলিপির কিছু বোঝেন না, এগুলি বিশ্ববিখ্যাত সংগীত প্রণেতা প্রয়াত বিটোভেন, ব্রাহ্‌ম্‌স আর সুবার্ত তাঁকে স্বপ্নে জানিয়ে দিয়ে গেছেন। অর্থাৎ বিটোভেন প্রমুখের আত্মা শ্রীমতি ব্রাউনকে দিয়ে স্বরলিপিগুলি শিখিয়েছেন। ব্যাপারটা রীতিমতো আলোড়ন তুলে দিয়েছিল পাশ্চাত্য দুনিয়ায়। যদিও কালক্রমে ব্রাউনের দাবি সম্পর্কে সন্দেহ উঠতে শুরু করে এবং রহস্য ক্রমে ধামাচাপা পড়ে যেতে থাকে। কিন্তু 'অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা'র উমেদার পণ্ডিত ব্যক্তিরা কিছু অভিনব ব্যাখ্য এনে

ফেলার চেষ্টা করলেন। তাঁরা বললেন, বিটোভেন মারা গেলেও তার চিন্তাটা মারা যায় নি। যা গেছে তা হলো দেহ, বেঁচে আছে তাঁর মন (mind), তাঁর অনুভূতি (impression); উপযুক্ত মাধ্যম পেয়ে সেই অপূর্ণ চিন্তা লেখার অক্ষরে ফিরে এসেছে, ব্রাউন হলেন সেই উপযুক্ত মাধ্যম। অর্থাৎ তাঁরা দেহ আর মনকে পৃথক করে নিয়েছেন, বলছেন মন যখন দেহে থাকে তখন দেহ হয় মনের আধার। দেহ না থাকলে মন রয়ে যায়। সে ফিরে ফিরে আসে সুযোগমতো।

এত সব গুরুগম্ভীর ব্যাখ্যা শোনার পর বিজ্ঞানের চোখে বিচার করতে গেলে প্রথমে জানতে হয় দেহ-মনের সম্পর্কটি কী?

বিশ্বসৃষ্টির শুরু থেকে হাইড্রোকার্বন যৌগমালাগুলি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ক্রমবিবর্তনের ধাপ বেয়ে সংশ্লেষ করেছিল অ্যামিনো অ্যাসিড, যে অ্যামিনো অ্যাসিড হলো প্রোটিন অণুর প্রাথমিক উপাদান। এই প্রোটিন আবার জটিল থেকে জটিলতর যৌগসৃষ্টির মধ্য দিয়ে উৎপন্ন করেছিল জীবকোষ। মূলত জড়বস্তু থেকে উৎপন্ন হলেও এই জীবন্ত কোষে পদার্থের ধর্মের আমূল রূপান্তর ঘটে গিয়েছিল। কোনো জৈব বস্তু বা প্রাণীকে দেখা গেল নড়াচড়া করে, বংশবৃদ্ধি করে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়, প্রতিক্রিয়া দেখায়।

এই জটিল জৈবকোষগুলির সমন্বয় ও সংশ্লেষণের চূড়ান্ত রূপ হলো মানুষ। মানুষের মস্তিষ্কের জৈবিক গঠন পারিপার্শ্বিকতার ছাপ ধরে রাখতে পারে এবং সেই ছাপ (impression) থেকে নতুন ধারণা তৈরি করতে পারে। তার মানে—চিন্তা করতে পারে। মস্তিষ্ক কোষগুলির রসায়ন নিয়ে বর্তমানে প্রচুর গবেষণা হয়েছে এবং এটা বিজ্ঞানসম্মতভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, মন ও চিন্তা মস্তিষ্কের জটিল যৌগগুলির এক বিশেষধর্ম। অর্থাৎ সোজা কথায় মস্তিষ্ক বা দেহ এবং মন আলাদা কিছু নয়। মন দেহের একটি ধর্ম। মন বা চেতনাকে দেহ থেকে পৃথক সত্তা হিসেবে ধরে নিয়ে কোনো অলৌকিক বা অতীন্দ্রিয় ঘটনার ব্যাখ্যা দিলেও তা বিজ্ঞানের সমর্থন পেতে পারে না, তত্ত্বগতভাবে সে ব্যাখ্যা বাতিল হতে বাধ্য।

আধুনিক অতীন্দ্রিয়বাদীরা অবশ্য হুঁশিয়ার খুব। দেহ এবং চেতনসত্তার পৃথক অস্তিত্বের প্রাচীন ব্যাখ্যাকে তারা এখন আর খুব বেশি প্রচার করেন না। পরিবর্তে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও আপেক্ষিকতাবাদের উল্লেখ তারা করছেন, যখন তখন, আকর্ষণীয় উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে। এ যেন অতীন্দ্রিয়বাদের কঙ্কালের গায়ে আধুনিক বিজ্ঞানের আলট্রা-মডার্ন পোশাক পরানোর চেষ্টা। উদ্দেশ্যটা দুর্বোধ্য নয় মোটেই—ব্যাখ্যা যত আপাত-জটিল হবে, যত বিজ্ঞানের টার্মস্ আর থিওরির সমাহার হবে, সাধারণ মানুষ ততই হতচকিত হয়ে যাবে। 'অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা'র এক অন্যতম প্রবক্তা আর্থার কোয়েস্টলার অপর এক নামকরা ব্যাখ্যাকার ডোব-এর প্রকল্পের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন 'ডোব-এর প্রকল্পটি এতই চমৎকার যে, কোয়ান্টাম তত্ত্ব না জানলে এ ব্যাখ্যা বোঝা যাবে না।' [*The Roots of Coincidence*, Arthur Koestler, London, Hutchinson, 1972] অর্থাৎ দুর্বোধ্যতাই প্রকল্পটির গুরুত্বের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সুতরাং সাধারণ মানুষ যত

অন্ধবিশ্বাসী হবে, প্রবক্তারাও তত নিশ্চিত হবে।

অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার ব্যাখ্যায় আধুনিক বিজ্ঞানের কিছু সূত্র বা প্রতিশব্দকে শিখণ্ডী রেখে যে সব ভুয়া-বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রচুর প্রচার পেয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান হলো 'ভৌত তত্ত্ব।' এ শতাব্দীর সবচেয়ে চমকপ্রদ তত্ত্বও বলেছেন অনেকে।

'ভৌত তত্ত্বে'র গোড়ার কথা হলো—এখনো পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত এক বিশেষ শক্তিই হচ্ছে অলৌকিক ক্ষমতার উৎস। 'অনাবিষ্কৃত বিশেষ শক্তি'র ধারণা আনা হয়েছে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের নবতম এক আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। ১৯৩০ সালে মৌলিক কণা নয়ট্রিনোর (Neutrino) কথা বলেন বিজ্ঞানী ভোল্‌ফগ্যাং পাউলি। ১৯৫৬ সালে পরীক্ষামূলকভাবে এর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। এই নয়ট্রিনো কণার ভর নেই, তড়িতাধান (charge) নেই, চৌম্বক ক্ষেত্রও নেই; মহাকর্ষীয় টানের প্রভাবমুক্ত এই কণার ঝাঁক বহুদূর নক্ষত্র কিংবা দূরতর গ্যালাক্সি থেকে ছুটে এসে পৃথিবী ভেদ করে চলে যেতে পারে অসীমের ঠিকানায়। ষাটের দশকে যখন এই দুরন্ত বিস্ময়কর মৌলিক কণাটি নিয়ে পৃথিবীর বিজ্ঞানীমহল রোমঞ্চিত, তখন 'উপযুক্ত সময়' বুঝে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কৃতী গণিতজ্ঞ ও পদার্থবিদ অ্যাড্রিয়ান ডোব্‌স্ (Adrian Dobbs) তাঁর চমকপ্রদ 'অতীন্দ্রিয়ের ভৌত তত্ত্ব'টি উপস্থাপিত করলেন নিপুণ কুশলীর মতো। তিনি ESP শক্তির পূর্বোপলব্ধি ক্ষমতা বা Precognition power-এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বললেন, ভবিষ্যতের কোনো ঘটনার ছবি হুবহু উপলব্ধি করার ব্যাপারটি (যেমন আব্রাহাম লিঙ্কনের মৃত্যুর স্বপ্ন দেখা, জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎ বলা ইত্যাদি) মোটেই কিছু আন্দাজে ঢিল ছোঁড়া বা অনুমানভিত্তিক (guess work) কোনো সিদ্ধান্ত নয়, আসলে প্রকৃত ঘটনাটি (যা ভবিষ্যতে ঘটবে) এক কল্পিত বাহক মাধ্যমে (hypothetical carrier) সঞ্চারিত হয়ে দ্রষ্টার উপলব্ধিতে চলে আসে। এই বিশেষ কল্পিত বাহকটির নাম দেওয়া হলো 'সাইট্রন'। নয়ট্রিনো আবিষ্কারের রোমাঞ্চকর প্রভাব মধ্যে এনে ফেলা হলো আর এক নতুন কণা সাইট্রনকে।

সাইট্রন নামটি পদার্থের মৌল কণা ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদির সঙ্গে লয় মিলিয়ে রাখা; বিজ্ঞান সুবাসিত এই নামে সাধারণ মানুষের প্রাথমিক বিশ্বাসটি আদায় করে নেওয়ার সুযোগ থেকে যায়। কিন্তু সাইট্রনের ধর্ম ইলেকট্রন-প্রোটন ইত্যাদির থেকে বেবাক আলাদা। যেমন, সাইট্রনের ভর হলো কাল্পনিক (imaginary), এর গতিবেগ আলোর গতিকেও অতিক্রম করতে পারে; এটি সর্বভেদী, এর কোনো লয় ক্ষয় রূপান্তর হবে না। সাইট্রনের ধর্ম নির্ধারণে গণিতবিদ ডোব্‌স্ বিস্তর হেঁয়ালি ভরা 'প্রামাণ্য' (?) যুক্তির বিন্যাস ঘটিয়েছেন তাঁর বক্তব্যে। এই সাইট্রন নাকি যে কোনো বস্তু থেকে ক্রমাগত নির্গত হয়ে অদৃশ্য মেঘের মতো আমাদের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে. ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো যোগ্য ব্যক্তিই কেবল সেই সাইট্রন মেঘের থেকে বিশেষ সংবাদটি গ্রহণ করতে পারেন। সাইট্রনের বয়ে আনা সংবাদ বা সংকেত ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ কালের যে কোনো ঘটনার সঙ্গেই জড়িত থাকতে পারে, সুতরাং পূর্বোপলব্ধির (precognition) ক্ষমতা সাইট্রন তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করাই যাবে। এমন কি, ডোব্‌স্ বললেন, টেলিপ্যাথির ব্যাখ্যাও সাইট্রন ধারণার মধ্যে নিহিত রয়েছে;

মানুষ যখন চিন্তা করে তখন তার মাথা থেকে সাইট্রন কণা বেরোয় যেগুলো আলোর চেয়েও দ্রুততর গতিতে চতুর্দিকে ধেয়ে যায় এবং উপযুক্ত গ্রাহক ব্যক্তি তাকে মাথায় গ্রহণ করে নেয়।

পুরোটাই 'বিজ্ঞান'! বিজ্ঞানের অনুরূপ তথ্য, অনুরূপ বৈজ্ঞানিক সূত্র, বিজ্ঞানের পরিভাষা, সব মিলিয়ে বিশ্বাস ও সমীহ আদায়ের উপযোগী উপকরণের অভাব নেই। হেঁয়ালিটি এখানেই। ধরা মুশ্‌কিল খুব! ফাঁকগুলি এত সূক্ষ্ম যে, খুঁজেই পাওয়া যায় না অনেক সময়। সাইট্রনের কাল্পনিক ভর, অসীম গতিবেগ, অবিনশ্বরতা, এগুলি বিজ্ঞানের ছাঁচে ঢেলে পরিবেশন করা হলেও এদের কোনোটিই যে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতি রাখে না সেটা চট করে মানুষের কাছে পরিষ্কার হতে পারে না বলেই অতীন্দ্রিয়বাদের বিপজ্জনক ধাপ্পা টিকে থাকে। বিজ্ঞান বলে—যে কোনো শক্তি বিকিরণের ধর্ম হলো দূরত্বের সাথে সাথে তার শক্তি ও তীব্রতা হ্রাস পেতে থাকে, অথচ সাইট্রন বিকিরণে দূরত্ব কোনো বাধা নয়—তীব্রতা হ্রাস সেখানে নাকি হয় না। (কলকাতার শহীদ মিনার থেকে বেরিয়ে আমেরিকার স্ট্যাচু অফ্ লিবার্টিতে সাইট্রন গিয়ে পৌঁছবে অবিকল একই তীব্রতা ও ক্ষমতা নিয়ে!) কোনো যন্ত্র দিয়ে পরিমাপ করে বা পরীক্ষামূলক ব্যবস্থায় এই তথ্য প্রমাণিত হবে না, তাই সাইট্রন তত্ত্বের জনক ডোব্‌স্ সুকৌশলে সাইট্রন কণার কাল্পনিক ভরের প্রকল্পটি খাড়া করেছেন। এতে অঙ্কের ধাঁধায় উত্তর মেলানো যাবে, কিন্তু 'কাল্পনিক' হওয়ার দরুন কোনোদিনই কণাটিকে হাতেনাতে আবিষ্কার করা যাবে না। অর্থাৎ 'কাল্পনিক'-এর কাঁটা বিঁধিয়ে ডোব্‌স্ তাঁর তত্ত্বকে কন্টকমুক্ত করতে চেয়েছেন।

আমাদের মনে পড়ে যায় বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মের পুরাণ গ্রন্থগুলির কথা যেখানে দৈবশক্তি, আত্মা, জিন বা স্পিরিট-এর উল্লেখ রয়েছে। এই আত্মা বা স্পিরিট সর্বদা আকাশে বাতাসে বিচরণ করে, এদের ধরাছোঁয়া যায় না কিন্তু উপযুক্ত মাধ্যম বা 'ক্ষমতাবান ব্যক্তি' পেলে এরা নেমে আসে ধরাধামে। এদেরও কোনো লয়-ক্ষয় নেই, গতিবেগের সীমা-পরিসীমা নেই। অতীতের সেই সম্পূর্ণ বিজ্ঞান বহির্ভূত পৌরাণিক ধারণা বর্তমানে সাইট্রনের ভূয়া-বৈজ্ঞানিক রূপ নিয়ে পুনরাবির্ভূত হয়েছে দেখা যাচ্ছে। নতুন বোতলে পুরনো মদ।

এভাবেই বিভিন্ন মেধাবী প্রবক্তা বিচিত্র কায়দায় বিজ্ঞানকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে অলৌকিক অতিপ্রাকৃতের দাবিকে বিশ্বাসযোগ্য জমির ওপর দাঁড় করাতে। এসব 'তত্ত্বে'র ফাঁকিগুলি ধরতে গেলে অনেক প্রস্তুতি, শ্রম, অধ্যবসায় ও সংগঠিত প্রয়াস প্রয়োজন। সর্বদা রহস্য মোচন করা সম্ভব না হলেও একটি জিনিস গড়ে তোলা সম্ভব—তা হলো সাধারণ মানুষের বিজ্ঞান-নির্ভর মানসিকতা। যা অপ্রমাণিত অথচ বিজ্ঞানের নামে প্রচারিত, সে-সম্পর্কে সন্দেহ ও অবিশ্বাস থাকা প্রায়োজন, এই প্রশ্নমনস্কতাই আত্মপ্রবঞ্চনা প্রতিরোধ করতে পারে।

শঙ্কর ঘটক/অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

মার্চ ১৯৮৫

ম্যাজিক এবং অপকৌশল

ফটফটে সাদা গোঁফ-দাড়ি মুখ ছাড়িয়ে বুকে এসে নেমেছে, গায়ে বড় হাতা ফতুয়ার মতো সাদা জামা, কাঁধে ছোটো উত্তরীয় বা চাদর। নাম বি. প্রেমানন্দ, কেরালার মানুষ।

সমবেত জনতার সামনে প্রেমানন্দ প্রথমে ধর্ম, ঈশ্বরবিশ্বাস, অলৌকিক ক্ষমতা, ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি সম্পর্কে কিছু কথা ব্যক্ত করলেন, তারপর শুরু হলো চোখের সামনে অবিশ্বাস্য রোমাঞ্চকর সব ক্রিয়াকলাপ। একের পর এক।

প্রথমে মৃদুস্বরে কিছু 'মন্ত্রোচ্চারণ' এবং শূন্যে বার কয়েক হাত ঘুরিয়ে মুঠো ভর্তি 'পবিত্র বিভূতি' আনয়ন। ঘুরে ঘুরে দর্শকদের বাড়িয়ে দেওয়া হাতে বিভূতিচূর্ণ দিলেন প্রেমানন্দ, সবাইকে। উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে যারা সাঁইবাবার বিভূতি সংগ্রহের 'বিরল সৌভাগ্যে' অভিজ্ঞ তারা সকলেই বললেন প্রেমানন্দের দেওয়া ছাই বা বিভূতিতে অবিকল সেই সাঁইবাবারই গন্ধ।........এরপর একটা ছোটো মশাল জ্বালিয়ে নিজের গায়ে হাতে অবলীলায় বোলাতে লাগলেন প্রেমানন্দজী। তাজ্জব ব্যাপার! কিছুই হচ্ছে না! নির্ঘাৎ লোকটা গায়ে-হাতে অগ্নিনিরোধক কিছু মেখে এসেছে আগে থেকে—ভাবছিলাম মনে মনে। উনি বোধহয় অন্যের মনের কথাও টের পান। ঝটিতি মঞ্চ থেকে নেমে এসে ডাকাডাকি করতে লাগলেন দর্শকদের। সাহস করে যারা উঠে গেল তাদেরও শরীরে সেই জ্বলন্ত মশালের শিখা বুলিয়ে দিলেন বারবার, পুড়ে যাওয়া কোন্ ছার সামান্য একটু তাপের অনুভূতি ছাড়া কারুরই কিছু হলো না। এরকম মজাদার 'আত্মাহুতি'র খেলায় দর্শকেরা রীতিমতো পুলকিত।

ওল্ড টেস্টামেন্ট-এর (বাইবেল) যীশুর সেই গল্পটা শোনালেন প্রেমানন্দ যেখানে শিষ্যের দলকে সঙ্গে নিয়ে যীশু মরু-প্রান্তর অরণ্য-পর্বত অতিক্রম করে চলেছেন ; প্রচণ্ড শ্রম আর ক্ষুধায় কাতর শিষ্যবর্গ যখন আর চলতে পারছে না, তখন যীশু তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা প্রয়োগ করলেন—কিছু ধুলো আর বালুকণাতে জল ছিটিয়ে সঞ্জীবনী পানীয় বা সোমরস সৃষ্টি করলেন তিনি। প্রেমানন্দ বললেন—'এখন আমি সেই যীশুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছি। আধুনিক কালে পাথরের পানপাত্র চলে না, আমি স্টিলের গ্লাস আর স্টিলের ঘটি এনেছি। আর সর্বসমক্ষে মদ্যপান যেহেতু শোভন নয় তাই আমি জল থেকে তৈরি করছি মদ নয় মধু।' বলে তিনি গ্লাস থেকে খানিকটা জল ঘটিতে ঢাললেন, তারপর গ্লাসটা ঘটির ভেতর বসিয়ে চোখ বুজে বিড়্‌বিড়্ করলেন—যেন যীশুরই ভঙ্গি। এবার, গ্লাসটা তুলে সরিয়ে রাখলেন। ডেকে নিলেন কয়েকজন দর্শককে। তাদের হাতের চেটোয় ঘটি থেকে যে তরলটি একটু একটু ঢেলে দেওয়া হলো তা যে দিব্যি মিষ্টি মধুই বটে সেটা তখনকার বিস্ময়-বিহ্বল অবস্থার মধ্যেও বুঝে নিতে অসুবিধা হয় নি।

ঝোলা থেকে এবার বেরোলো হাত দুয়েক লম্বা লকলকে মোটা কাছির মতো দড়ি, ঠিক যেন সাপ একটা। বললেন, প্রাচীন ভারতের যোগী ঋষিরা মন্ত্রবলে জ্যান্ত

সাপকে শক্ত লাঠিতে রূপান্তরিত করতেন শোনা যায়। শোনার আর দরকার নেই, এবার দেখুন—বলেই চকিতে সেই মোটা দড়িতে হাত বুলোতেই সেটা শক্ত লাঠির মতো হয়ে গেল চোখের সামনে।

কিন্তু চোখ যে আরো কত চমকের সাক্ষী হলো তা বলার নয়। ঝপ্ করে এক টুকরো জ্বলন্ত কর্পূর জিভে রেখে মুখ বন্ধ করলেন—অর্থাৎ বেমালুম আগুন গেলা হলো।.....একটা ছোটো চকচকে ত্রিশূল হাতে নিয়ে খেলার ছলে তার তীক্ষ্ম ছুঁচলো দিকটা জিভে বিঁধিয়ে দিলেন প্রেমানন্দ। একেবারে এফোঁড়-ওফোঁড়। আমরা শিউরে উঠি, কিন্তু প্রেমানন্দের চোখেমুখে নির্মল হাসি, বেঁধানো জিভে একবিন্দু রক্ত নেই।....যেন লোমহর্ষক তামাশায় মেতেছে লোকটা। কাপড় সেলাই-এর একটা ছুঁচ নিয়ে অম্লান বদনে হাতের চামড়া টেনে ফুটিয়ে দেন তিনি ঠিক কাপড় সেলাই করার মতোই । শুধু তাই না, সেখানে আবার ভার ঝোলানোর জন্য ঝোলা থেকে একখানা বড়সড় পাতিলেবু বের করে ছুঁচ-সুতোয় গেঁথে ঝুলিয়ে দেন তিনি হাতের চামড়ায় সেলাই করে। 'এতো আশ্চর্য ব্যাপার! চামড়া সেলাই? কিছু গ্যাঁড়াকল নেই তো?' পাশের দর্শক থাকতে না পেরে যেটা স্বগতোক্তি করলেন সেটা আমারও মনের কথাই ছিল। তাই বলেই ফেললাম—'যান না দাদা, বলুন না! সে-রকম ক্ষমতা থাকলে তো আপনার চামড়াতেও সেলাই করতে পারবেন উনি।' করলেনও তাই। ভদ্রলোক রোমাঞ্চিত মুখে হাতের চামড়ায় লেবুর মালা ঝুলিয়ে ঘুরে ঘুরে সবাইকে দেখাচ্ছেন আর বারবার বলছেন—'সত্যি, একফোটা লাগছে না, কিছু লাগছে না, অবিশ্বাস্য........!'

কিন্তু লাগবার কথাই তো নয়, কারণ আমাদের চামড়ায় যে পরপর কতোগুলি স্তর আছে তার যে কোনো স্তরেই কিন্তু ব্যথার অনুভূতি হয় না বা রক্তপাত হয় না। যেমন, সবচেয়ে ওপরের এপিডার্মিস বা তারপরের ডার্মিস স্তর অবধি কিছু ফুটলে কোনো ব্যথা প্রায় হবেই না। ত্বকের চতুর্থ স্তর থেকে যন্ত্রণাবোধটা হয়। তাই সাবধানে নিপুণ হাতে যদি চামড়ার ওপর দিকের দুটো একটা স্তরে ছুঁচ ফুটিয়ে সেলাই করা যায় তাহলে বলতে গেলে কোনো যন্ত্রণাই হবে না। কোনো অতীন্দ্রিয় ব্যাপার-স্যাপার কিছু এতে নেই। — এই কথাগুলি কিন্তু কোনো বিজ্ঞানী মঞ্চে এসে হাজির হয়ে আমাদের বললেন না, বললেন প্রেমানন্দ স্বয়ং।

পাঠক নতুন করে আর চমকাবেন না নিশ্চয়ই যখন জানা যাবে যে, মঞ্চের নায়ক প্রেমানন্দ কোনো অলৌকিক ক্ষমতাধর পুরুষ নন, তাঁর নামের সঙ্গে কোনো 'স্বামী', 'বাবা' বা 'ভগবান' যুক্ত নেই, তিনি স্রেফ সাদামাটা বি. প্রেমানন্দ-ই। আর যে অভিনব প্রদর্শনীর কথা লিখছি সেটাও কোনো আশ্রম বা ধর্মীয় আখড়ায় অনুষ্ঠান নয়, এটা হয়েছিল কলকাতার অন্যতম প্রধান বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান, সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স্ (SINP) হল্-এ, ১৯৮৫-র ১৫ অক্টোবর। এর উদ্যোক্তা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা ও আরো কিছু গণবিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্ক সংস্থার কর্মীরা।

চেহারায় বেশবাসে অঙ্গভঙ্গিতে গুরু-বাবাদের মতো হলেও শ্রীপ্রেমানন্দ আসলে সাঁইবাবা-রজনীশ-ব্রহ্মচারী জাতীয় 'অবতার'দের প্রখর প্রতিপক্ষ, বলা যায় সাপে নেউলে সম্পর্ক। কেরালা যুক্তিবাদী সংস্থার (Kerala Rationalist Association) নেতৃস্থানীয় সংগঠক প্রেমানন্দের মতে—'ধর্মান্ধতা ও ধর্মগুরুদের ক্রিয়াকলাপ আমাদের সমাজের অন্তর্জগতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে। তথাকথিত "জনপ্রিয় অবতারগণ" সর্পের চেয়েও খল ; শুধুই ভণ্ডামি আর ভেল্কি দিয়ে হাজার হাজার মানুষকে বিমোহিত, বিভ্রান্ত করে রাখেন এরা—প্রকৃতপক্ষে সমাজবিরোধী ছাড়া আর কিছু আখ্যা দেওয়ার নেই এদের। কেবল দেবদেবীর কারবারীরাই নয়, যারাই এ বিশ্বে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার দাবিদার তারা সকলেই আসলে চতুর বাগ্মী, নিপুণ ম্যাজিশিয়ান আর কুশলী অভিনেতা।'.....গত ৪৩ বছর ধরে, অর্থাৎ কিশোর বয়েস থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত, প্রেমানন্দ এক হাজার চুয়াল্লিশটি 'অলৌকিক' কৌশল (miracle) কিংবা ম্যাজিক শিখেছেন। গত ১৫ বছরে শতাধিক 'স্বামীজি' বা 'বাবা'র মুখোমুখি হয়ে তাদের ভেল্কি ফাঁস করেছেন প্রেমানন্দ। মনে পড়ে যায় আব্রাহাম টি. কভুরের কথা, যে একনিষ্ঠ যুক্তিবাদী বিজ্ঞানী আমৃত্যু (১৯৭৮) ভূত ভগবান আর তাদের প্রতিভূদের বিরুদ্ধে অবিরাম প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভারতে যুক্তিবাদী (Rationalist) আন্দোলনের ভিত্তি রচনা করে দিয়েছেন, সেই কভুরেরই উত্তরসূরী হলেন ৫৮ বছরের দুর্দান্ত 'যুবক' প্রেমানন্দ।

বি. প্রেমানন্দ ১৯৮৫-র অক্টোবরে কলকাতায় এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞান আন্দোলন, যুক্তিবাদী আন্দোলন এবং অনুরূপ গণআন্দোলনগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হওয়ার জন্য। ১৫ অক্টোবর ১৯৮৫ SINP হল্-এ তাঁর চমৎকার 'অলৌকিকতা বিরোধী' অনুষ্ঠানটির মূল উদ্দেশ্য ছিল ধর্মব্যবসা, ঈশ্বরবিশ্বাস ও অবৈজ্ঞানিক চিন্তার স্বরূপ উদঘাটন ও বিশ্লেষণ করা। তাঁর বক্তব্য তাঁর বয়ানেই বলি—'বৈজ্ঞানিক বোধের অভাব আর বাস্তব জীবনে নিরাপত্তাহীনতার চিন্তা থেকে জন্ম নিয়েছে অতি-প্রাকৃতিক শক্তির প্রতি মানুষের সমীহ ও নির্ভরতা, এবং এই সাংস্কৃতিক চিন্তাই জন্ম দিয়েছে ভগবানের। অর্থাৎ মানুষ যখনই সংকটে পড়ে, অসহায় বোধ করে, দিশেহারা হয় তখনই তার মন ছুটে যায় তারই তৈরি গড-আল্লা-ভগবানের দিকে। সংকট মোচনের আকুল প্রার্থনার জন্যই আমরা গির্জা-মসজিদ-মন্দিরে যাই, নিজেদেরই একান্ত জাগতিক লাভ-লোভের জন্য, ভগবানের প্রতি ভালোবাসার টানে নয়। নির্মোহ ঈশ্বরপ্রেমী কথাটা হাস্যকর বাচালতামাত্র। ব্যাপক মানুষের এই দুর্বলতার সুবর্ণ সুযোগটা গ্রহণ করে ধর্মগুরু বা "অবতার"গণ। অলৌকিক শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য তারা নানাবিধ চমকপ্রদ ক্রিয়া প্রদর্শন করে; ক্রিয়াকাণ্ডের সবই যে হাতসাফাই, ম্যাজিক বা মনস্তাত্ত্বিক চাতুরি তা সর্বসাধারণের কাছে তুলে ধরাই যুক্তিবাদী সমাজকর্মীর আশু কর্তব্য—এবং এই আন্দোলনের কর্মসূচী সামগ্রিক গণবিজ্ঞান আন্দোলনেরই হওয়া উচিত।'

এবার ফেরা যাক প্রেমানন্দের সেই আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানের কথায়। শুরু করেছিলেন

'সবার উপরে মানুষ সত্য'—এই সত্যভাষণটি দিয়ে। বললেন, আদি বৈদিক মন্ত্রের আদ্যবীজ যে 'ওঁ'-কার, যা ব্রহ্মের প্রতীক, যে মূলমন্ত্রের অমোঘ শক্তি নদী, পর্বত, অরণ্য, মানবজগতের অস্তিত্ব নিয়ন্ত্রণ করে বলে বিশ্বাস সেখানেও কিন্তু মানুষের মৌলিক বা সর্বোচ্চ ভূমিকার কথাই অন্তর্নিহিত রয়েছে। ওঁ বা ওম্ মন্ত্রধ্বনির প্রতীক চিহ্নটি লক্ষ্য করলেই এটা পরিষ্কার হবে। এই চিহ্নে মানব-মানবীর যৌন মিলনের প্রতিরূপ রীতিমতো স্পষ্ট। অর্থাৎ সেই আদি ওঁকার ব্রহ্মকে নয়, নরনারীর আদি-অকৃত্রিম সৃষ্টি ক্ষমতাকেই চিহ্নিত করে।

কিন্তু এই চেতনা আধুনিক চিন্তার ফসল মাত্র। প্রাচীন মানুষের কাছে প্রকৃতির বিস্ময়, রহস্যময় মহাকাশ, নানাবিধ প্রশ্ন আর কৌতূহল ছিল অজ্ঞানতার কুয়াশায় আচ্ছন্ন। সেখানে ধর্মব্যবসায়ী মুষ্টিমেয় গোষ্ঠী ব্রাহ্মণ্য ভাবধারার গৌরব প্রচারের মধ্য দিয়ে সব শ্রেণীর মানুষকে আকৃষ্ট করেছে দেবালয়ে, সাক্ষী রেখেছে অলৌকিক, দৈবিক ঘটনাকে (যাতে তাদেরই কূটকৌশল সক্রিয় ছিল অন্তরালে)। এহেন প্রতারণার ইতিহাস ৫০০০ বছর আগে থেকেই রচিত হয়েছে। [তবে মাঝে মধ্যে জালিয়াতির মুখোশও খুলেছে যুক্তিবাদী চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে, কিন্তু তার সংখ্যা ৭০ দশকের আগে খুব বেশি ছিল না, কেবল কেরলের বিজ্ঞানবাদী আন্দোলন এই মুখোশ খোলার প্রয়াসকে প্রাথমিক গতি দেয়।]

তিনি এক এক করে তাঁর সেই আপাত-অবিশ্বাস্য কাণ্ডগুলির সহজ সুন্দর ব্যাখা দিয়ে বিভ্রমের জায়গাটা চিনিয়ে দিয়েছেন।.........প্রেমানন্দ স্পষ্ট গলায় বললেন—সাঁইবাবা স্রেফ হাতসাফাই করে ভক্তদের ঠকায়, 'চিট' করে। শূন্যে হাত ঘুরিয়ে বিভূতি আনা খুবই নিম্নমানের ম্যাজিক, হাতের ফাঁকে ছাই এর গুঁড়ো লুকিয়ে রাখার কায়দা (palming) যে কেউই রপ্ত করতে পারেন অল্প চেষ্টায়। সাঁইবাবা বাঙ্গালোরের যে দোকান থেকে তার 'বিভূতি' কেনে আমিও সেখান থেকেই এই সেন্ট মাখানো ছাই কিনে এনেছি আপনাদের দেখানোর জন্য। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করবেন, সাঁইবাবারা শূন্য থেকে যে-সব বস্তু সৃষ্টি করেন বলে দাবি করেন তার সবকটাই কিন্তু বাজারে পাওয়া যায়, আমাদের অজ্ঞাত, অপার্থিব কোনো বস্তু কেন এরা সৃষ্টি করতে পারেন না? এ প্রশ্নের উত্তরেই তাদের ধোঁকাবাজী বেরিয়ে পড়ে।'

মশালের আগুন হাতে বা গায়ে বুলিয়ে দিলে চামড়া না পোড়াটাই স্বাভাবিক (যদিও শুনতে বা দেখতে আশ্চর্য লাগে)। আমাদের শরীরের যে কোনো জায়গায় মশাল অন্তত তিন সেকেণ্ড লেগে না থাকলে জায়গাটা কোনোমতেই পুড়বে না। 'ক্ষমতাধর' মহাপুরুষটিকে আগুনের শিখাটা না নাড়িয়ে এক জায়গায় মিনিট খানেক ধরে রাখতে বললেই বাছাধনের 'অলৌকিক শক্তি'-র আসল চেহারা বেরিয়ে পড়বে।

যীশুর মদ আর প্রেমানন্দের মধু তৈরির আসল রহস্য হলো—স্রেফ ম্যাজিক। স্টিলের ঘটির ভেতরে আগে থেকেই মধু মজুত ছিল, আর ভেতরে বসানো ছিল

একটা লুকনো ছোটো গ্লাস যেটা বাইরে থেকে দেখা যায় না। যে গ্লাস থেকে প্রেমানন্দ দর্শকদের সামনে ঘটিতে জল ঢাললেন সে গ্লাসটা ওই ঘটির ভেতর লুকনো গ্লাসের চেয়ে অল্প ছোটো কিন্তু মুখটা খাপে খাপে বসে যায়। ঢেলে দেওয়া জল আসলে ঘটির নিচে না পড়ে লুকনো গ্লাসে পড়ে। বাইরের গ্লাসটা ঘটিতে বসিয়ে তুলে নেওয়ার সময় প্রেমানন্দ অনায়াসে দুটো গ্লাস একত্রে তুলে আনেন, দর্শক বুঝতেও পারেন না, তারা ঘটির জমানো মধু পরম বিস্ময়ে হাত পেতে নেন। তাহলে যীশুও কি এই রকম কোনো ভেল্কি দেখিয়েছিলেন তাঁর শিষ্যবর্গকে ? প্রেমানন্দের সহজ উত্তর—হ্যাঁ, তাই। বাইবেলের কাহিনীগুলি ভালো করে পড়লে যে কোনো ম্যাজিশিয়ানই বুঝবেন যে যীশু শ-খানেক যাদু বা মিরাক্‌ল্ জানতেন, সময়মতো এগুলিই তিনি কাজে লাগিয়েছেন। কর্পূর সহজদাহ্য রাসায়নিক, নরম শিখায় জ্বলে। মুখের ভেতর নেওয়ামাত্র অক্সিজেনের অভাবে তা নিভে যায়, ভেজা জিভে কোনো তাপই লাগে না। যে-কেউ এটা করতে পারবে। কেরালার এক বিখ্যাত সন্তোষী মা-র মন্দিরে মেয়েরা দলে দলে যায় মনের চেপে রাখা দুঃখ যন্ত্রণায় মা-এর কৃপালাভের আশায়। সেখানে পুরোহিত 'আরতি'র সময় মেয়েদের দিয়ে কর্পূরের ভেল্কি দেখায় আর প্রচুর প্রণামীতে মন্দির কর্তৃপক্ষের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স ফুলে ওঠে।

সাপের মতো দেখতে লকপকে মোটা কাছিটাকে কপট মন্ত্র উচ্চারণের ভান করে প্রেমানন্দ শক্ত একটা লাঠিতে রূপান্তরিত করে বললেন—'আসলে এই মোটা দড়ির ভেতরে টুকরো টুকরো কাঠ বিশেষ পদ্ধতিতে জুড়ে লম্বা কাঠামো করা আছে। কাঠের খণ্ডগুলি এমনভাবে জোড়া আছে যে, দড়ি বা কাছিটা কেবল একটা তলেই নড়াচড়া করতে পারে, তার লম্বতলে ঘোরালেই এগুলি আর নড়ে না—পুরো কাঠামোটাই তখন সোজা শক্ত হয়ে থাকে। অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। শুধু প্রদর্শনের মুনশিয়ানাতেই বাজিমাৎ হয়।' ...খেয়াল হলো রাস্তার ধারে হকারকে প্লাস্টিকের সাপ বিক্রি করতে দেখেছি যেটা ঠিক ওইরকম টুকরো জুড়ে জুড়ে তৈরি। লেজ ধরে নাড়ালে খেলনা সাপটা কেবল বাঁ-ডান পাশে নড়ে চড়ে, ওপর নিচে বেঁকে না একটুও। প্রসঙ্গত মনে পড়ে গেল প্রখ্যাত যাদুকর পি. সি. সরকার (জুনিয়র) বলেছিলেন (দ *টেলিগ্রাফ*, ৩ মার্চ, ১৯৮৪)—মিশরে 'মাজা হালি' নামে এক ধরনের সাপ আছে যার একটি বিশেষ স্নায়ুতে আঙুলের চাপ দিলে সাপটা লাঠির মতো শক্ত হয়ে যায়, ছেড়ে দিলে আবার স্বাভাবিক হয়; এই সাপটিকে অনেক ধর্মগুরু তাদের কাজে লাগাত, বাইবেলে এরকম 'মন্ত্রবলে'(?) সাপকে লাঠি করে দেওয়ার কাহিনী রয়েছে।

যে কোনো যোগী বা জ্যান্ত অবতারের মতো জিভে তীক্ষ্ণ ত্রিশূল বিঁধিয়ে দর্শকদের হতচকিত করেন প্রেমানন্দ—তবে তারপরেই রহস্য ব্যাখ্যাও করে দেন। আসলে ওভাবে জিভ মোটেই ফুটো করা হয় না, কৌশলটা রয়েছে বিশেষভাবে তৈরি ত্রিশূলের মধ্যে আর প্রদর্শনের কায়দায়। ত্রিশূলের মাঝখানটা পুরোপুরি নিরেট নয়, বরং গোল গোল রিং জুড়ে তৈরি, যাতে ওপর-নিচে চাপ দিলে মাঝখানটা বেঁকে

বায় (ইংরিজিতে flexible portion বলা যায়)। অনেকের ঘরে টেবিল ল্যাম্প আছে যার দণ্ডটা ইচ্ছেমতো দুমড়ে বেঁকিয়ে দেওয়া যায়—একে flexible stand বলে। যাই হোক, জিভ-ফোটানো প্রদর্শনের সময় মুখের কাছে ত্রিশূলটা এনে চাপ দিয়ে বেঁকিয়ে বাঁকা অংশটা জিভের পাশে গালের ভেতর আড়াল করে নেওয়া হয়, বাইরে থেকে দেখলে সন্দেহের কোনো সুযোগই থাকে না। নিচের স্কেচটা দেখলে বুঝতে সুবিধা হবে।

প্রেমানন্দ ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্মস্থান ঘুরে দেখেছেন; নানা জায়গায় বিচিত্র সব ক্রিয়াকলাপ চলে, মানুষ অন্ধের মতো প্রতারণার শিকার হয়।

অন্ধ্রে কালভৈরবের মন্দিরে চলত এক কদর্য কারবার। অসহায় সন্তানকামী নারীকে ধর্মের টোপ দেখিয়ে বলাৎকার করার পাকা ব্যবস্থা ছিল এখানে। কালভৈরবের বিগ্রহ সম্পূর্ণ উলঙ্গ। একটি আধো অন্ধকার ঘরে জনাকয়েক পুরোহিতের সামনে হাজির হতে হয় সন্তানকামী পুণ্যার্থী মহিলাকে। একটি পিতলের মঙ্গলঘটে ভর্তি করা হয় 'মন্ত্রপূত' চাল, তারপর একটি 'পূত' দণ্ড মন্ত্র উচ্চারণের তালে তালে সেই ঘটের ভেতর ওপর-নিচে নাড়ানো হতে থাকে। কিছুক্ষণ এই প্রক্রিয়া চালানোর পর যদি দণ্ড চালের ভেতর গেঁথে আটকে যায় তাহলে বুঝতে হবে 'কালভৈরব' প্রসন্ন হয়েছেন, মহিলার ভাগ্যও সুপ্রসন্ন। অতএব এবার মহিলাকে একাকী উলঙ্গ বিগ্রহের সামনে উপস্থিত হতে হবে, পেছনে বন্ধ হবে দরজা, সাক্ষী থাকবে পুরোহিত।...এরকম 'সৌভাগ্যবতী' মহিলাদের অনেককেই দেখা গেছে দশ মাস পরে গর্ভবতী হতে। প্রেমানন্দ বললেন—কালভৈরবের মন্দিরে দুর্বলচিত্ত মহিলাকে কিছু অনর্থক মন্ত্রের গাম্ভীর্যে মোহগ্রস্ত করে চালের ঘটে লাঠির কায়দা দেখিয়ে মানসিকভাবে পুরোপুরি পর্যুদস্ত করে ধর্ষণ করা হতো। ভগবানকে সামনে রেখে এই নারকীয় কারবারের চক্র বরবাদ হয়েছে যুক্তিবাদী সংগঠনের চাপে। এক সাহসী র‍্যাশনালিস্ট মহিলা কর্মী ভৈরবের কৃপাপ্রার্থী সেজে গিয়েছিলেন অকুস্থলে। যথারীতি চাল-এর মঙ্গল ঘটে 'পবিত্র' দণ্ড আটকে দিয়ে মহিলাকে নিয়ে আসা হলো মূল মন্দির-কক্ষে। সেখানে দরজা বন্ধ করে পুরোহিত মহিলাকে বলাৎকারের চেষ্টা করতেই তিনি তুমুল হট্টগোল তুলে তীব্র আক্রমণ চালালেন ; সংস্থার অন্যান্য কর্মীরা এবার পরিকল্পনা মাফিক এগিয়ে এলো, শেষ হলো ধর্মীয় পাপব্যবসার চক্র। এই ঘটনার বিবরণ দিয়ে প্রেমানন্দ মঞ্চে হাতেনাতে করে দেখালেন চালের ঘট আর লাঠির কৌশল। একটা স্টিলের ঘটিতে চাল নিয়ে তিনি ৫/৬ মিনিট ধরে এক নাগাড়ে চালের ভেতর একটা ছোটো লাঠি ওঠানামা করাতে লাগলেন ; যেহেতু কোনো মন্ত্রেরই কোনোরকম গুরুত্ব আছে বলে প্রেমানন্দ মনে করেন না, তাই মুখে তিনি মন্ত্রোচ্চারণের সুরে 'ব্যা ব্যা ব্ল্যাক শিপ' আবৃত্তি করছিলেন। ক্রমশ চালগুলি ঘষা খেয়ে খেয়ে আরো ঘন সংবদ্ধ বা আঁটোসাঁটো হয়ে আসে, এবং একসময় এত টাইট হয় যে, লাঠিটা চালের মধ্যে ঠেসে আটকে যায়, তখন পুরো ঘটিশুদ্ধ লাঠির সঙ্গে উঠে আসে।

পুণা শহর থেকে কিছু দূরে শিবাপুর নামে একটা জায়গায় ফকির কামার আলী দরবেশ-এর দরগা আছে। সেখানে দুটো দারুণ ভারী পাথর নাকি দরবেশ-এর নামে কয়েক আঙুলের ছোঁয়ায় উঠে আসে মাটি থেকে। এই অসম্ভব অথচ বহু-প্রচারিত ঘটনাটির সহজ ব্যাখ্যা দিলেন প্রেমানন্দ। [দ্র.—উৎস মানুষ সংকলন *বিজ্ঞান অবিজ্ঞান* অপ*বিজ্ঞান* ২-এর 'পুণার দরগায় পাথর ভাসে' নিবন্ধ।]

মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত বিলাসবাবা ভক্তের হাতে তুলে দিতেন একটা মূদ্রা—দশ পয়সা, চার আনা, আট আনা জাতীয় —দিয়ে মন্ত্র পড়তেন চোখ বুজে। অল্পক্ষণের
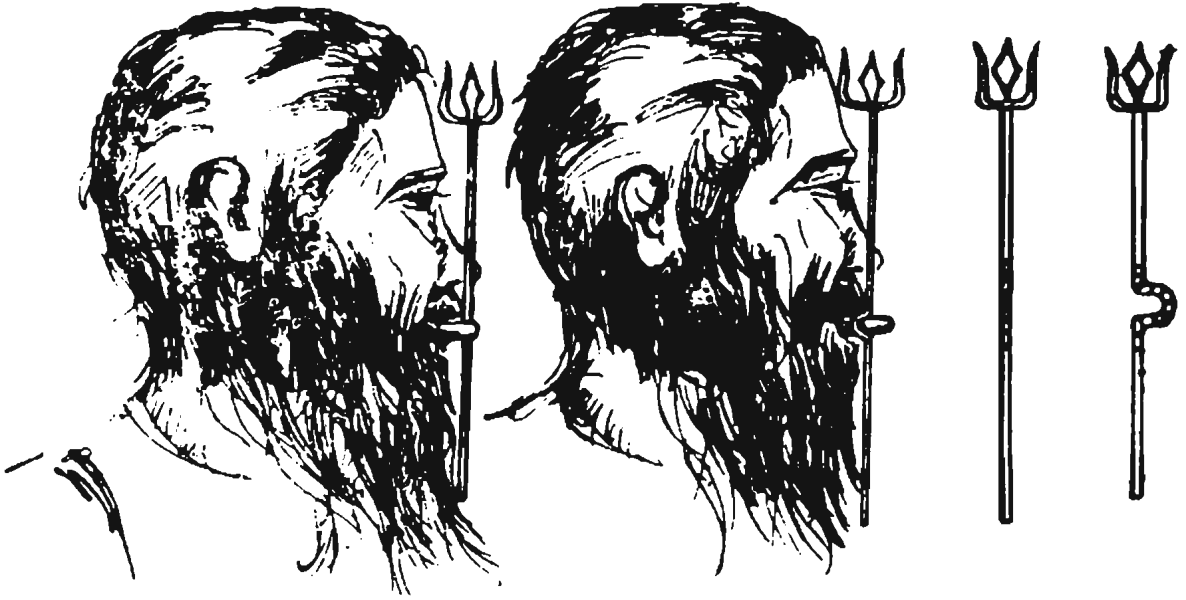
মধ্যেই হাতের পয়সাটা গরম হয়ে ওঠে এবং তা থেকে 'বিভূতি' বেরোতে থাকে। শ'য়ে শ'য়ে ভক্ত বিলাসবাবার আশ্রমে দৌড়য়। মহারাষ্ট্র যুক্তিবাদী সংস্থার গবেষক-কর্মীরা গেলেন অনুসন্ধানে। অচিরেই গুহ্য রহস্য ফাঁস হলো। মুদ্রায় থাকে অ্যালুমিনিয়াম ধাতু, 'বাবা' কৌশলে আঙুলের ফাঁকে কিছু মারকিউরিক ক্লোরাইড চূর্ণ নিয়ে মাখিয়ে দেন মূদ্রার গায়ে ; হাতে ঘাম আর বাতাসে জলীয় বাষ্প রয়েছে—এই তিন রাসায়নিক উপাদান মিলে উৎপন্ন করে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড (যাকে 'বিভূতি' নাম দেওয়া হয়) আর তাপশক্তি। বিলাসবাবার এই চিটিং-কৌশল প্রেমানন্দ করে দেখালেন মঞ্চের ওপর।

বছর কয়েক আগে দিল্লীতে সদাচারী সাঁইবাবা রীতিমতো আলোড়ন তুলে দেন তাঁর অলৌকিক মানসিক শক্তির কথা প্রচার করে। যজ্ঞের কিছু কাঠে ঘি ছিটিয়ে মন্ত্র পড়ে গভীর মনঃসংযোগ করেন সদাচারীবাবা—ঝপ্ করে কাঠে আগুন জ্বলে ওঠে সংঘাতিক কাণ্ড! ভিড় সামলানো দায়। মাত্র তিন দিনে আট লাখ টাকা সংগ্রহ করেন সদাচারীবাবা। এদিকে আবার কানাঘুষোয় কিছু খবরও শোনা গেল—বাবার নাকি চারটি স্ত্রী, প্রথম স্ত্রীকে সে খুন করেনি, কোর্ট কেস এড়িয়ে বেড়াচ্ছে এখন সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব বোধ করেই দিল্লীর Rationalist Association সদাচারীবাবার তথাকথিত 'মানসিক শক্তি' পরখ করতে নামেন। সত্য প্রকাশ পেতে

সময় লাগে না। প্রেমানন্দ মঞ্চে অনুরূপ আগুন জ্বালালেন—অবশ্যই কোনোরকম মানসিক শক্তির জোরে নয়, স্রেফ রাসায়নিক বিক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে। তিনি বললেন, সদাচারীবাবা কাঠের টুকরোর নিচে আগে থেকে রেখে দিতেন পটাশ পারম্যাঙ্গানেট ; কাঠে ঘি যে ছেটাতেন সেটা আসলে ঘি থাকত না, থাকত গ্লিসারিন। পারম্যাঙ্গানেট আর গ্লিসারিন মিলে প্রবল তাপ তৈরি হতো, কাঠ জ্বলে উঠত। যুক্তিবাদীদের জ্বালাতনে 'বাবা' সিঙ্গাপুরে পলায়ন করেন কিন্তু সেখানেও মুখোশ খুলে যায়। এবার পুলিশ আর কাস্টমস্ অফিসাররা সদাচারীবাবার প্রাণান্ত করে ছাড়ে। র‍্যাশনালিস্ট কর্মীদের আরো বহু সফল আন্দোলনের খবর পাওয়া যায়।

সানডে পত্রিকায় ৮-১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ সংখ্যায় খবর বেরিয়েছে 'ভগবান' শ্রীসত্য সাঁইবাবা বাঙ্গালোরে তার সাধের 'বৃন্দাবন আশ্রম' বন্ধ করে অন্যত্র কেটে পড়েছেন। এর মূলে রয়েছে বাঙ্গালোরের 'কর্ণাটক যুক্তিবাদী সংস্থা'-র একনিষ্ঠ বিজ্ঞান আন্দোলন। সাঁইবাবার আশ্রমের নানাবিধ অপকীর্তি, ধর্মীয় জালিয়াতি ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে তাদের স্বার্থের সংঘাত সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা গিয়েছিল ওই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।

সারা ভারতেই আজ বিভিন্ন রাজ্যে র‍্যাশনালিস্ট সংস্থাগুলি কমবেশি সক্রিয়। কেরালা, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, ও উড়িষ্যার সংস্থাগুলি তুলনামূলকভাবে বেশি সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। যদিও গোটা দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামো বিশ্লেষণ, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সমন্বয়, শ্রেণী সংগ্রাম ও সমাজতন্ত্রের বিকাশের জন্য লড়াই, ইত্যাদি গূঢ়তর ক্ষেত্রগুলিতে ভারতের যুক্তিবাদী সংস্থাগুলির ভূমিকা কিছু সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ বলা চলে, তবু এদের গণমুখী সাংস্কৃতিক উদ্যোগগুলি নিঃসন্দেহে মূল্যবান।

ভারতের বুকে যুক্তিবাদী (Rationalist) সংগঠনগুলির ঘোষিত ব্রত হলো—'আমাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব ব্যাপক স্তরে বিস্তৃত। আলৌকিকতাবাদী কায়েমী গোষ্ঠীর তুলনায় আমাদের লোকবল ও অর্থবল নিতান্তই নগণ্য তবু, যুক্তি ও বিজ্ঞানের মতো সম্পদ রয়েছে আমাদের দিকে। আমরা প্রতি ক্ষেত্রে সফল না হতে পারি কিন্তু গোঁড়ামি ও সনাতন ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই সর্বজয়ী। সাহস ও অদম্য বিশ্বাস নিয়ে পায়ে পা মিলিয়ে আমাদের এগোতে হবে সত্য প্রতিষ্ঠার স্বার্থে।' [Maharastra Rationalist Association প্রকাশিত বুলেটিন থেকে]

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

ফেব্রুয়ারি '৮৬

দানিকেনের দেবতাতত্ত্ব : একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন

দানিকেনের তুলে ধরা প্রশ্নটি—'দেবতা কি গ্রহান্তরের মানুষ?' এক অর্থে যুক্তিবুদ্ধিকেও নাড়া দেয়। যাদের দেবতা ভাবা হয়, আকাশে যারা থাকে বলে কল্পনা করা হয়, যে দেবতারা রথে চেপে মহাকাশ থেকে নানা সময়ে পৃথিবীতে এসেছে বলে পুরাণে বলা হয়, তারা গ্রহান্তরের উন্নত কোনো জীব নয়ত? এই প্রশ্নের পথ ধরেই দানিকেনের গবেষণা শুরু। বহু তথ্য তিনি সংগ্রহ করেন, বহু পুরাণ-কথা তিনি জড়ো করেন, আর তার উপর দাঁড়িয়ে একের পর এক চমকে দেওয়া গ্রন্থ রচনা করেন।

আবার দানিকেনকে কেন্দ্র করেও বেশ কয়েকটি বাংলা গ্রন্থ লেখা হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ব্লুমরিশ—নাসার একজন প্রাক্তন প্রযুক্তিবিদের লেখা গ্রন্থের অনুবাদ *তখন স্বর্গ খুলিয়া গেল।* এতে দানিকেনের তত্ত্বের পক্ষে প্রযুক্তিগত কিছু প্রমাণ দিয়ে দেবতার রথের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। দানিকেনের তত্ত্বের আলোকে রামায়ণ মহাভারতকে ব্যাখ্যার কাজেও কয়েকজন নেমে পড়েছেন। নব গবেষণার নামে এ-জাতীয় প্রয়াস গুরুত্ব আদায় করতে চাইলেও অপ্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের ওপর দাঁড়িয়ে এমন গবেষণা কার্যত কল্পনারই পাখা মেলা মাত্র।

দানিকেনের বক্তব্যের বিরুদ্ধে সৎ সমালোচনা কিছুই লিখিত হয় নি বলা চলে। দানিকেন-তত্ত্ব সমীক্ষার সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো এতগুলি গ্রন্থের মুদ্রিত পাতায় জড়িয়ে থাকা অসংখ্য দৃষ্টান্ত নিয়ে আলোচনা চালানো। এখানে এই পত্রিকার স্বল্প পরিসরে তো সে সুযোগই নেই; কেবল কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে মাত্র।

দানিকেন-তত্ত্বের মর্মার্থ

দানিকেন যা বলতে চেয়েছেন তা হলো সুদূরপ্রসারী অতীতে কোনো এক বা একাধিক সময় কোনো অজানা গ্রহ থেকে অতি উন্নত একদল প্রাণী এই পৃথিবীতে পদার্পণ করেছিল। সেই প্রাণীরা মানব-প্রজাতি নিয়ে গবেষণা চালায়। তারা মানুষের মস্তিষ্কে, মানুষের বংশানুতে (Gene), অস্ত্রোপচার ও নানা ধরনের গবেষণা চালায়; মানবীদের সঙ্গে যৌন সংসর্গের মাধ্যমে সৃষ্ট নতুন মানুষকে তারা দেয় ভাষা, তারাই করে তোলে নানা জ্ঞানে সভ্য সমৃদ্ধ; সারা পৃথিবী জুড়ে মায়া, আজটেক, মিশর, ইস্টার সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা কীর্তিকাহিনী। স্থাপত্য, তাদেরই দ্বারা বা তাদেরই নির্দেশে সৃষ্টি হয়েছে। দানিকেনের বক্তব্য এই প্রাণীদেরই মানুষ দেবতা বলে মনে করেছে যুগে যুগে। তাদের আকাশে যাতায়াত দেখেই দেবতাদের অনুসন্ধান করেছে মানুষ

আকাশে। সুতরাং আমাদের উচিত সেই গ্রহান্তরের প্রাণীদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা। তার জন্য আধুনিক বিজ্ঞান, টেলিপ্যাথি, দিব্যদর্শন, সবকিছুরই সাহায্য গ্রহণ করা দরকার বলে মনে করেন সুইজারল্যাণ্ডের সৌখিন প্রত্নবিদ্ এরিক ফন দানিকেন।

দানিকেন-তত্ত্ব কতদূর বিজ্ঞানসম্মত

যে কোনো অনুমান নিছক কল্পনা দিয়েই শুরু করা যেতে পারে কোনো বক্তব্যে পৌঁছোনোর জন্য, কিন্তু সেই অনুমানকে প্রথমত নানা ধরনের পর্যবেক্ষণের মধ্যে দিয়ে সম্ভাব্য করে তুলতে হবে, তারপরে বাস্তব প্রমাণের ভিতর দিয়ে সেই অনুমানকে তত্ত্বে রূপান্তর করা সম্ভব হলেই সে পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক হয়। দানিকেন যে তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন তাকে এই জাতীয় কোনো প্রমাণের মধ্যে দিয়ে বিচার করা হয় নি, যদিও তার রচিত ষষ্ঠ গ্রন্থটির নামই হলো *প্রমাণ।* এই মৌলিক গোলমালটা গোড়াতেই মনে আনা দরকার।

তত্ত্বপ্রমাণের ক্ষেত্রে আর একটি পদ্ধতি হলো অনেকগুলি সম্ভাবনা দিয়ে শুরু করা। এভাবে শুরু করে দুর্বল সম্ভাবনাগুলিকে একে একে নাকচ করে (elimination) একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়। এরপর সেই নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তকে প্রমাণ দ্বারা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। দানিকেন সে পথেও যান নি। তিনি একই সঙ্গে অনেকগুলি সম্ভাবনাকে হাজির করেছেন এবং ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সবগুলিকেই বারবার তুলে ধরেছেন সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হিসেবে।

দানিকেন থেকে উদাহরণ দেওয়া যাক। দানিকেন অনুমান করেছেন যে, গ্রহাণুপুঞ্জ গোড়াতে একটি গোটা গ্রহ ছিল, তার বিস্ফোরণের পরই ভারসাম্যের পরিবর্তন হয় এবং পৃথিবী গ্রহ কাত হয়ে যায়। দানিকেনের এই অনুমানকে গাণিতিক হিসাবনিকাশের মধ্যে দিয়ে পরীক্ষা করা অসম্ভব ছিল না আদৌ, কিন্তু করেন নি তিনি। গ্রহাণুপুঞ্জের মোট আয়তন ও ওজন কত? তার দ্বারা অন্যান্য গ্রহের ভারসম্যকে কতটুকু প্রভাবিত করা সম্ভব? এসব পরীক্ষার মধ্যে দানিকেন যান নি (তাতে আবোল তাবোল বলার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে বলেই কি?)। দানিকেন ইকোয়েডরে প্রাপ্ত স্বর্ণফলকের ভাষাকে বহির্বিশ্বের উন্নত ভাষা বলে অনুমান করেছেন, কিন্তু তা নিয়ে পাঠোদ্ধারের পথে যান নি। এইভাবে তার সমস্ত অনুমানগুলিই পরিশেষে কল্পনাবিলাসেই শেষ হয়েছে।

দানিকেন বলেছেন, গ্রহান্তরের প্রাণী এসেছিল এই পৃথিবীতে। প্রশ্ন এসে যায়—কবে এসেছিল সেই প্রাণী? দানিকেনের উল্লেখ থেকেই সেরকম কয়েকটি সন তারিখ পাওয়া যাচ্ছে : যথাক্রমে খ্রিস্টপূর্ব ৫৯২, ৭০০০, ১২৬০০, ৪০০০০ এবং ১৫০০০০০০ সন।

এই সমস্ত সনগুলিই দানিকেন দেবতাদের বিভিন্ন কাজ বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন। এ থেকে সিদ্ধান্ত করতেই হয় যে, দেবতারা এসব সময়েই এসে থাকবে।

এখন. বিভিন্ন সময়েই যদি গ্রহান্তরের প্রাণী পৃথিবীতে এসে থাকে তাহলে প্রশ্ন দেখা দেয়, তারা বারবার আসত কেন? কি ছিল তাদের উদ্দেশ্য?

এ প্রশ্ন দানিকেনও তুলেছেন। তার নিজের বক্তব্য অনুসারে দেবতাদের আসার উদ্দেশ্য ছিল : এক, গবেষণা। ঠিক যেমন আমরা গবেষণার জন্য চাঁদে যাই বারবার, সেই রকম। দুই, সেই মহাকাশচারীদের গ্রহে বাসোপযোগী অবস্থা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বলে তারা পৃথিবীকে বাসস্থান হিসেবে খুঁজে বের করেছিল। তিন, কোনো সুদূর গ্রহে দু-পক্ষের ভিতর লড়াই হবার ফলে পরাজিত পক্ষ পৃথিবীতে পালিয়ে এসেছিল।

এখানেও পরস্পরবিরোধী সম্ভাবনা। গবেষণার জন্য যারা আসবে, পরিকল্পিতভাবে নয়া বাসস্থান গড়তে যারা আসবে, আর হঠাৎ পালিয়ে যারা আসবে তাদের কাজ কি পৃথিবীতে একরকম হতে পারে? শেষোক্ত দুটি ক্ষেত্রেই সেই দেবতারা হবে এ-পৃথিবীর স্থায়ী বাসিন্দা—যার চিহ্ন দানিকেনও খুঁজেপেতে দেখান নি। তারা যদি এ-পৃথিবীতে বাস করে থাকেই তবে প্রাচীন সভ্যতাগুলির চেহারা তো আদিম হতে পারে না! ভাষা অনুন্নত হতে পারে না। সমস্ত কীর্তি প্রস্তরময় হওয়া সম্ভব নয়। উন্নত বিজ্ঞান অনুপস্থিত থাকতে পারে না। অথচ দানিকেনের সব নিদর্শনগুলিই সেইরকম। অতএব দানিকেনের তুলে ধরা উদাহরণকে ভিত্তি করে আমরা ধরে নিতে পারি সেই গ্রহান্তরের প্রাণীরা গবেষণার স্বার্থেই এ-পৃথিবীতে আসত মাঝে মাঝে।

আবার প্রশ্ন, তারা আসা বন্ধ করে দিল কেন? দানিকেনের বক্তব্য অনুসারে 'উড়ন্ত পিরিচ' (ফ্লাইং সসার) যা এখনো মাঝে মাঝে আকাশে দেখা যায় তা হলো উন্নত প্রাণীর প্রেরিত যান। হয়ত পৃথিবীকে পর্যবেক্ষণ করতে আসে তারা বর্তমান কালেও। তিনি আরও বলেছেন যে, মানুষের মস্তিষ্কের জটিল প্রক্রিয়াকে দিগ্‌দর্শন বা দূরনিয়ন্ত্রণ মারফৎ গ্রহান্তরের প্রাণীই পরিচালনা করছে। তারাই মানুষের চরম নিয়ন্তা। অতএব সেই দেবতারা ধ্বংস হয়ে গেছে একথাও বলা যায় না। কিন্তু সুদীর্ঘকাল ধরে যারা বারবার মহাকাশযানে চড়ে এই পৃথিবীতে পদার্পণ করেছিল তারা হঠাৎ তাদের হাতে গড়া মানুষকে দেখতে আসা বন্ধ করে দিল কেন? তারা কি তবে পৃথিবীকে স্বর্গ করে তুলতে না পেরে মনের দুঃখে দূরেই রয়ে গেল?

দানিকেন-তত্ত্বের সর্বপ্রধান দুর্বলতা হলো এই প্রাথমিক প্রশ্নগুলির কোনো যুক্তি-সঙ্গত উত্তর তো নয়ই, এমন কি আনুমানিক সিদ্ধান্তেও পৌঁছাতে না পারা। এটাও হতে পারে, ওটাও হতে পারে, এমন যুক্তি দিয়ে কোনো তত্ত্বের দাবিদার হওয়া যায় না। তত্ত্বকে নির্দিষ্ট একটা পথে এগোতেই হবে। অনুমানের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত দুর্বল ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে যে তত্ত্ব তার পর্যবেক্ষণ স্বভাবতই হবে এলোমেলো; প্রকৃতপক্ষে আমরা দেখতে পাই দানিকেন-তত্ত্বের সমস্ত পর্যবেক্ষণই কার্যত এলোমেলো, পরস্পরবিরোধী এবং অতিশয়োক্তিতে ভরা। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক এ-প্রসঙ্গে, উদাহরণগুলি দানিকেনেরই বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে নেওয়া।

দানিকেন বলেছেন, গ্রহান্তরের প্রাণীরা মনুষ্যেতর প্রাণী থেকে মানুষ সৃষ্টি করতে গিয়ে যখন দেখেছে যে, বে-চালে অনভিপ্রেত প্রজাতি তৈরি হয়ে গেছে, তখন

দু-টি একটি নমুনা রেখে কৃত্রিম বন্যা বা প্রলয় সৃষ্টি করে সব সৃষ্টিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আবার তিনি অন্যত্র বলেছেন যে, গ্রহাণুপুঞ্জ একটি গোটা গ্রহ ছিল; সেইটি বিবদমান দুইদল মহাকাশচারীর একাংশের পরিকল্পনায় ধ্বংস হওয়ার পরিণামেই পৃথিবী ২০ $\frac{১}{২}$ কাত হয়ে যায় এবং তারই ফলে দেশে দেশে বন্যা দেখা দেয়। এর কোনটি ঠিক?

দানিকেন প্রযুক্তিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে সিদ্ধান্ত করেছেন—সুউন্নত মহাকাশযান অবশ্যই হবে সুগোল। সেই সুগোল দেবতার রথ দেখেই পৃথিবীর মানুষ দেশে দেশে গোল জিনিস তৈরি করেছে পবিত্রতার প্রতীক হিসাবে। গোল মহাকাশযানের কাল্পনিক এক চিত্রও তিনি এঁকে দিয়েছেন, আবার পাশাপাশি পাতার পর পাতা ইজ়েকিয়েলের দেখা চার পা-ওয়ালা মহাকাশযানের বর্ণনাও তিনি দিয়েছেন। তাঁর তত্ত্বের সমর্থক 'নাসা'র প্রাক্তন প্রযুক্তিবিদ ব্লুমরিশের গবেষণা-উদ্ভূত গ্রহান্তরের মহাকাশযানের ছবি হলো চারপেয়ে শঙ্কু। এদের কোনটিকে সম্ভাব্য চেহারা হিসাবে ধরা যাবে?

The raising of the megaliths
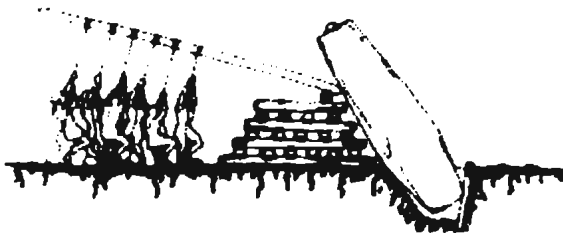
Deep pits with one sloping side were dug to house the great sarsen stones, some of which weighed as much as 45 tons. The stones were probably lowered into the pits with the aid of ropes and rollers, then slowly raised by using a scaffold as the fulcrum of a rope-operated lever. In the last stage, ropes alone may have been used to straighten the stones.
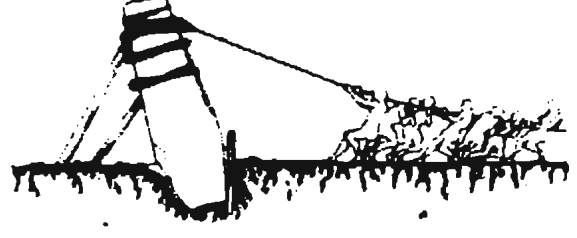
Once the uprights were in position, the 7 ton lintels were probably placed on a timber platform. As the stone was inched higher with levers, wedges and blocks, the platform
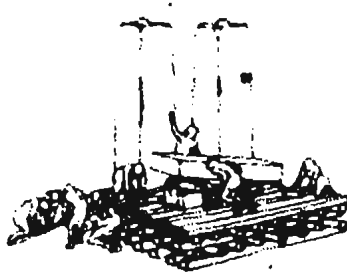
was built up from below. Finally, the lintel was slid into position on top of the uprights, which had pegs carved to fit exactly into the mortise sockets on the lintels.
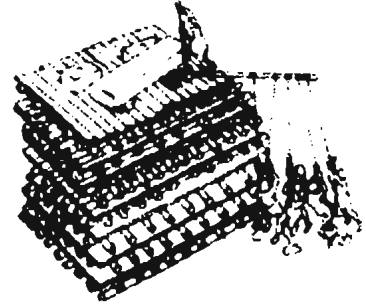
ক্রেন বা অতি-আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্য ছাড়াই কেবল লাঠি-লকড়ি আর বুদ্ধি দিয়ে নিপুণ কৌশলে বিশাল বিশাল প্রস্তরখণ্ড নড়ানো ওঠানো সম্ভব।

এমনি আরও অনেক উদাহরণ তুলে ধরা যায় যা পাতার ব্যবধানে স্ববিরোধী হয়ে উঠেছে দানিকেনের গ্রন্থগুলিতে। এমনি এলোমেলো, যেমন ইচ্ছা ব্যাখ্যার ফোয়ারা ছুটিয়ে কোনো বস্তু, বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যে প্রতিষ্ঠা করা যায় না, তা বলাই বাহুল্য। *প্রমাণ* নামে বিশাল গ্রন্থ দানিকেন রচনা করলেও তাঁর সাতটি গ্রন্থে সঠিক প্রমাণ তিনি কিছুই করতে পারেন নি।

প্রমাণ বইটিতে তিনি ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে কাশ্মীরের মার্তণ্ড মন্দিরে যে গবেষণা চালান তার কিছু বর্ণনা আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো তারই সমর্থক ব্লুমরিশ এই সম্পর্কে বলেছেন, 'ইজেকিয়েলের রথ নামার দরুণ যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তা থাকার কথা, দানিকেনের যন্ত্রে মাপা তেজস্ক্রিয়তার সমান তা হতেই পারে না; কারণ আড়াই হাজার বছর পর সে তেজস্ক্রিয়তার নামমাত্র অবশেষই থাকার কথা। অর্থাৎ ইজেকিয়েলের দেখা মহাকাশযান কাশ্মীরে নেমেছিল বলে দানিকেন যা প্রমাণ করতে চেয়েছেন (তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপ করে), তাকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে গ্রহণ করা যায় না। উল্লেখযোগ্য, কাশ্মীরের মার্তণ্ড মন্দিরে গবেষণা চালিয়ে শ্রীনগরের নিউক্লিয়ার রিসার্চ ল্যাবরেটরির ভাবা অ্যাটমিক সেন্টারও তেজস্ক্রিয়তার সন্ধান পান নি।

অতিশয়োক্তির ছড়াছড়ি

দানিকেনের গোটা প্রকল্পটি উদাহরণ নির্ভর। অসংখ্য উদাহরণ বিস্ময় সৃষ্টির জন্য হাজির করা হয়েছে। কিন্তু সেই আপাত বিস্ময়কর বিষয়গুলির সম্ভাব্যতা নিয়ে এত আংশিক আলোকপাত করা হয়েছে যে, তা থেকে প্রকৃত সত্য প্রকাশিত হতে পারে না। কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে।

এক ॥ পাথরের তৈরি এক নরকঙ্কালের কথা বলা হয়েছে। দশজোড়া পাঁজর রয়েছে দৈহিক গঠন অনুযায়ী নিখুঁতভাবে। দানিকেনের বিস্ময়—'প্রাগৈতিহাসিক ভাস্করদের প্রয়োজনে কি শবব্যবচ্ছেদী পণ্ডিতেরা দেহ ছেঁড়া-কাটা করতেন? আমরা তো জানি, ১৮৯৫ সালের আগে রন্টজেন, সেই নতুন রশ্মি, যার নাম এক্সরে, আবিষ্কারই হয় নি।' অর্থাৎ রঞ্জন রশ্মি আবিষ্কৃত না হলে কিম্বা শবব্যবচ্ছেদ না জানলে ঐ পাথরের নরকঙ্কাল তৈরি করা সম্ভব নয়। সহজ সত্যকে জটিল করে তোলার এমন চেষ্টা কেন? এক্সরে ছাড়াও চর্মচক্ষু দিয়ে যে নরকঙ্কাল দেখা সম্ভব তা দানিকেনের মাথায় আসে নি। মৃত জন্তুর পচে যাওয়া কঙ্কাল, কবরস্থ নরদেহের কঙ্কাল কিংবা রুগ্নদেহীর বুকের দিকে তাকিয়েই যে ভাস্করের পক্ষে এমন সৃষ্টি সম্ভব তা দানিকেনকে কে বোঝাবে?

দুই ॥ এস্কিভুর কাহিনী প্রসঙ্গে দানিকেন বলেছেন যে, সূর্যদেব নেমে এলেন ভারী সীসার মতো—এই কথা নাকি উচ্চতর বিজ্ঞানের জ্ঞান ছাড়া কল্পনা করা সম্ভব নয়। তার মতে—'সব বাতিল করলেও একটা কথা বাদ দিতে বাধে যে সেই প্রাচীন কাহিনীকার জানলেন কেমন করে যে, একটা বিশেষ গতিতে যে কোনো বস্তু সীসার মতো ভারী হয়ে ওঠে!' অর্থাৎ গতির সঙ্গে ভরের বৃদ্ধিতত্ত্ব সেই পুরাণ কাহিনীকার জানতেন। ভাববার স্বাধীনতা থাকলেই যে এমন যা খুশি বাবা যেতে পারে তা দানিকেনকে না দেখলে বোঝা যেত না। গতিবৃদ্ধির সঙ্গে বস্তুর ভরের বৃদ্ধি ঘটে (আইনস্টাইনের তত্ত্ব) কিন্তু সেই গতি যদি আলোর গতিবেগের কাছাকাছি হয় তবেই এই ভরবৃদ্ধি বোঝা যায়। হিসেব করে দেখা গিয়েছে যে, পৃথিবীতে যে বস্তুর ওজন ১০০ কিলোগ্রাম, সেকেণ্ডে ১১কিলোমিটার গতিবেগে চললে সে বস্তুর ভর বৃদ্ধি

পায় মাত্র ০.৩৫ মিলিগ্রাম। এই গতি ২.৫ লক্ষ কিলোমিটার প্রতি সেকেণ্ডে হলে ভর বৃদ্ধি পাবে দ্বিগুণের চেয়ে কিছু বেশি। আসলে আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুযায়ী পরিবর্তনগুলি এর চেয়ে বহু অধিক গতির ক্ষেত্রেই কেবল উল্লেখযোগ্য হয়। আর এখানে মনে রাখা দরকার যে, ভর যেমন গতিবেগের সঙ্গে বৃদ্ধি পায় তেমনি গতি হ্রাস পেলে ভর আবার কমেও আসে। ফলে ঐ উদাহরণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব জানা লেখক দিয়ে থাকলেও সূর্যদেবের রথ নেমে আসবার সময় তার ওজন হ্রাস পাওয়া এবং তাতে চাপা পড়ার অসম্ভাব্যতার কথাও তার জানা উচিত ছিল। কাজেই এই সূর্যের রথের কাহিনীতে বিশেষ গতিবেগে ভরবৃদ্ধির প্রসঙ্গ নিয়ে আসবার কোনো কারণই থাকতে পারে না, আনলে সেটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিকৃতি হয়ে দাঁড়ায়।

তিন ॥ প্রাগৈতিহাসিক এক ডাইনোসরাসের ছবি দেখে দানিকেন বিস্মিত হয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'কেমনতরো চিন্তাশীল জীব সে যে ডাইনোসরাসের মতো সরীসৃপকে পৃথিবীর বুকে চরে বেড়াতে দেখেছে?' ডাইনোসরাসের যুগ আর হোমোসেপিয়েনসের যুগের ভিতর যে দুস্তর ব্যবধান, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, গ্রহান্তরের কোনো উন্নত প্রাণী সচক্ষে দেখেছিল ডাইনোসরাসকে, তাতে আদিম মানুষের কোনো লাভ নেই। তা ছাড়াও এমন ছবি অনেকভাবেই আঁকতে পারে প্রাচীন মানুষেরা। প্রথমত অন্য কোনো জন্তুকে দেখে তার অনুকরণ করে, দ্বিতীয়ত ডাইনোসরাসের কোনো জীবাশ্ম দেখে, তৃতীয়ত ডাইনোসরাস-জাতীয় কোনো টিকে থাকা অতিকায় জন্তুর চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা থেকে। মাছ থেকে প্রথম চতুষ্পদ জন্তুর বংশধর এই শতাব্দীতেও আফ্রিকায় জ্যান্ত খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। কোমডো (ইন্দোনেশিয়া) দ্বীপে ডাইনোসরাসের প্রজাতি ১৯২৭ সনে সরাসরি খুঁজেই পাওয়া যায়। পরবর্তী সময়ে ফরাসী ও রুশ অভিযাত্রীরা কোমডোর এই ডাইনোসরাস,

নাজকা মরুভূমির পাথুরে জমিতে অতিকায় গোলকধাঁধা। একি প্রাচীন অধিবাসীদের উর্বরতার প্রতীক চিহ্ন? দানিকেন এর মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন গ্রহান্তরের 'দেবতা'র কারুকাজ।

যাদের স্থানীয় লোকেরা 'পরাণ' বলে, তার উপর বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করেন। সুতরাং এমনি কিছু দেশে প্রাগৈতিহাসিক ঐ ছবি আঁকা খুবই স্বাভাবিক।

চার ॥ জোনাথন সুইফ্‌ট-এর *গালিভার্‌স্ ট্রাভেল্‌স গ্রন্থে* লাবুটা জ্যোতির্বিদদের দেখা মঙ্গলের দুটি উপগ্রহের কথা আছে। দানিকেন তাতে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। '১৮৭৭ সালে মার্কিন জ্যোতির্বিদ হলের আবিষ্কারের অনেক আগে থেকেই মঙ্গলের দুই উপগ্রহের কথা মানুষের জানা ছিল'—কিন্তু সুইফ্‌টের এই কল্পনার ভিত্তি তখনকার আবিষ্কারের ভিতরেই পাওয়া সম্ভব ছিল। পৃথিবীর উপগ্রহ হলো চাঁদ। মঙ্গলের উপগ্রহ তখনও আবিষ্কৃত হয় নি। তারপরের গ্রহ বৃহস্পতির তখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত উপগ্রহের সংখ্যা চার। তারপরের গ্রহ শনির উপগ্রহের সংখ্যা তখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে পাঁচটি, বলয়কে ধরলে ছয়। অর্থাৎ বিন্যাসটা দাঁড়াচ্ছে ১, *, ৪, ৬। এ থেকে মঙ্গলের উপগ্রহ দু-টি ভাবা কি অসম্ভব? তা ছাড়া গ্রীক পুরাণে কথিত আছে যে, মঙ্গল দেবতার রথের দুটি ঘোড়া। এ থেকেও এমন ধারণা জন্মানো অসম্ভব নয়। আবিষ্কৃত উপগ্রহ দু-টির নাম কিন্তু সেই অনুসারেই ফোবেস এবং ডাইমন দেওয়া হয়েছে।

ওই ধরনের বহু উদাহরণ তুলে ধরে দেখানো যায় যে, যে সমস্ত বিষয় সামগ্রিক পরিস্থিতির বিচারে ব্যাখ্যার যোগ্য তাকেই দানিকেন রহস্যজনক বলে তুলে ধরেছেন। এই ধরনের অনুমান কার্যত কোনো সিদ্ধান্তই এনে দেয় না। কেবল অনুমানের স্তরেই সীমাবদ্ধ রেখে কোনো কিছুকে তত্ত্ব বলে দাবি করা যায় না। করলে তখন বিভ্রান্তি প্রচারের দায়ে দায়ী হতেই হয়।

বিজ্ঞানের বিকৃতি

মানবজাতির জ্ঞান-ভাণ্ডারের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ রত্ন হলো বিজ্ঞান। আর বিজ্ঞানের দাবি এত সবল যে, তার কাছে অবৈজ্ঞানিক অযৌক্তিকের অস্তিত্ব ক্রমশ মুছে যেতে বসেছে। তাই টিকে থাকার জন্য অবৈজ্ঞানিক বিষয়কে ধরতে হচ্ছে বিজ্ঞানের ভেক। যেভাবেই হোক বিজ্ঞানের খোলস চড়াতে হচ্ছে। দানিকেনের অনুমান-নির্ভরতত্ত্ব তাই প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্যে বিজ্ঞানেরই বিকৃতিতে নেমে পড়েছে ; ছত্রে ছত্রে তার সে প্রচেষ্টা ফুটে উঠছে।

গতির প্রসঙ্গে দানিকেনের দাবি—আলোর চেয়ে অধিক গতি অর্জন করা এমন কিছু সমস্যার ব্যাপার নয়। হ্যাঁ। বিজ্ঞান ভবিষ্যতে, বহুদূর ভবিষ্যতে কি করতে পারে তা আজই নিশ্চিত করে বলা যায় না ঠিকই, কিন্তু বিভ্রান্তিকরভাবে বর্তমান জ্ঞান থেকেই মনগড়া তত্ত্ব পরিবেশন করা অত্যন্ত অন্যায়। তিনি বলেছেন, 'আজ তো রেডার সেট্-ই চালানো হয় সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল গতি বিশিষ্ট তরঙ্গ দিয়ে।' কিন্তু 'রেডার সেট' কথাটির অর্থ কি? রেডিও তরঙ্গ ব্যবহার করা হচ্ছে এমন যন্ত্র। রেডিও তরঙ্গ হলো এক ধরনের বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ, তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যাই হোক, আলোর সমান গতিরই সে অধিকারী। সুতরাং রেডার সেটের তরঙ্গ

যে গতিতে চলে অন্য কিছু তার চেয়ে অধিক গতিতে চলতে পারবে—এমন ভাবনাটা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক, অর্থহীন।

এখান থেকে শুরু করে আরেকটু এগিয়ে তিনি বেশ সাহস নিয়েই বলেছেন, 'ফোটন চালিত একটি ইঞ্জিন দিয়ে তৈরি মহাকাশযানকে আলোর গতিতে তোলা সম্ভব হবে। তারপর আলোর গতি লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই টেকিয়ন কণা চালিত ইঞ্জিনটাকে চালু করবে একটি কম্পিউটার। বলুন তো কত জোরে তখন মহাকাশযান চলবে? আলোর চেয়ে একশগুণ হাজার গুণ জোরে। সে হিসাব আজ কেউ দিতে পারে না।'.......কিন্তু সরল এই হিসেবের গোলমালটা কোথায়? পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত নিয়মের ভিত্তিতে আমরা জানি, কোনো জাগতিক জড় বস্তুর গতি বৃদ্ধি পেয়ে আলোর গতি লাভ করতে পারে না। কারণ ঐ গতিতে সেই বস্তু অসীম ভর লাভ করবে। যেহেতু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই অসীম, সুতরাং তার কোনো একাংশ একটি গতির মাধ্যমে অসীম হয়ে উঠতে পারে না। পরের কথা হলো আলোর অধিক গতিশীল হলো টেকিয়ন। টেকিয়ন এখনও পর্যন্ত গাণিতিক কণা। অর্থাৎ তার কোনো বাস্তব অস্তিত্ব আজও অনাবিষ্কৃত। অনুমান করা হয়, এমন কোনো কণা বিশ্ব-সৃষ্টির আদিতে দেখা দিয়েছিল হয়ত ; তবে তা তখন থেকেই ক্রম অপসৃয়মান। তার অবশেষ কিছু থাকলেও টেকিয়ন-জগৎ এবং ফোটন জগৎ কখনই পরস্পর হাত ধরতে পারবে না; কারণ বস্তুজগৎ আলোর গতিতে পৌঁছাতে পারবে না, আর টেকিয়ন জগৎ আলোর গতিতে নামতে পারবে না—কারণ তার অস্তিত্ব সম্ভব কেবল আলোর ঐ দু-গতিতে। অথচ এমনভাবে মিলিয়ে মিশিয়ে দানিকেন তার গতিতত্ত্ব খাড়া করেছেন যে, তাতে টেকিয়ন ও ফোটন হাত ধরাধরি করে চলছে। এটি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক এবং ভ্রান্ত।

প্রাণিতত্ত্ব সম্পর্কে দানিকেন এক কথায় ডারউইনের তত্ত্বকে নাকচ করে দিয়েছেন। নাকচ করে দিয়েছেন ডারউইন-পরবর্তী প্রাণিতত্ত্বের বিকাশকেও। তিনি নাকচ করেছেন জীনতত্ত্ব ও কোষতত্ত্বকেও। পাঠকের কাছে এই তত্ত্বের সম্পূর্ণ চেহারাটা লুকিয়ে রেখে এখান-সেখান থেকে অসম্পূর্ণ তথ্য এলোমেলোভাবে টেনে এনে নিজের বক্তব্য বলে গিয়েছেন।

জীবনের উৎস সম্পর্কে হ্যলডেন-ওপারিনের আধুনিকতম তত্ত্বকে জানার পর দানিকেন দাবি করেছেন, 'যতদিন না প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, কেলভিনের বিশ্বাস ভিত্তিহীন, ততদিন পর্যন্ত জীবনের উৎস সংক্রান্ত নানা মতবাদের উর্ধ্বে তাকে স্থান দিতে হবে।' কেলভিনের মতবাদ উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের। সে মতানুসারে দূর মহাকাশ থেকে জীবনকণা ভাসতে ভাসতে পৃথিবীতে এসেছিল। সেই এককোষী প্রাণের বীজ এমনই সর্বংসহ যে মহাকাশের চরম শৈত্যেও তার মৃত্যু ঘটে নি ; মহাজাগতিক রশ্মি তার কোনো ক্ষতি করে নি। এ-অনুমানের ভিত্তিতে বহু ফাঁক। উপরন্তু ওপারিনের তত্ত্বের সপক্ষে এখন বহু প্রমাণ। দানিকেনের তবুও আফশোষ, 'কেলভিনের এই দৃঢ়প্রত্যয়ের কথা ইদানীং আর শোন যায় না।'

দানিকেন সত্যি কী প্রমাণ করতে চান?

দানিকেন যা প্রমাণ করতে চান তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন অপ্রাসঙ্গিক কয়েকটি বিষয় তিনি টেনে এনেছেন। সেই বিষয়গুলি দেখলে এ-প্রশ্ন মনে আসবেই যে, আসলে দানিকেন কী প্রমাণ করতে বা বলতে চান?

দানিকেন হঠাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধি আর খাদ্যাভাবের জন্য ভাবিত হয়ে পড়েছেন। জনসংখ্যা বৃদ্ধি একটা সমস্যা। কিন্তু পৃথিবীতে দারিদ্র, ক্ষুধা, হাহাকারের কারণ তো জনসংখ্যা বৃদ্ধি নয়; সে কারণ সামাজিক, অর্থনৈতিক। অথচ দানিকেন হঠাৎ সাম্যবিরোধী বুর্জোয়াদের মতো সমাধান দিতে গেলেন, 'মাত্র একটি সমাধান এর আছে তাহলো এই মুহূর্ত থেকে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা।' দানিকেনের মতো মহাকাশ ছুটে বেড়ানো চিন্তাবিদ্‌ও বিজ্ঞানের বিরাট সম্ভাবনাটুকু চোখে না দেখে সমস্যাকে উল্টে দেখেছেন কেন? আপামর জনসাধারণের প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্য সংস্থানের পূর্ণ সম্ভাবনাময় যে-বিজ্ঞান মানুষের সামনে আলাদিনের দৈত্যের মতো শক্তি নিয়ে উপস্থিত, তাকে যে শোষণ-ভিত্তিক সমাজ বোতলের ছিপি দিয়ে বন্ধ করে রেখেছে তা দানিকেনের চোখে পড়ল না। দারিদ্রের পাশাপাশি বে-হিসেবী ঐশ্বর্যকে দানিকেন আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করতে পারলেন না। তিনি লক্ষ্য করলেন 'কোটি কোটি ক্ষুধার্ত মানুষকে মৃত্যুর দরজায় ঠেলে দেওয়ার থেকে নতুন করে জন্মদান না করা নিশ্চয়ই যুক্তিসম্মত।'

দানিকেন দেবতাকে খুঁজতে গিয়ে কি আসলে অন্য কিছুর সন্ধানে নেমে পড়েছেন? অন্য কোনো রাজনৈতিক লক্ষ্যে?

তার উদ্দেশ্যে যে নিছক প্রত্নতাত্ত্বিক সত্যানুসন্ধান নয়, কিছু চমক সৃষ্টিকরা, আর রহস্যজালের বিস্তারে বৈজ্ঞানিক স্বচ্ছতাকে বিভ্রান্তির মাঝখানে নিয়ে যাওয়া—তা বোঝা যায়। আর সেটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন তিনি অহেতুক মার্কস-লেনিনকে **'ধর্মগুরু'** হিসাবে আর মাও সে-তুঙ্-কে হিটলারের সমগোত্রীয় হিসাবে সংজ্ঞা দেন। ধর্মকে যারা আফিম বলে উপহাস করেছেন তাদেরকে ভবিষ্যৎ মানুষ ধর্মগুরু-হিসেবে খুঁজে পাবে, এমন বিভ্রান্তিকর চিন্তা কি দানিকেন-তত্ত্বের পক্ষে খুবই প্রয়োজন? আর মাও সে-তুং-এর প্রতি যুক্তিহীন বিষোদ্‌গার, তারই বা প্রয়োজন কি? এসব কিছুর অবতারণার প্রকৃত কারণ কি?

কারণটি এখন আর অজ্ঞাত নয়। সুস্থ চিন্তার ক্রমবিকাশশীল পথ যখন মানুষকে ক্রমশ বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী স্বচ্ছতায় পৌঁছে দিচ্ছে তখন বিজ্ঞানের নামে নতুন করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার লক্ষ্য ছাড়া দানিকেন-তত্ত্বের অন্য কোনো সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় না।

দানিকেনের পরিণাম

অনুমান, কল্পনানির্ভরতা আর মনগড়া ব্যাখ্যা নিয়ে যত চোখ ঝলসানো উক্তিই ছড়ানো যাক, পরিশেষে তা যে কোনো তত্ত্বের জন্ম দিতে পারে না দানিকেন রচিত সাতটি

গ্রন্থ তার প্রমাণ। এই গ্রন্থগুলিতে বৈজ্ঞানিক বিষয়কে অদ্ভুত দক্ষতায় ভাববাদী রহস্যময়তায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এর মধ্যে বিজ্ঞান হারিয়ে গেছে।

আবির্ভাব নামক গ্রন্থে দানিকেন জড়ো করেছেন শত শত মুখরোচক অলৌকিক কাহিনী। খ্রিস্টান-হিন্দু-বৌদ্ধ মুসলমান ধর্মের নানা কাহিনী। বিজ্ঞানের সেবায় ধর্ম না ধর্মের সেবায় বিজ্ঞানকে নিয়োগ করা হয়েছে তা এইসব উদাহণের বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায়। দানিকেনের ধারণা মানব মস্তিষ্কের কার্যকলাপের ওপর সুদূর কোনো গ্রহের উন্নত প্রাণীর দিব্য-দার্শনিক নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। তার নিজের কথায় 'আমার বিশ্বাস উপযুক্ত কাল উপস্থিত হলেই বহির্জাগতিক মানুষ পাঠিয়ে দেয় দিব্যদর্শনের স্পন্দন।' পণ্ডিত, মনীষী, বৈজ্ঞানিকেরা নাকি এমনি পাঠানো স্পন্দনের দ্বারাই পরিচালিত হন, নিজেদের কোনো মৌলিক ক্ষমতার দ্বারা নয়। দানিকেন সরাসরিই বলেছেন, বৈজ্ঞানিক নীলস্ বোর যে পারমাণবিক গঠনের তত্ত্বের আবিষ্কার করেন, তা কোনো মানুষী ব্যাপার নয়, আমার ধারণা নীল্স বোর স্বপ্ন পেয়েছিলেন বহির্জাগতিক প্রেরণা থেকে'। বলা বাহুল্য ঢাল তলোয়ার নিয়েও এই জাতীয় হাস্যকর ধারণার বিরুদ্ধে লড়াই-এ অবতীর্ণ হওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিক বিচার পাওয়ার মতো কোনো রকম সারবস্তুই এসব বক্তব্যের মধ্যে নেই।

দানিকেন বলছেন, 'সব শাস্ত্রই বলে আরম্ভের আগে তথা আদি বস্তুর উৎপত্তির আগে ছিল আত্মা (যার আরো ভালো নাম ঈশ্বর)। সেই আদি আত্মার পর জন্ম নিল কামনা, তার ইচ্ছে হলো বস্তুতে রূপান্তরিত হতে।' ঈশ্বর থেকে আত্মা। সেই ছকে বাঁধা ধর্মীয় কুহেলিকা। দানিকেন অবশ্য তার বিজ্ঞানসম্মত নাম দিয়েছেন, 'মোট কথায় তা হলে বস্তু হল উর্ধ্বপাতনে কেলাসিত আত্মা।' আবার বলেছেন, 'বস্তু যদি শক্তিরই একটা রূপ হয় তা হলে তা কেলাসিত আত্মাও বটে। অর্থাৎ আত্মাই শক্তি, শক্তিই আত্মা।' এমন তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কে কথা বলতে পারে। তবে দানিকেন তো বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে দাঁড়িয়ে বলছেন তাই একটু চেতনার পরিচয় দিয়েছেন এই বলে, 'একথা আজ আমাদের জ্ঞানের অতীত হলেও সত্য।' জ্ঞানের অতীত একথা যিনি বুঝতে পারলেন, তিনি সত্য বলে বুঝলেন কোন্ জ্ঞান দিয়ে? উত্তর কে দেবে? অন্তত বিজ্ঞান এর উত্তর দিতে অক্ষম। দানিকেনের যাত্রা এভাবেই রহস্যময়তায় এসে শেষ হতে বাধ্য।

এই অবাস্তব আধ্যাত্মিক বক্তব্যকে গ্রাহ্য করাতে হলে যে হতাশা আর অসহায়তার চিত্র তুলে ধরা দরকার, দানিকেন পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নিয়ে ঠিক তেমনিভাবেই পাঠককে ভাবিয়েছেন; আর পথ দেখিয়েছেন তার দেবতার উদ্দেশে অর্থ ও চিন্তা সাজাতে।

দানিকেন বলছেন, 'একদিন না একদিন সমস্ত কাঁচামালের উৎস শুকিয়ে যাবে, জীর্ণ হয়ে যাবে এ-গ্রহ। ...সব সূর্যই একদিন মরে যায়, পুড়ে শেষ হয়ে যায় লক্ষ লক্ষ বছর পরে।' এই অবস্থায় মানুষ কি করবে? মানুষকে তো বাঁচতে হবে? তাই বাঁচবার পথ তিনি দেখিয়েছেন, 'পৃথিবীর সব দেশের সব জাতের মানুষ যেদিন গ্রহান্তর গমনের এই জাতি-রাষ্ট্রসীমাতিক্রান্ত কাজকে সত্যিই সম্ভব করবে, সেদিন তার তুচ্ছ

জাগতিক সমস্যাসমূহকে ঝেড়ে ফেলে মহাজাগতিক রাষ্ট্রে খুঁজে নিতে পারবে তার নিজস্ব স্থানটি।' কি চমৎকার সমাধান! পৃথিবী জুড়ে বৈষম্য, শোষণ, ক্ষুধা, দারিদ্র এককথায় উড়ে গেল; ধর্মীয় বিরোধ, জাতি বিরোধ, ভাষা বিরোধ সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল একবাক্যে!

মানুষের বাঁচার লড়াই—শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের লড়াই-এর সামনে এই তত্ত্ব এনে ফেলবার সুচিন্তিত প্রয়াসের অর্থ কী, তা আর স্পষ্ট করে বলার অপেক্ষা রাখে না। মনে পড়ছে প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক থর হেয়ারডেলের কথা। তিনি বলেছিলেন, 'দানিকেন যখন তার তত্ত্ব প্রচার করতে শুরু করেন তখন আমরা ভেবেছিলাম বিজ্ঞান-গল্প হিসেবে এর একটা মনোরঞ্জক স্থান হতে পারে। তাই তত্ত্ব হিসাবে এর বিরুদ্ধতার প্রয়োজন বোধ করি নি। আজ দেখছি এটাকে তত্ত্বাকারে পাঠকদের প্রভাবিত করার বিপজ্জনক চেষ্টা হচ্ছে।'

দানিকেন মানবজাতির অতীতকে খুঁজতে গিয়ে ভবিষ্যত নিয়ে বড্ড বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। কারণ তার যারা পৃষ্ঠপোষক (ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার কৌশলী শাসকশ্রেণী) তারা চায় ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত করতে নিজ গোষ্ঠীর স্বার্থে। দানিকেন তার সাজানো অলীক বাগানে বিচরণ করতে, গিয়ে এই পরিণামকেই বেছে নিয়েছেন।

পৃথিবী ও মানবজাতির সুদূর ভবিষ্যৎ ভেবে আতঙ্কিত না হয়ে বর্তমানের সমস্যা সমাধানকে প্রাধান্য দেওয়াই বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিসম্মত। কেননা বর্তমানের ক্রিয়াকলাপের ওপর ভবিষ্যতের সৌধ রচিত হয়। দানিকেন এর বিরোধী, তাই দানিকেন-তত্ত্ব নিঃসন্দেহে বিজ্ঞান-বিরোধী; সমাজ-বিরোধী ও যুক্তি-বিরোধী চিন্তা।

সমীরণ মজুমদার

আগস্ট ১৯৮৯

রহস্য-নায়ক দানিকেনের কলা-কৌশল

ইস্টার দ্বীপের মূর্তি-বিস্ময়—মোয়াই স্ট্যাচু। প্রশান্ত মহাসাগরে বিচ্ছিন্ন খুদে দ্বীপ ইস্টারে এরকম দীর্ঘ আর প্রচণ্ড ভারী অত্যাশ্চর্য প্রস্তর ভাস্কর্য ছড়ানো রয়েছে বহু। দানিকেন বলতে চেয়েছিলেন এগুলি গ্রহান্তরের 'দেবতা'দের কীর্তি, কিন্তু তার সে ব্যাখ্যা আজ আর ধোপে টেঁকে না। থর হেয়ারডেলের গবেষণায় জানা গেছে, পলিনেশিয়ার আদিম উপজাতিদের বিপুল পরিশ্রম ও শিল্পবোধের ফসল এগুলি। এরকম ৭টি বিক্ষিপ্ত মূর্তিকে দাঁড় করানো হয়েছে ১৯৬০ সালে ইস্টার দ্বীপের 'আকিভি আহু'তে।

এরিক ফন দানিকেন কলকাতা ঘুরে গেলেন ১৯৮৪-র জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে। পৃথিবীর বাইরেকার অজানা গ্রহের অতি উন্নত 'মানুষে'রা এই পৃথিবী গ্রহে এসেছে বারবার এখানকার বন্য অনুন্নত মানুষদের থেকে বুদ্ধিশীল সভ্য আধুনিক মানুষ সৃষ্টি করেছে, এরাই ধর্মগ্রন্থ আর পুরাণগ্রন্থে 'দেবতা' নামে চিহ্নিত হয়েছে—এরকম সব চাঞ্চল্যকর কথাবার্তা বলে পৃথিবী জুড়ে হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছিলেন ১৯৬৮ সাল থেকে এই একটি নাম—দানিকেন। দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য রহস্যময় অদ্ভুত সব নিদর্শন সংগ্রহ করে দানিকেন চমকে দিয়েছেন বিশ্বের অগুণতি মানুষকে। *দেবতা কি গ্রহান্তরের মানুষ, নক্ষত্রলোকে প্রত্যাবর্তন, আবির্ভাব*—এরকম ১৩টি বই লিখেছেন তিনি যেগুলি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়ে মোট বিক্রি হয়েছে সাড়ে সাত কোটি কপি (লেখক নিজে তাই দাবি করেন)। কি বিপুল জনপ্রিয়তা... ভাবা যায় না।

গ্রহান্তরের ‘দেবতা’দের প্রবক্তা যেন নিজেই আধুনিক যুগের ‘অবতার’ হয়ে উঠেছিলেন। ৪ জুলাই ’৮৪ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেণ্টিনারি হল-এ বক্তৃতা শেষে এরিখ ফন দানিকেনের অ্যাম্বাসেডার যখন ভিড় কাটিয়ে গেট দিয়ে বেরিয়ে আসছিল তখন তার গোলাপী ফর্সা হাতের সামান্য স্পর্শ পাওয়ার জন্য গাড়ির সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলেন এক যুবক—জীবন বিপন্ন করেও দানিকেনের ছোঁয়া পাওয়ার আকুলতা তার চোখে-মুখে ফেটে বেরোচ্ছিল। ঠিক এরকমটাই দেখা যায় সাঁইবাবা, রজনীশ, বালক ব্রহ্মচারীর মতো ছোটো-বড় ‘অবতার’দের সভাতে।

তবে দানিকেনের এই অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তার স্রোত এখন আর অনায়াসে বয় না। গত এক দশকে দানিকেন প্রচারের সমান তালে গজিয়ে উঠেছে সংশয়, বিতর্ক আর বিরোধিতা পৃথিবীর অনেক দেশেই। এই দানিকেন বিরোধী স্রোতের সূত্রপাত কিন্তু ঘটেছে দানিকেনের নিজেরই ক্রিয়া-কলাপের অসঙ্গতি আর স্ববিরোধিতা থেকে। গ্রহান্তরের আগন্তুকদের কথা বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে অজস্র বিস্ময়কর নিদর্শন আর পুঁথিগত উদাহরণ তিনি হাজির করেছেন বটে কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই সরাসরি প্রমাণ রাখেন নি কখনো, নিজস্ব ‘তত্ত্বে’র সমর্থনে কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেন নি। এতে সাধারণ মানুষ কিছুকাল বিমোহিত রোমাঞ্চিত থাকতে পারে, ডিটেকটিভ কাহিনীর মতো রুদ্ধশ্বাসে ভিনগ্রহীদের কথা পড়তেও পারে, কিন্তু পর্যবেক্ষণ- পরীক্ষা-প্রমাণ ও বৈজ্ঞানিক সমর্থন ছাড়া কোনো প্রকল্প বেশিদিন ধোপে টিকতে পারে না। তাই ১৯৭০-এর পর থেকে দানিকেন প্রকল্পের ফাঁকি একে একে প্রকাশ হতে শুরু করেছে আর এই বিচক্ষণ সুকৌশলী মানুষটি একেকবার একেক কায়দায় উদাহরণ আর বাক্যবিন্যাসের কারুকার্যে জনপ্রিয়তা টিকিয়ে রাখবার চেষ্টা করে গেছেন।

দানিকেনের হাজির করা নিদর্শনের সংখ্যা বিস্তর। ১৯৫৪ সাল থেকে অদম্য উৎসাহ আর অফুরন্ত ‘ডলার’ নিয়ে (ইউরোপ-আমেরিকার ধনী দেশগুলির পৃষ্ঠপোষকতায় পাওয়া) উড়ে বেরিয়েছেন দেশে দেশে, পৌঁছে গেছেন দুর্গম প্রত্যন্ত সব জায়গায়। সেইসব মাল-মশলা দিয়ে ভরিয়েছেন ১৩টি বই (জার্মান ভাষায় লেখা)। কাজেই দানিকেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার সবকটি সংগৃহীত তথ্য আর বক্তব্য যাচাই করা দুরূহতম কাজ। কেউ তা করতেও যায় নি। তবে বিভিন্ন বিজ্ঞানী, গবেষক ও সৎ সাংবাদিকের প্রচেষ্টায় দানিকেনের রহস্য কিংবা ফাঁকিবাজি প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন সময়ে। তারই কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করছি আপাতত এই অল্প পরিসরে।

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে, চিলি উপকূলের আড়াই হাজার মাইল পশ্চিমে পলিনেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জে ইস্টার দ্বীপে পরিত্যক্ত নির্জন প্রান্তরে ইতস্তত ছড়ানো সুবিশাল পাথুরে মূর্তি আবিষ্কার করে দানিকেন কয়েক বছর ধরে দাবি করছিলেন ওগুলি গ্রহান্তরের ‘দেবতাদের ফেলে যাওয়া নিদর্শন, পৃথিবীর প্রাচীন মানুষের কম্ম নয় ওসব; বিস্তীর্ণ সাগর পাড়ি দিয়ে সে-যুগে কারুর ওখানে পৌঁছানোই তো অসম্ভব! নরওয়ের প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ থর হেয়ারডেল কনটিকি ভেলা, রা নৌকো আর আকু

আকু ট্রলার নিয়ে চিলি উপকূল থেকে উত্তাল সমুদ্রে দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়ে ইস্টার দ্বীপে হাজির হলেন; লাঠি-সোটা,অনুন্নত যন্ত্রপাতি, কায়িক শ্রম আর বুদ্ধি দিয়ে সেই বিশাল ভারী পাথরগুলো চমৎকার বিন্যাসে সাজিয়ে দানিকেনের প্রকল্পকে নস্যাৎ করলেন হাতে নাতে। এরপর দানিকেনকে আর ইস্টার দ্বীপের বড়াই করতে শোনা যায় না।

বীজ ও মহাবিশ্ব (Aussaat und Kosmos) বইতে দানিকেন দক্ষিণ আমেরিকার ইকোয়েডর আর পেরুর মাটির নিচে কয়েক-শ' মাইল বিস্তৃত বিষ্ময়কর গুহা আবিষ্কারের কথা লিখলেন যা মহাজাগতিক কাণ্ড ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। সাক্ষী হিসাবে নাম করলেন হুয়ান মরিস-এর, যে আর্জেন্টিনীয় প্রত্নবিদ ছিলেন ওই

„Er ist nie in den Höhlen gewesen"

SPIEGEL-Interview mit Juan Moricz über Erich von Däniken

বিখ্যাত জার্মান সাপ্তাহিক ডেয়ার স্পিগেল-এর ১৯ মার্চ' ৭৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল এক চাঞ্চল্যকর নিবন্ধ 'দানিকেনের ধাপ্পা'। সেই নিবন্ধে দানিকেন-এর কার্যকলাপের অন্যতম সাক্ষী জন মরিসের সঙ্গে স্পিগেল প্রতিনিধির এক সাক্ষাৎকার ছাপা হয় যেখানে মরিস পরিষ্কার বলেন যে দানিকেন কখনই গুহাতে (ইকোয়েডর-এর) যাননি।

গুহার মূল আবিষ্কর্তা। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, ১৯৭৩ সালে মরিস সাংবাদিকদের কাছে বললেন, 'দানিকেন কোনোকালে ওই গুহায় ঢোকে নি, সে মিথ্যাবাদী, এমনকি তার বইতে দেওয়া গুহার ছবিগুলোও ধাপ্পা।' [জার্মান সাপ্তাহিক *ডেয়ার স্পিগেল,* মার্চ ১৯৭৩] জানি না এরপর দানিকেনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছিলো কিনা।

দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর পার্বত্য শহর নাজকা। সেখানে বিরাট বিরাট জ্যামিতিক রেখা বিচিত্র বিন্যাসে আঁকা রয়েছে। ঠিকঠাক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না এদের উৎস সম্পর্কে। দানিকেন তার প্রথম বইতে দাবি করে বসলেন — এটি বহিরাগত নভশ্চরদের মহাকাশযান অবতরণের ক্ষেত্র, কয়েক সহস্র বছর আগেকার সৃষ্টি এগুলি (প্রসঙ্গত বলা দরকার দানিকেনের বিশ্বাস ওই 'দেবতা'রা শেষবার পৃথিবীতে এসেছিল

„Ich sehe das Zukünftige"

Däniken über außersinnlich-

SPIEGEL ... wie ... ken. ... -onauten gela...

VO... ...NIKEN: Auf jeden Fall hat Phantasie damit zu tun.

SPIEGEL: Hängt das auch mit jenem privaten Erkenntnis-Vorgang zusammen, den Sie ESP oder „Espern" genannt haben? Was heißt das eigentlich: ESP?

...stronauten auf der Erde geschaffen?

VON DÄNIKEN: Anfangs war ich unsicher. Es war ja sehr ungewöhnlich, was ich da erlebt hatte, aber, bitte, ich möchte darüber nicht sprechen.

SPIEGEL: Aber Sie selbst haben ja darüber geschrieben.

VON DÄNIKEN: Der Econ-Verlag hat Teile aus meinem Tage-

খিস্টপূর্ব ৩১১৪ সালে)। পুরাতত্ত্ববিদ আর ভূতাত্ত্বিকরা দানিকেনের বক্তব্যকে পুরোপুরি বাতিল করে প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় উদ্ধার করলেন, ওই ভূচিত্রগুলির বয়স ১৫০০ বছরের বেশি নয় (৫ হাজার বছরের প্রশ্নই আসে না) এবং ওগুলি নাজকা অধিবাসীদেরই আঁকা [*The World's Last Mysteries*, R.D. Publication, ১৯৭৭]। ফাঁপরে পড়লেন দানিকেন। বৈজ্ঞানিক তথ্য-প্রমাণের বিপরীতে তার অনুমান বা অন্ধবিশ্বাস তো আর জেদী ষাঁড়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, তাই বুদ্ধিমানের মতো তিনি তার বইটির (*Chariots of the Gods? দেবতা কি গ্রহান্তরের মানুষ?*) আধুনিক সংস্করণগুলিতে নাজকার বিমান-অবতরণ ক্ষেত্রের প্রকল্পটি বাদ দিয়েছেন [*The Telegraph*, ৮.৭.৮৪]।

বহু ক্ষেত্রেই আবার দানিকেন সুযোগ বুঝে বিজ্ঞানীদের ওপর একহাত নিচ্ছেন। বিজ্ঞান কখনোই শেষ কথা বলে না, প্রমাণিত না হলে কোনো রহস্যকেই বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য কোনোটাই করা যায় না। আজ যা জানা যায় নি বিজ্ঞানের দৌলতে কাল তা জানা যাবে— এটাই নিয়ম। ইতিহাস এভাবেই এগোচ্ছে। কিন্তু এরিক ফন দানিকেনের মতো ধুরন্ধর লোকেরা বিজ্ঞানের স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতার

সুযোগ নিয়ে চমক আর ধূম্রজাল বাড়িয়ে তোলেন। ... অষ্টাদশ শতাব্দীর তুর্কী অ্যাডমিরাল পীরি রইসের ম্যাপ উদ্ধার করে দানিকেন দেখালেন, সেখানে মেরু প্রদেশের যে পর্বতমালার উল্লেখ রয়েছে তা ১৯৫২ সালের আগে আবিষ্কার হয় নি। কি করে হয়? মানচিত্র বিশেষজ্ঞরা এ নিয়ে মাথা ঘামান নি ; দানিকেন বললেন— এ হলো মহাকাশ থেকে তোলা প্রাচীন পৃথিবীর মানচিত্র যার নকলের নকল এসেছিল পীরি রইসের হাতে। প্রমাণ নেই, দানিকেনের এর প্রকল্প।... মধ্য আফ্রিকার প্রত্যন্ত প্রদেশের অতি পরিচিত 'ডোংরা' উপজাতিদের এক চমৎকার লোক-উৎসবের বিবরণ দিয়ে দানিকেন সিদ্ধান্ত করলেন—তাদের ওই অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি বিচার করলে বোঝা যায়, আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের যুগ্ম-তারা (Bianary Star)আর শ্বেত বামন (White Dwarf,Sirius B)-এর কথা তাদের পুর্বপুরুষদের জানা ছিল। কে জানিয়েছিল? নিশ্চয়ই সেই ভিনগ্রহী 'দেবতা'রা! আবারো সেই প্রমাণ-বিহীন প্রকল্প, দানিকেনের নিজস্ব স্টাইলে ঘোষিত। মধ্য আফ্রিকার সেই দুর্গম আদিবাসী অঞ্চলে অন্য কোনো পর্যবেক্ষক গিয়ে পৌঁছেছেন বলে শোনা যায় নি, তাই দানিকেনের পোয়াবারো।

বিভিন্ন জায়গার অপঠিত প্রাচীন লিপি সংগ্রহ করেছেন দানিকেন—উজবেকিস্তানের ফরগণা, পলিনেশিয়ার ইস্টার দ্বীপ, ইকোয়েডর, কুয়েঙ্কা. মেক্সিকো ইত্যাদি অনেক জায়গার। যা পড়া যাচ্ছে না, যা অচীনপুরীর গন্ধ মাখানো রহস্য নিয়ে বসে আছে এখনো, তাই দানিকেনের তুরুপের তাস। তিনি আপাত-বিশ্বাসযোগ্য সম্ভাবনার রঙ লাগিয়ে বহির্জাগতিক যোগসূত্র ঘোষণা করে দেন সহজেই। রাখালদস বন্দ্যোপাধ্যায়ের হরপ্পা মহেঞ্জোদারোর রোমাঞ্চকর আবিষ্কারের কথা কে-না জানে। সেখানে অনেক লিপি আজও অপঠিত রয়ে গেছে, গবেষণা করছেন অনেকেই, কিন্তু দানিকেনের মতো লাফ দিয়ে গ্রহান্তরের দিকে ছুঁড়ে দেন নি কোনো গবেষক।... বছর কয়েক আগে আমরা দল বেঁধে বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ে গিয়েছিলাম বেড়াতে। পাহাড়ের পেছন দিকে জল-জঙ্গল চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এক-শ' সোয়া শ-ফুট ওপরে উঠে একটি গুহায় কিছু লিপি আমরা দেখতে পাই। রীতিমতো রোমাঞ্চকর! আমরা কেউ জানি না কোন্ ভাষার লিপি ওটা। দানিকেন-পদ্ধতিতে সহজেই সেখানে গ্রহান্তরের দেবতারা এসে যেতে পারতেন আমাদের ব্যাখায়, কিন্তু পরে আমরা জেনেছিলাম ওটি ব্রাহ্মী লিপি। এই জানাটা হলো বলেই কোনো কষ্টকল্পিত প্রকল্পে আমাদের বুদ্ধিভ্রম বা জ্ঞানের বিকৃতি ঘটতে পারল না। দানিকেন কিন্তু অজ্ঞাত তথ্য থেকে বিজ্ঞান-বিকৃতি ঘটিয়েছেন বারবার।

রামায়ণে পুষ্পক রথের কথা আছে, সুমেরীয় গিলগামেশের মহাকাব্যে আকাশ ভ্রমণের কথা আছে, বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে ইজেকিয়েল-এর আকাশযান অবতরণের নিপুণ বিবরণ আছে। এগুলি যে কেবল কল্পনা নির্ভর পৌরাণিক কাহিনী হওয়া আদৌ অসম্ভব নয়, বরং খুবই স্বাভাবিক, তা দানিকেন শুনতে চান না। (জুলে ভার্নে, এইচ জি ওয়েল্স, আসিমভ-এর কল্প গল্প কি দানিকেনের খেয়াল থাকে

না? নাকি সচেতনভাবেই এড়িয়ে যান?) তিনি পুরাণের ওই আকাশচারণের গল্পের সঙ্গে তার আধুনিক 'দেবতা'দের সংযোগ খুঁজে পান। অথচ বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ইতিহাসে আমরা দেখি পর্যায়ক্রমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ১৯৩০ সালে রাইট ব্রাদার্সের এরোপ্লেন প্রথম আকাশ জয় করে এবং ১৯২৬ সালে গডার্ড উদ্ভাবন করেন রকেট-এর। দানিকেন এগুলি মানেন না।

উপরন্তু তিনি পদার্থবিজ্ঞানের নবতম আবিষ্কার 'ট্যাকিয়েন' কণার উল্লেখ করে নতুন চমক এনে দেন। আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুযায়ী কোনো বস্তু আলোর গতিবেগের বেশি জোরে কখনোই ছুটতে পারবে না। এদিকে 'ট্যাকিয়েন' নামে একটি কণার অস্তিত্ব আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানীরা অঙ্ক কষে বের করেছেন। এখনো যা অঙ্কের স্তরে, যার বাস্তব রূপ সম্পর্কে কারুরই কোনো ধারণা নেই, তাকে দানিকেন লুফে নিলেন। তার প্রকল্প অনুযায়ী আগামী যুগে ট্যাকিয়েন কণা-চালিত যান তৈরি হবে যাতে করে ভ্রমণ করলে অতি অল্প সময়ে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ছুটে বেড়ানো যাবে ; পৃথিবীতে অতীতের অতিথি সেই 'দেবতা'রা সেরকম কোনো যানেই বোধহয় এসেছিল। বিজ্ঞানীরা না-ই মানুন, দানিকেনের তাই বক্তব্য।

কিন্তু কি করে দানিকেন এত আত্মবিশ্বাস পাচ্ছেন? এই 'দেবতা' প্রকল্পের ধারণা তার মাথায় এলো কি করে? কি করেই বা এত জোরের সাথে 'দেবতা'দের ভবিষ্যত আগমনের কথা তিনি বলেন? এ প্রশ্নগুলি সরাসরি করা হয়েছে দানিকেনকে। যার তহবিলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রমাণের দৌলত নেই, বিজ্ঞানীদের সমর্থন নেই, তার পক্ষে এ প্রশ্নের কী উত্তর দেওয়া সম্ভব? ১৯৭৩ এর মার্চ মাসে জার্মান সাপ্তাহিক *ডেয়ার স্পিগেল*-এর সাংবাদিককে দানিকেন সরাসরি বলেছিলেন—'আমি ভবিষ্যতের চিত্র দেখতে পাই।' অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী তিনি। *স্পিগেল* এর ১৯ মার্চ-১৯৭৩ সংখ্যায় সে-সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। এখানে তার বেশির ভাগ অংশ তুলে দেওয়া গেল [মুল জার্মান থেকে অনুবাদ করেছেন সুব্রতনারায়ণ চৌধুরী]

সা: মহাকাশচারীদের সম্বন্ধে এইসব কথা আপনি জানলেন কীভাবে?

দা: এ-ব্যাপারে ফ্যানটাসির সাহায্য আমাকে নিতেই হয়েছে।

সা: এ-বিষয়ে আপনার বিশেষ ব্যাক্তিগত জ্ঞানের কথা আপনি বলেছেন। ESP বা "Espern" এর কথাও আপনি বলেছেন। এর প্রকৃত অর্থটা ব্যাখ্যা করবেন?

দা: ওটা অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির অবস্থা। তবে ওটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার এ বিষয়ে আমি বেশি কথা বলতে চাই না।

সা: আচ্ছা, আপনি কি বলবেন আপনার প্রথম ESP জ্ঞান (Extra Sensory Perception =অতি ইন্দ্রিয় অনুভুতি) কখন কোথায় হয়েছিল?

দা: বলতে গেলে ১৮ বছর আগে, তখন ফ্রিবোর্গ-এ আমি স্কুলে পড়তাম।

সা: তাহলে সেই কৈশোরের অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধি আপনার মধ্যে স্থায়ী ধারণার

সৃষ্টি করেছিল যে অজানা মহাকাশচারীরা আমাদের পৃথিবীতে এসেছিল?

দা: হ্যাঁ, ঠিকই। তবে প্রথম আমি সঠিক জানতাম না।... কিন্তু মাফ করবেন, এ-বিষয়ে আমি কথা বলতে চাই না।

সা: কিন্তু আপনি নিজেই তো ও ব্যাপারে লিখেছেন।

দা: হ্যাঁ, ভিয়েনায় জেলে থাকবার সময় আমি ডাইরিতে লিখেছিলাম বটে, *Econ-Verlag* তার কিছু অংশ প্রকাশও করেছিল। ... আমার মৃত্যু কিভাবে হয় আমি জানি। আমার প্রথম বই প্রকাশিত হবার অনেক আগেই আমি জানতাম কত কপি বিক্রি হবে।

সা: তাহলে বলা যায় ESP আপনার জ্ঞানের সত্যিকারের উৎস?

দা: এমন এক উৎস যা আমার মধ্যে প্রকৃত ধারণা ও বিশ্বাসের সৃষ্টি করেছে। এখন আমি পুর্ণ বিশ্বাসে জানি যে, গ্রহান্তরের মহাকাশচারীরা এসেছিল।

সা: ...আপনার ESP অভিজ্ঞতার কথা আরেকটু পরিষ্কার করে বলবেন?

দা: এটা আসলে এক ধরনের 'সময় পাড়ি' দেওয়া। এর দৌলতে আমি বর্তমান কালের বাইরে চলে যাই, গিয়ে সব একসঙ্গে দেখতে পাই। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত। এবং তখনই আমি বক্তব্য পেশ করি।...

অবস্থা এই। একজন অভিনব প্রকল্পের প্রবক্তা বিজ্ঞানের কথা বলেন, বিজ্ঞানীদের চ্যালেঞ্জ জানাতে নবতম বৈজ্ঞানিক তথ্যের উল্লেখ করেন, তিনিই আবার অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার দাবিদার হয়ে গ্রহান্তরের আগন্তুকদের এজেন্সি নিয়ে বসেন। এরকম এক গোলমেলে চরিত্র নিয়ে আরো বিভ্রান্ত হয়ে যায় সাধারণ মানুষ যখন তাকে নানাবিধ খেতাবে ভূষিত করা হয়, 'ডক্টরেট' উপাধিতে সম্মানিত করা হয়। 'বিজ্ঞানী' পরিচয়ে চিহ্নিত করা হয়, বড় বিচিত্র ব্যাপার। ১৯৭৫ সালে দানিকেন যখন প্রথম বার কলকাতায় এসেছিলেন তখন এই ধুরন্ধর ব্যক্তিটিকে নিয়ে একেবারে গবেষণা সংস্থা তৈরি হয়ে গেল (দানিকেন রিসার্চ ইনস্টিটিউট,১৯৭৫)। একজন পদার্থ বিজ্ঞানীকেও দেখা গেল সংস্থার সভ্যপদে, আর তার অখ্যাত সভ্যেরা দানিকেনের আর্ন্তজাতিক ইমেজ'কে সামনে রেখে লম্ফঝম্ফ দিয়ে 'প্রখ্যাত' হওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। ১৯৮৪-র ৪-জুলাই যে দানিকেন-সভা হলো তার ব্যবস্থাপনায় ছিল এই সোসাইটি। বিজ্ঞান-বিরোধী গালগল্পের প্রবক্তা দানিকেনের বক্তৃতার আয়োজন করা হলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো মর্যাদাসম্পন্ন এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতর। সভাপতিত্ব করলেন সহ-উপাচার্য। বড় পরিতাপ হয়, ভয়ও হয় এই ভন্ড ক্রিয়াকান্ডের অবাধ অনুষ্ঠান দেখে।

তবে দানিকেনের কৌশল আর অভিসন্ধিকে অনুধাবন করা বেজায় মুশকিল। ১৯৭৩ সালে দানিকেন নিজেকে অতীন্দ্রিয়বাদী বলে যে 'কাঁচা' কাজ করেছিলেন এখন সে ভুল তিনি আর করেন না। বিজ্ঞানের মুখোশটাকে লাগসই করে সাজিয়ে তুলতে এখন তিনি বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে সমঝোতার 'লাইন' ধরেছেন। কলকাতার

সভা-সমিতিতে বারবার তাকে বলতে শোনা গেছে —'আমার বক্তব্যগুলিকে আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলছি না, এগুলি হাইপথেসিস (প্রকল্প)। উপযুক্ত প্রমাণ অবশ্যই দরকার। আমি প্রকল্পগুলি হাজির করছি। যোগ্য গবেষকরা তথ্য প্রমাণ দিয়ে একাজের সম্পূর্ণতা দেবে' [৪ জুলাই ১৯৮৪,কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টিনারি হল-এ ভাষণ]

দানিকের এই নরম সুর, এই পরিণত যৌক্তিক বক্তব্য আগে শোনা যায় নি। হয়তো চর্তুদিক থেকে বৈজ্ঞানিক বিরোধিতা দেখে, জনগণের দানিকেন-উন্মাদনায় কিছু ভাটার টান দেখে তিনি তার কৌশল বদল করেছেন। কথাটা সন্দেহবাতিকগ্রস্ত গোঁড়া সমালোচকের মতো শোনালেও অযৌক্তিক কিন্তু নয়। দানিকেন তার বর্হিজগতের .'দেবতা' আগমনের কথাবার্তা স্রেফ অনুমান বা হাইপথেসিস স্বীকার করেও কেন তা বিশ্বজুড়ে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন? কেবল তথ্য আর নিদর্শন তুলে ধরে ছেড়ে দিলেই তো পারতেন। 'তত্ত্ব' হিসেবে অসম্পূর্ণ, প্রমাণ সাপেক্ষ বলেও আবার তাই দিয়ে প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সত্যগুলির বিরোধিতা কেন করেছেন? এ-রকম অবৈজ্ঞানিক কাজকর্মগুলোই তো ক্ষতিকারক,সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক যুক্তি-সম্মত চিন্তাধারায় ঘোঁট পাকিয়ে দেয়।...এই প্রকৃতি, মানব সমাজ ও জীবন ঘিরে অজস্র অজ্ঞাত বিষয় আশ্চর্য উদাহরণ থাকবেই, বিজ্ঞানের বিকাশ ও জ্ঞানের উন্মেষের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে সে-সব রহস্য উন্মোচন হবে, সংকট মোচন হবে, বাস্তব দুনিয়ার ওপর ব্যাপক মানুষের স্বাভাবিক কর্তৃত্ব আরো সঠিক ও সুন্দর হবে। এই প্রগতিই তো স্বাভাবিক। কিন্তু মাঝখান থেকে নিয়তি-অদৃষ্ট ভবিষত্যের মতো অজ্ঞাত অপ্রমাণিত বহির্জগতের 'আধুনিক দেবতা'দের কাজ-কারবারের কথা, তাদের রহস্যময় দূর নিয়ন্ত্রণের কথা যদি ব্যাপকভাবে মানুষের মনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেটা কি ক্ষতিকারক কাজ হবে না? মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি ও জীবনবোধকে ক্ষতিগ্রস্ত বিভ্রান্ত করার অপরাধে সেই ব্যক্তি, তার সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষকরা কি সামাজিক অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হবে না?

দানিকেনের কর্মকান্ড আর বক্তব্যে অসঙ্গতি, সুযোগমাফিক চমক রচনা করার কৌশল বারবার তার দুরভিসন্ধিকে প্রকাশ করে দিয়েছে। বিজ্ঞানের ক্ষীর মাখানো অবিজ্ঞানের চমক দিয়ে মোহ সৃষ্টিতে দানিকেনের জুড়ি নেই। সেই পুরোনো কায়দা এবারেও তিনি ছেড়ে গেছেন কলকাতায় এসে।

আমাদের সৌরমণ্ডলে ন-টি গ্রহের মধ্যে বৃহস্পতি আর মঙ্গলের মাঝখানে রয়েছে গ্রহাণুপুঞ্জ (asteroids)—অজস্র ছোটো বড় গ্রহাণুর দঙ্গল। জ্যোতির্পদার্থ বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন মহাজাগতিক গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টির সময় এই গ্রহাণুপুঞ্জ সৃষ্টি হয়েছিল নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মে। দানিকেন কিন্তু এসব ব্যাখ্যার মধ্যে না গিয়ে চমকপ্রদ এক প্রকল্প হাজির করলেন। তিনি বললেন—কোথাও কিছু নেই হঠাৎ মঙ্গল আর বৃহস্পতির মধ্যে গ্রহাণুপুঞ্জ থাকবে কেন? আসলে ওখানে একটা গোটা গ্রহ ছিল। সূর্যের দশটা গ্রহ ছিল মোটমাট—ন-টা নয়। এই দশম গ্রহটিতে লক্ষ কোটি বছর

আগে এসেছিল সেই গ্রহান্তরের 'উন্নত' প্রাণীরা, বসবাস করেছিল। কোনো কারণে গ্রহটি বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ে গ্রহাণুপুঞ্জে পরিণত হয়। [*বীজ ও মহাবিশ্ব*, পৃ: ১৫৮]

কোথা থেকে জানলেন এসব দানিকেন? কোনো প্রমাণ আছে, নাকি কল্পনার রঙে রাঙানো আর এক প্রকল্প এটি?

দা: প্রমাণ তো সহজে মেলে না, সময় লাগে, প্রয়াস লাগে। একদিন ঠিকই প্রমাণিত হবে আমার বক্তব্যের যথার্থতা। আমার কাছে খবর আছে খোদ আমেরিকা আর রাশিয়ার মহাকাশযান ওই গ্রহাণুপুঞ্জের মধ্যে কিছু অদ্ভুত নভোযানের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেয়েছে। ওগুলোই সেই ভিনগ্রহীদের অস্তিত্বের প্রমাণ দেবে।

—কিন্তু এটা তো গোপন খবর, কেউ জানে না। আপনি উপযুক্ত নথিপত্র সবার সামনে প্রকাশ করছেন না কেন?

দা: ধৈর্য্য ধরুন। আমার পরবর্তী বইটির জন্য অপেক্ষা করুন।

[*The Telegraph* , ৮-জুলাই ১৯৮৪]

সেই কায়দা। বাজার মাতানো গোয়েন্দা কাহিনীর নায়কের মতো দানিকেন বিভ্রমের ধোঁয়া সৃষ্টি করেন। কিন্তু সত্যিই কি সাধারণ মানুষকে এভাবে বেশিদিন ঠকিয়ে রাকা যায়।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

অগাস্ট ১৯৮৪

মহেশ যোগীর উড়ন্ত যোগ ও বিশ্বশান্তি

পৃথিবীর মাত্র ৭,০০০ মানুষ যদি মহেশ যোগীর নির্দেশিত তুরীয় ধ্যান (Transcendental Meditation বা TM)-এর মাধ্যমে সিদ্ধি লাভ করে (TM Sidhi) তবে পৃথিবীতে শান্তি আসবে, সমস্ত যুদ্ধ হিংসা-দ্বেষ এমনকি দুর্ঘটনাও বন্ধ হয়ে যাবে। আর এই সিদ্ধিলাভ করতে পারলে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে কাটিয়ে উঠে শূন্যে ভাসা বা ওড়া সম্ভব (Yogic flying)। মহেশ যোগীর শিষ্য, কানাডার ব্রে ওয়াটসন এভাবেই ব্যাপারটা রেখেছিলেন সাংবাদিকদের কাছে। সিদ্ধিপ্রাপ্ত উড়ন্ত যোগীদের মস্তিষ্ক থেকে যে মানসিক-শক্তি তরঙ্গের আকারে বেরোয় তা অবশিষ্ট জনগণের মস্তিষ্কে ক্রিয়া করে এবং তাদেরও মানসিক পরিবর্তন ঘটিয়ে হিংসা-দ্বেষ-দুর্ঘটনার প্রবণতা দূর করে। আমেরিকার ১০টি শহরে নাকি তুরীয় ধ্যানের মাধ্যমে খুন-রাহাজানি দুর্ঘটনা কমানো গেছিল।

মহেশ যোগী ও তার দলবলের প্রধান আস্তানা আমেরিকায়। ১৯৮৬-এর জুলাই মাসে তারা এসেছিলেন ভারতের রাজধানী নতুন দিল্লীতে। ২১ জুলাই '৮৬ দিল্লীর ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়ামে ব্যাপারটা হাতে নাতে দেখানোর ব্যবস্থাও করেছিলেন তারা। কয়েকদিন থেকেই দিল্লীর প্রায় সব ক-টি দৈনিকে পুরো পৃষ্ঠায় বিশাল বিজ্ঞাপন বেরোচ্ছিল এ-নিয়ে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক শ্রীজগদ্‌গুরু শংকরাচার্য ও বিশ্বশান্তির এই অভিনব পথের আবিষ্কর্তা মহাঋষি মহেশ যোগীর ছবিসহ এই বিশাল বিজ্ঞাপনে বহু কিছুই বলা হয়েছিল। উড়ন্ত অবস্থায় মস্তিষ্কের তড়িৎ পরিবর্তন (EEG changes) ইত্যাদির ছবি দিয়ে বিস্তারিতভাবে বোঝানো হয়েছিল কিভাবে পতঞ্জলির নির্দেশিত বৈদিক জ্ঞানের সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের মিলন ঘটিয়ে শূন্যে ভাসা ও বিশ্বশান্তি আনা সম্ভব। তুরীয় ধ্যানের মাধ্যমে সিদ্ধিলাভের প্রক্রিয়ার একটি স্তরে যে মুহূর্তে মস্তিষ্ক তরঙ্গের সর্বাধিক সুসঙ্গতি আসে ('at the moment of maximum coherence of brain wave activity') তখন শরীর আপনা থেকে ভেসে ওঠে এবং লাফাতে শুরু করে—এটি শূন্যে উড়ে যাওয়ার প্রাথমিক পদক্ষেপ। এই সময় বস্তু ও চেতনা সম্পূর্ণ এক হয়ে যায়, প্রকৃতির সব নিয়ম একত্রে মিলে যায় ইত্যাদি ইত্যাদি। এইভাবে বহু রহস্যময়, বিচিত্র তত্ত্বের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে শূন্যে ওড়ার তথা বিশ্বশান্তি আনার 'বৈজ্ঞানিক ভিত্তি'।

গত ২১ জুলাই '৮৬ এসবই দেখানোর কথা ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়ামে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই স্টেডিয়াম ভর্তি হয়ে যায়। এবং যথা সময়ে শুরু হয় মহেশ যোগীর শিষ্যদের শূন্যে ভাসা।

কিন্তু হায়! কোথায় শূন্যে ভাসা। ১৫ থেকে ৩০ সেকেণ্ড ধ্যানের মতো করার

পর ঐ যোগীরা ফোমের ম্যাট্রেসে হাতে চাপ দিয়ে লাফাতে শুরু করলেন। সবাই অবশ্য ছিলেন পদ্মাসনে, ঐ অবস্থায় হাতের চাপে লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠা নিঃসন্দেহে কষ্টকর একটি ব্যায়াম। কিন্তু তাকে আর যাই হোক শূন্যে ভাসা বা তার প্রাথমিক স্তরও বলা যায় না। দাবি করা হয়েছিল, এ সময় মস্তিষ্কের তড়িৎক্রিয়া গভীর নিদ্রমগ্ন মানুষের মতো হয় এবং বস্তু ও চেতনা একাকার হয়ে মনের বিক্ষিপ্ত ভাব দূর হয়ে যায়। কিন্তু বাস্তবে একাধিকবার একাধিকজনকে দেখা গেল নাকের মাছি তাড়াতে। গরমে মাছিরা বেশ উত্যক্ত করছিল। ফলে মাঝেমাঝেই 'চেতনালুপ্ত হওয়া উড়ন্ত যোগী'দের লাফানো বন্ধ করে নাক ঘষতে হয়েছে। ধ্যানের সুবিধের জন্য দর্শকদের নিস্তব্ধ থাকতে বলা হয়েছিল। কিন্তু শেষের দিকে অনেকেই অট্টহাসি চেপে রাখতে পারেন নি। গম্ভীরভাবে ধ্যান করার পরও যখন বেশ কয়েকজন যোগী উড়ন্ত লম্ফন ('flying high jump') দেওয়ার জন্য বেশ কষ্ট পাচ্ছিল আর মুখ দিয়ে 'উঃ আঃ' আওয়াজ করছিল তখনি শুরু হয়েছিল চাপা হাসি। শেষে তা অট্টহাস্যে পরিণত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক জ্যোতির্মঠের শ্রী জগদ্‌গুরু শংকরাচার্য অবশ্য এই চপল দর্শকদের শান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। পাশে পর্দার আড়ালে মহিলারাও (যোগিনী) এ ধরনের কাজকর্ম করছিলেন; সেখানে কোনো পুরুষের প্রবেশ অধিকার ছিল না। আর ছিল কিছু ছেলে। এদের ২০ জনও ওইভাবে ওড়াউড়ির কায়দা দেখাচ্ছিল। কিন্তু এরা সবাই ৫০ মিটার দূরত্ব 'লাফানোর' (ওড়বার) শেষের দিকে বেদম হয়ে যায়। মহেশ যোগীর তত্ত্ব অনুযায়ী এটি হওয়ার কথা নয়। ('they are not supposed to, says the theory')।

বিশ্বশান্তি আনার জন্য সিদ্ধিলাভ ও শূন্যে ওড়ার ব্যাপারটা এভাবেই একটি হাস্যকর লোকঠকানো প্রক্রিয়ায় পর্যবসিত হয়। ২১ জুলাই, অনুষ্ঠানের আগে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল উড়ন্ত যোগীদের ছবি। এ-ছবি মহেশ যোগীর শিষ্যদের অ্যালবাম থেকে পাওয়া। ছবিতে দেখা যায় প্যান্টশার্ট পরা দু-জন শূন্যে ভাসছে পদ্মাসনে বসে। কিন্তু আসলে এটি ছবি তোলার কায়দা। লাফিয়ে শূন্যে ওঠার মুহূর্তে তোলা ছবি। ২১জুলাই-এর পরে দিল্লীর সংবাদপত্রে যে-সব ছবি বেরোয় তাতে দেখা যায়, মহেশ যোগীর শিষ্য তথাকথিত ঐ যোগীরা কিভাবে নিচে মাটিতে হাত দিয়ে চাপ দিচ্ছে।

মহেশ যোগীর মতো ধান্দাবাজ লোকেরা এভাবে কিছু শিষ্য-শিষ্যা জড়ো করে মিথ্যে কথা বলে লোক ঠকিয়ে চলেছে। দিল্লীতে ব্যাপারটি দর্শকদের হাসির কারণ হলেও তা বন্ধ হবে না। অন্য জায়গায় এবং বিশালতর বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে চলবে এভাবে নিত্যনতুন কায়দায় অলৌকিকত্বের ব্যবসা।

তবে নিছক অলৌকিকত্বের ব্যবসা নয়, ব্যাপারটির মধ্যে গভীরতর ষড়যন্ত্র যে রয়েছে তা বিশ্বশান্তির বুলি আওড়ানোর মধ্যে দিয়ে পরিষ্কার হয়। জাগ্রত বা ঘুমন্ত, ধ্যানমগ্ন বা কর্মচঞ্চল—কোনো অবস্থাতেই কোনো মানুষের বা প্রাণীর মস্তিষ্ক থেকে কোনো শক্তি বা তরঙ্গ যে বেরোয় না তা বৈজ্ঞানিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাই এর

সাহায্যে অন্যের ওপর কোনোভাবে কোনো প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব নয়। তবু তৃতীয় ধ্যান ইত্যাদির মাধ্যমে যুদ্ধ-হিংসা বন্ধ করার অপতত্ত্ব প্রচার করার মূল উদ্দেশ্য একটিই—যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন ও সংগঠিত গণ-বিক্ষোভকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করা। যুদ্ধের বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রাম করে নয়, পৃথিবীর মাত্র ৭, ০০০ মানুষকে নিষ্ক্রিয় ধ্যানের জন্য উৎসাহিত করে বিশ্বশান্তি আনার হাস্যকর আধ্যাত্মিক দাবির আসল উদ্দেশ্য এটিই। তাই হয়তো মহেশ যোগীর মতো মানুষের মূল আস্তানা আর কোটি কোটি টাকার সম্পদের মূল উৎস তৃতীয় বিশ্বের কোনো দেশ নয়, বরং আমেরিকার মতো এক ধনী দেশ।

সাহায্যকারী সূত্র :

1. *The Statesman* (Delhi edition). 19. 7. 86.
2. *The Times of India; Indian Express; The Statesman* (Delhi) 22. 7. 86 -সংস্করণ।

ভবানী প্রসাদ সাহু

অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৮৬

দৈব আদেশ ও অলৌকিক চিকিৎসা

উত্তর চব্বিশ পরগণার বারাসাতের কাছে কামদেবপুরের 'অলৌকিক চিকিৎসক'-এর কথা অনেকেই জানেন। নানা সূত্রে এই 'দৈব' চিকিৎসকের নাম ছড়িয়েছে অনেক। নিরাময়ের পদ্ধতিটা চমকপ্রদ। গোরাচাঁদ পীরের সমাধি-মন্দিরের কবর ঘরে 'বাবা' বসেন। ঘর বন্ধ থাকে। বাইরে 'বাবা'র লোকেদের কাছে টিকিট কেটে নাম-ধাম-বয়স বলে কবর ঘরের লাগোয়া ঘরে বন্ধ দরজার সামনে বসলে বাবা ঘরের ভেতর থেকে একে একে আগন্তুকের কষ্ট, ব্যাধি, সমস্যা বলে দেন এবং তারপর অসুখ নিরাময়ের দাওয়াই। লাইন দিয়ে দর্শনার্থী আসে দূর দূরান্ত থেকে। কেন আসে, কিসের টানে? এ-বিষয়ে কিছু পর্যালোচনা করা হয়েছে *উৎস মানুষ* পত্রিকাতেই, জানুয়ারি ১৯৮৪ সংখ্যায়।

আগন্তুক রোগীর কষ্ট লাঘব করতে 'বিশ্বাসে নিরাময়ে'র তত্ত্বটি অনেকেই মানেন। অমোঘ বিশ্বাসে, অন্ধ নির্ভরতায় পঙ্গুকেও গিরি লঙ্ঘাতে দেখা যায়। গত বছর শীতে সাগরমেলার সময় কাকদ্বীপের ঝুপড়িতে যে নব্বুই বছরের বৃদ্ধাকে নিজে নিজে লঞ্চে উঠতে দেখলাম তার ছেলে (দেহাতী স্কুল শিক্ষক) না বললে বিশ্বাস হতো না যে সেই বৃদ্ধা প্রায় শয্যাশায়ী ছিল, কেবল কপিলমুনির নামে বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছে ভাগলপুর থেকে। বিশ্বাসে নিরাময়ের এরকম প্রত্যক্ষ উদাহরণ ফেলবার নয়। এরই দৌলতে কামদেবপুরের ফকির বাবার আশ্বাস কাজ করতে পারে, একই মনস্তাত্ত্বিক সুযোগ নিয়ে সাঁইবাবা বিষাদরোগ কিংবা হাঁপানি সারিয়ে দেয়, ব্রহ্মচারী মাথাব্যথার রোগীকে আরাম দেয়, মদ্যপকে দেয় অভ্যাসত্যাগের জোর। এগুলি ঘটনাচক্রে সত্যি, অলৌকিক নয়। পাভলভীয় মনোবিজ্ঞানে এই আশ্বাস-বিশ্বাস-নিরাময় প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টাও রয়েছে। মস্তিষ্ক এবং নার্ভতন্ত্রের কাজকর্মে নিস্তেজনা পর্ব (Stage of inhibition), তার মধ্যে Paradoxical phase, সেখানে আশ্বাস বা নির্দেশের অভিভাবন (Suggestion)-এর ক্রিয়া এবং মস্তিষ্ক-অংশের উদ্দীপনা ও শারীরিক প্রতিক্রিয়া—এসব তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় 'অলৌকিক চিকিৎসকে'র রোগ সারানোর রহস্যের কিছু উত্তর পাওয়া যায় (যদিও কলেরা, কুষ্ঠ, টিবি, চর্মরোগ, থ্রম্বোসিস, ক্যানসার, সারানোর উপায় বাতলানো কোনো 'বাবা'র পক্ষেই সম্ভব নয়)। কিন্তু কেবল রোগীর নাম-ধাম থেকে তার রোগ-সংকট-যন্ত্রণার কথা বলে দেয় তারা কিভাবে? যদি 'দৈব নির্দেশ'-এ না হয় তাহলে কি করে হয়? কামদেবপুরের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিরা বলেন ফকির বাবার অনুচরেরা রোগীর খবরাখবর আগে থেকে জোগাড় করে ভেতরঘরে বাবার কাছে পাঠিয়ে দেয়। ব্যাখ্যা হিসাবে এসব কথা অনুমানের দরেই নিতে হয়, কেননা হাতেনাতে প্রমাণ হয় নি কিছুই। এই প্রত্যক্ষ প্রমাণের জায়গাটাতেই

বহু মানুষের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ব্যালান্সের তার টানটান হয়ে আছে। যেন কৌশলের নির্ভেজাল প্রমাণ স্পষ্টভাবে না পেলে দৈবশক্তির দাবিদারদের পুরোপুরি বাতিল করা যায় না। এই দোটানা ভাবটা অনেকের মধ্যেই রয়ে যায়। অথচ অবৈজ্ঞানিক কৌশল কিংবা ফাঁকিবাজি ধরে ফেলার মতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও নিপুণ তদন্তের ব্যবস্থা আমাদের আওতার মধ্যে বিশেষ নেই। এ-ব্যাপারে উন্নত দেশগুলির দিকে তাকালে কিছু রহস্যভেদী আলোর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

আমাদের দেশের কামদেবপুরের ফকিরবাবা, সাঁইবাবা, দাদাজী, ব্রহ্মচারী, রজনীশ—এদের মতো অলৌকিক শক্তির দাবিদার অবতারদের মতো 'দৈব চিকিৎসক' বা Faith Healer আমেরিকাতেও রয়েছে অনেক। রেভারেণ্ড পোপফ, রেভারেণ্ড ডেভিড পল, গ্রাণ্ট, গ্রেস, এদের চালচলন আর কার্যপ্রণালী আলাদা হলেও মূল মতবাদ আর উদ্দেশ্য একই—বহু মানুষকে 'দৈব শক্তি'র প্রভাবে প্রভাবিত করে আরো বেশি জনপ্রিয় হওয়া। আমেরিকা দেশটা যেহেতু অর্থনৈতিকভাবে অনেক উন্নত তাই পোপফ, পল, গ্রাণ্টদের কলাকৌশলও অনেক জমকালো এবং উন্নত যান্ত্রিক পদ্ধতির আমদানি হয় সেখানে অনেক নিপুণতায়। আর সেই সঙ্গে সমান তালে নিপুণতায় পাল্লা দিচ্ছেন সেখানকার বিজ্ঞানী, পর্যবেক্ষক, অনুসন্ধানী ও যুক্তিবাদীরা। অনেকগুলি সংস্থা রয়েছে আমেরিকায় যারা যাবতীয় অলৌকিক বা দৈবিক প্রদর্শনীর খবর পেলেই ধেয়ে যায় যাচাই বাছাই করতে, নানাভাবে চেষ্টা করে আসল রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে। এরকম দু-টি সংস্থা হলো Bay Area Skeptics (BAS) আর National Occult Investigation Committee (NOIC) of the Society of American Magicians। এই দুই সংস্থার সদস্যরা এবছর ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে রেভারেণ্ড পোপফের অলৌকিক রোগ-নিরাময় কৌশলের তীক্ষ্ণ অনুসন্ধান চালিয়ে রহস্য ফাঁস করে দেন জনসমক্ষে। আরো কয়েকজন 'বাবা' কিংবা 'ঈশ্বরের অবতারে'র স্বরূপ তারা প্রকাশ করেছেন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালিয়ে, তবে এখানে কেবল পোপফ-এর প্রদর্শনীর কথাই উল্লেখ করছি নিদর্শন হিসেবে। অন্য রহস্য-ফাঁসের ঘটনাগুলো কমবেশি একইভাবে ঘটেছে। ক্যালিফোর্নিয়ার *Free Inquiry* পত্রিকার Summer '86 সংখ্যায় প্রকাশিত Bay Area Skeptics-এর প্রাক্তন প্রধান রবার্ট স্টেইনার (Robert A. Steiner)-এর প্রতিবেদন থেকে জানা যায় পর্যবেক্ষণের বিস্তৃত খবর। খেয়াল রাখতে হবে স্থান-কাল-পাত্র আর কলাকৌশলের ধরন আলাদা হলেও এদেশের অলৌকিক চিকিৎসকরাও একই মতবাদ, একই মানসিকতার লোক। মৌলিক পার্থক্য কিছু নেই। সত্যি-মিথ্যে বিচারের ক্ষেত্রে দুয়ের মধ্যে এই সাদৃশ্যটা মাথায় রাখতে হবে।

স্বনামধন্য মার্কিন বিজ্ঞানী ও সত্যানুসন্ধানী জেম্‌স্ র‍্যাণ্ডি অনুমান করেছিলেন রেভারেণ্ড পিটার পোপফ তার 'মহিমময়' প্রদর্শনীগুলিতে বেতার সংকেতে বিশেষ এক চাতুরি প্রয়োগ করেন। কিন্তু র‍্যাণ্ডি প্রমাণ চাইছিলেন, হাতে-নাতে প্রমাণ। এবছর (১৯৮৬) ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি ক্যালিফোর্নিয়ায় আসেন এবং Bay Area Skeptics

সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হন। ২৩ ফেব্রুয়ারি সানফ্রান্‌সিসকোতে পোপফের 'দৈব অনুষ্ঠান' হবে। র‍্যাণ্ডি, স্টেইনার ও অন্যান্য সদস্যরা ঠিক করেন পোপফের অনুষ্ঠানে এবার চ্যালেঞ্জ নিতে হবে, তার 'অলৌকিক' কৌশলের আসল চেহারাটা জানতে হবে যেভাবেই হোক। পরিকল্পনা মাফিক ২৩ তারিখ রবিবার জনা পঁচিশেক আদর্শবান দক্ষ সদস্যকে নিয়ে স্টেইনার চলে আসেন সানফ্রানসিস্‌কোর Civic Auditorium হল-এ। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার বেশ খানিকটা আগেই আসা হয়েছিল কারণ জেম্‌স্ র‍্যাণ্ডির পরামর্শ ছিল—হল-এর প্রত্যেকটা আনাচ-কানাচ ভালো করে দেখতে হবে, যন্ত্রপাতি তৈরি রাখার জায়গা বেছে নিতে হবে এবং পোপফের অনুচরদের নজরে আসতে হবে যাতে 'সৌভাগ্যবান' রোগী হিসেবে সংস্থার কারুর ডাক পড়ে স্টেজে। প্রতিবেদক স্টেইনার লিখছেন—'আমি যোগ দিয়েছিলাম আলেকজাণ্ডার জেসন-এর সঙ্গে, আমাদের নির্ভরযোগ্য ইলেট্রনিক বিশেষজ্ঞ সাথী। আলেকজাণ্ডার সঙ্গে এনেছিল ২০,০০০ ডলারের ইলেট্রনিক যন্ত্রপাতি আর এনেছিল তার চেয়েও মূল্যবান মেধা আর অভিজ্ঞতা। আমরা দু-জনে তিনতলায় ব্যালকনির পেছনে একটা টেবিল পেতেছিলাম। কানে হেডফোন আর তড়িৎ-সংকেত গ্রাহক নিয়ে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছিলাম যাতে কোনো বেতার বার্তা বা গুরুত্বপূর্ণ সংকেত (হলের ভেতর) ধরতে পারা যায়। স্ক্যানার, টেপ রেকর্ডার, এরিয়াল সব টেবিলের নিচে কাপড়ের আড়ালে রাখতে হয়েছিল যাতে অন্যান্য দর্শকদের নজরে না আসে। আমরা প্রাণপণে তড়িৎ-সংকেত খুঁজছিলাম। এক ঘণ্টা কেটে গেল। 'শো' প্রায় শুরু হতে চলেছে। কোনো কিছুর হদিশ পাচ্ছি না।

আচমকা আলেক উত্তেজনায় লাফ দিয়ে ওঠে। আনন্দে চিৎকার করতে গিয়েও সামলে নেয়। আমরা পেয়েছি, হদিশ পেয়েছি। ....।'

স্টেইনার আর আলেকজাণ্ডার সন্তর্পণে কানে গ্রাহক গুঁজে শুনতে পান স্টেজের অন্তরাল থেকে এলিজাবেথ পোপফের কণ্ঠস্বর। 'মহান্' রেভারেণ্ড পিটার পোপফের সুযোগ্যা সহধর্মিনী সন্তর্পণে বলছেন—'হ্যালো পিট, হ্যালো! আমি বলছি, আমি! শুনতে পাচ্ছো? হ্যালো! যদি শুনতে না পাও তাহলে কিন্তু বিপদ ....!'

এটাই আবিষ্কার করেছিলেন র‍্যাণ্ডি কিছুকাল আগে, এটাই ছিল তার জোরদার অনুমান যে, কোথাও থেকে কোনোভাবে স্টেজের ওপর পোপফের কাছে খবর পাঠানো হয়, কোনো উপায়ে তার কানে পৌঁছে যায় দর্শক রোগীর ইতিবৃত্ত। এই গুপ্ত খবরের ভরসাতেই পোপফ স্টেজে বাজিমাৎ করে। এহেন চাতুরি সর্বসমক্ষে প্রকাশ করতে দরকার ছিল নির্ভুল দলিল, স্পষ্ট প্রমাণ। এবার সেই চমৎকার সুযোগটি এলো। আলেক আর স্টেইনার সাবধানে টেপ রেকর্ডার চালু করলেন যন্ত্রের ফিতেয় সাক্ষ্য ধরে রাখার জন্য। শ্রীমতি পোপফের গলা—'সজাগ থেকো। আমি রোগীর খবরগুলো ঝালিয়ে নিচ্ছি।'

খবর আসত এলিজাবেথের বেতারযন্ত্র মারফৎ স্টেজের পেছন থেকে তাদের

নিজস্ব বেতার-চ্যানেলে। এই চ্যানেল বা ব্যাণ্ডটা আলেকজাণ্ডার বহু কসরৎ করে তার তড়িৎ-গ্রাহক যন্ত্রে ধরতে পেরেছিল, আর তারই দৌলতে হেডফোনে সব শুনতে পাচ্ছিল স্টেইনার আর আলেক তিনতলায় বসে, উত্তেজনায় ঘেমে উঠছিল তারা।

প্রদর্শনীর নিয়ম ছিল—দর্শকদের মধ্যে যারা চিকিৎসা পেতে বিশেষ আগ্রহী তারা তাদের নাম-ধাম আর অসুখের বৃত্তান্ত আবেদন-কার্ডে লিখে জমা দেবে। কার্ডগুলো চলে যাব ভেতরে (যেখানে অবশ্যই রয়েছে এলিজাবেথ অন্যান্য অনুচরদের সঙ্গে), বাছাই হবে, তারপর নির্বাচিত কয়েকজন 'কেস' হাতে নেবে 'ঈশ্বরপুত্র' পোপফ। একে একে ডাকা হবে তাদের সমবেত দর্শকদের মধ্যে থেকে। কার্ড না দেখেই পোপফ বলে যাবে রোগীর কষ্ট-যন্ত্রণার কথা, বলবে 'ঈশ্বর প্রেরিত সূত্রে'র ভরসায় এবং তারপর 'ঈশ্বরের নির্দেশই' অসুখের দাওয়াই বাতলাবেন পোপফ, সাক্ষাৎ ঈশ্বর-প্রেরিত পরিত্রাতার মতো। বিমোহিত হবে সাধারণ দর্শক।

সেই ঈশ্বর প্রেরিত সূত্রটি যে আসলে শ্রীমতি এলিজাবেথ পোপফের পাচার করা বেতারবার্তা সেটা গত ২৩ ফেব্রুয়ারি সানফ্রানসিস্‌কোর অনুষ্ঠানে আবিষ্কার করার পর, পরবর্তী কয়েকটি অনুষ্ঠানেও পিছু ধাওয়া করেছিল Bay Area Skeptics-এর অনুসন্ধানী দল। ক্যাসেট ভর্তি জ্বলন্ত তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ হয়েছিল বিস্তর। মাস খানেক পরেই জেম্‌স্ র‍্যাণ্ডি জনি কারসনের "Tonight" টেলিভিশন শো'তে গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের কাছে ফাঁস করে দেন পোপফ এবং অন্য কয়েকজন 'অবতার'স্বরূপ দৈব চিকিৎসকদের কীর্তি। র‍্যাণ্ডি যে-সব চমকপ্রদ তথ্য হাজির করেছিলেন তার একটি নিচের রিপোর্টে অবিকল তুলে দেওয়া হলো :

ঘটনাস্থল ক্যালিফোর্নিয়ার আনাহাইম শহরের এক জমকালো থিয়েটার হল। ১৯৮৬-র ১৬ মার্চ। রেভারেণ্ড পোপফের দুর্দান্ত প্রদর্শনী। স্টেজের ওপর টান টান হয়ে চোখ বুঁজে দাঁড়ানো পোপফ-এর কাছে এক নম্বর রোগীর কেস দেওয়া হলো, কোনো নাম-ধাম কিচ্ছু না।

পোপফ শুনলেন। কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। তারপর কেটে কেটে বললেন—'ভার্জিল। .... পুরো নাম কি ভার্জিল জোরগেনসন? কে ভার্জিল? বল।'

যে ব্যক্তি সিটে বসে হাত তুললেন তিনি রীতিমতো বিমোহিত কেননা সে সত্যিই জোরগেনসন! পোপফ একই রকম কাটা কাটা ভঙ্গিতে বলে চললেন—'তোমার দুই হাঁটুতে ব্যাধি। ঈশ্বর তোমার যন্ত্রণা তুলে নিতে চান। তুমি প্রস্তুত তো?'

এবার সকলে দেখল প্রৌঢ় ভার্জিল জোরগেনসন একটি ছড়িতে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে গেলেন পোপফের কাছে। তাজ্জব ব্যাপার! ওতো সিটেই বসেছিল! কি করে পোপফ জানল তার হাঁটুতে অসুখ? ঈশ্বরের সূত্র নির্দেশেই কি জানল সে? এবার পোপফের চিকিৎসার পালা। অর্ঘ্য নিবেদনের ভঙ্গিতে কয়েকবার মাত্র হস্ত সঞ্চালন। তারপর বললেন—'ঈশ্বর তোমার প্রতি প্রসন্ন। শুধু তোমার এই হাঁটুর বেদনাই নয়, সুদূর সুইডেনে তোমার অসুস্থ বোনের অসুখও ঈশ্বরের নির্দেশে দূর

হয়ে যাবে। যাও, ফিরে যাও।' বলেই আচমকা পোপফ ভার্জিলের হাত থেকে ছড়িটা নিয়ে মট্ করে ভাঙলেন সেই জখম হাঁটুর ওপর-ই। বিমুগ্ধ ভার্জিল দিব্যি সোজা হেঁটে ফিরে এলো তার আসনে, চোখমুখ দিয়ে ঝরে পড়ছে ঈশ্বর আর তার সাক্ষাৎ অবতারের প্রতি ভক্তিভাব।

এই দৃশ্যটা দেখা গেল সর্বসমক্ষে। কিন্তু আড়ালে কি ঘটল? আলেক-এর লুকোনো টেপ রেকর্ডার মুখ খুলতে এই কথোপকথন সেখানে শোনা যায়—

এলিজাবেথ বলছে পিটার পোপফকে, 'ভার্জিল। ভার্জিল জোরগেনসন। ভার্জিল'।

পোপফ চতুরভাবে সূত্র ধরে, 'ভার্জিল।'

[এলিজাবেথ : 'জোরগেনসন।' (আড়াল থেকে)]

পোপফ : 'পুরোনাম কি ভার্জিল জোরগেনসন? কে ভার্জিল? বল।'

[এলিজাবেথ : 'পেছন দিকে বসেছে। হাঁটুতে বাতের ব্যথা। ছড়ি আছে হাতে।"]

পোপফ : 'তোমার দুই হাঁটুতে ব্যাধি।'

[এলিজাবেথ : 'হাতে ছড়ি আছে। পুরনো বাত বলছে।']

পোপফ : 'ঈশ্বর তোমার যন্ত্রণা তুলে নিতে চান। তুমি প্রস্তুত তো?'

[এলিজাবেথ : 'নিজের বাত, কিন্তু এছাড়াও সুইডেনে অসুস্থ বোনের জন্যে প্রার্থনা করতে এসেছে।']

পোপফ : 'ঈশ্বর তোমার প্রতি প্রসন্ন।'

[এলিজাবেথ : 'সুইডেনে বোনেরও অসুখ।']

পোপফ : 'শুধু তোমার এই হাঁটুর বেদনাই নয়, সুদূর সুইডেনে তোমার অসুস্থ বোনের অসুখও ঈশ্বরের নির্দেশে দূর হয়ে যাবে। যাও, ফিরে যাও।'

আমেরিকার হাজার হাজার মানুষ শুনেছে এই কথোপকথন। এরকম আরো অনেক রোমাঞ্চকর নেপথ্য আলাপ ধরা পড়েছে টেপের ফিতেয়। কিন্তু এখানেই শেষ নয়।

পোপফের ভাবমূর্তি আর ঐশ্বরিক মহানুভবতার ভান যখন আমাদের কাছে খান খান হয়ে ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয় তখনই শেষ দ্বিধার ভাবটা নড়েচড়ে ওঠে— ঈশ্বরের নির্দেশটা না হয় বুজরুকিই হলো, কিন্তু রোগ নিরাময় হওয়া? ভার্জিল নামক লোকটি যে শেষকালে পুরনো বাতের ব্যথা মুক্ত হয়ে গটগট করে হেঁটে যায় সেটা সম্ভব হয় কি করে? শরীরের ওপর মনের প্রভাব কিংবা Psychosomatic effect-এর কথা আমরা জেনেছি কিন্তু তাতে কি এরকম ম্যাজিকের মতো নিমেষে দুরূহ রোগ সেরে যায়? দৈবিক গন্ধটা যেন রয়েই যাচ্ছে! .... দ্বন্দ্বটা আসা অমূলক নয় বরং আরেকটা রহস্য-মোচনের জায়গা সেটা। আমরা এতক্ষণ হল-এর মধ্যে যে ভার্জিল জোরগেনসনকে দেখেছি সে কিন্তু আসলে ভার্জিল জো. নয়, সে হলো ডন হেনভিক। হেনভিক, র‍্যাণ্ডি-স্টেইনারদের নিজের লোক, Bay Area Skeptics-এর অন্যতম উদ্যোগী সভ্য, Society of American Magicians-এর একটি আঞ্চলিক শাখার সভাপতি এবং অতি বিচক্ষণ অভিনেতা। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি যে জনা পঁচিশেক সুযোগ্য সদস্যদের সঙ্গে স্টেইনার সানফ্রানসিস্কোর উদ্দেশে রওনা

দিয়েছিল পোপফের পিছু ধাওয়া করতে, সে দলেই ছিল হেনভিক। ঠিক হয়েছিল সব কটা শো-তেই হেনভিক নানারকম ছদ্মবেশ ধরে আগেভাগে পোপফের অনুচরদের সঙ্গে দোস্তি করবে, 'সৌভাগ্যবান' রোগী হিসেবে লিস্টিতে নাম ঢোকাবে যাতে প্রদর্শনীর সময় ডাক পড়ে, এবং পোপফের 'মহান্ ভাবমূর্তি'কে আরো বাড়িয়ে তুলবে, আরো বেশি বিশ্বাসভাজন হবে। কার্যক্ষেত্রে এই সব কটা কাজেই নিপুণ অভিনেতা হেনভিক চমৎকার সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। ১৬ মার্চ ক্যালিফোর্নিয়ার আসরে যে হেনভিক ছিল বাতের রোগী ভার্জিল, সে-ই কিন্তু ২৩ ফেব্রুয়ারি সানফ্রানসিস্কোতে ছিল মদ্যপানে বিপর্যস্ত টম হেনড্রিস। আবার আর-এক 'অবতার' ডব্লু ভি. গ্রাণ্ট'-এর ফিলাডেলফিয়ার প্রদর্শনীতে আবেল ম্যাকমিন নামে যে মূত্রনালীর রোগীকে নিরাময় হতে দেখা গেল তথাকথিত দৈব নির্দেশে সে-ও আসলে ছিল ডন হেনভিক। এমনকি ডেট্রয়েটের প্রদর্শনীতে এই পোপফ হুইল-চেয়ারে বসা জরায়ুর ক্যানসারে বিধ্বস্ত বৃদ্ধ শ্রীমতি বার্নিস মেনিকফকে যে ঈশ্বরের নিদান দিয়েছিল, সেই মেনিকফও কিন্তু আসলে ছিল হেনভিক। এটা নিশ্চয়ই প্রমাণ করতে হবে না যে, হেনভিকের কদাচ কোনো জরায়ু ছিল না!

উদাহরণ এরকম রয়েছে বহু। আমেরিকার বুকে অপবিজ্ঞানের ঘাতক সত্যানুসন্ধানী কিছু বিজ্ঞানী একে একে সেগুলো লোকের কাছে প্রকাশ করে চলেছেন। এসব তথ্য জানার পর আমরা আরেকবার আমাদের দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখতে পারি যে, কায়দা-কৌশল আর পাত্রপাত্রী পৃথক হলেও কামদেবপুরের ফকির কিংবা আরো সব 'দৈবশক্তিধর' পুরুষেরা যখন একই ঢঙে অদ্ভুত ক্ষমতায় (?) রোগীর হাল-হকিকৎ বাতলে দেয়, রোগের নিদান দেয়, কখনো দুরূহ রোগও সারিয়ে দেয়, তখন তারা সত্যিই কিসের আশ্রয় নেয়, দৈবশক্তির, না গোপন কোনো ছল-চাতুরির যা সহজে লোকের কাছে ধরা পড়ে না?

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

ডিসেম্বর ১৯৮৬

সাইকিক সার্জারী: অস্ত্রোপচার না হস্তপাচার

অপারেশন টেবিলে যন্ত্রণাকাতর সব-ডাক্তার-ফেরৎ রোগী শুয়ে। অপারেশন টেবিল বলতেই যে-ছবিটা চোখের সামনে সাধারণভাবে ভেসে ওঠে, তার সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। ডাক্তার আস্তিন গুটিয়ে খালি হাতে এলেন অপারেশন সারতে, সাথে নার্স। না, তার হাতেও ছুরি-কাঁচি এসব কিছুই নেই; বদলে আছে বাইবেল ও খানিকটা তুলো। রোগীর আত্মীয়-পরিজনরা সামনেই দাঁড়িয়ে। ডাক্তার অপারেশন শুরু করলেন। সবাই বিস্ময় ও চরম উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করতে লাগলেন। আমরা যেমন বালির ওপর তর্জনী দিয়ে দাগ টানি, ডাক্তার পেটের ওপর তেমন করে আঙুল চালাতেই চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে লাগল তাজা লাল রক্ত। তারপর ডাক্তারের হাত রোগীর পেটের ভেতর ঢুকে বার করে আনল একটুকরো মাংসখণ্ড বা টিউমার, যা ভদ্রলোকের দেহে বাসা নিয়েছিল এবং আরোগ্য-লাভে এতদিন ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিল। তারপর তুলো দিয়ে ক্ষতস্থানটা মুছে দিতেই ব্যাস্। কোথায় রক্ত, কোথায় ক্ষত। মুহূর্তে সব অদৃশ্য। জায়গাটা আগের মতোই মসৃণ ও অক্ষত। রুদ্ধশ্বাসে রোগীর এক ক্যামেরা-গলায়-আত্মীয় এরকম এক দুর্লভ ও রোমহর্ষক ঘটনাটিকে ধরে রাখলেন। ফ্ল্যাসের ঝলকে ঘটনা ফিল্মবন্দী হলো।

ওপরের ঘটনাটা কোনো কল্পকাহিনী থেকে নেওয়া নয়। এরকম ঘটনা রমরম করে ঘটেছে; ঘটছে এবং ঘটবার অপেক্ষায় রয়েছে। অকুস্থল—ফিলিপিনসের রাজধানী ম্যানিলা। ওপরের ঘটনায় রোগীর ভূমিকায় ছিলেন বর্তমান লেখকের পরিচিত এক গয়াবাসী ব্যবসায়ী, নাম আর. আর. প্রসাদ। তিনি দুরারোগ্য স্নায়বিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ক্রমশ চলনশক্তিরহিত হয়ে পড়েছিলেন। সমস্ত ডাক্তারেরা জবাব দিলে প্রতিবেশী একজনের মুখে শুনে ম্যানিলায় যান বিনা অস্ত্রের চিকিৎসা করাতে এবং সুস্থতর অবস্থায় ফিরে আসেন। তার মুখের কথা হয়তো গল্প বলে উড়িয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু সঙ্গের রঙিন ছবিগুলো অবিশ্বাস মিশ্রিত বিস্ময় ও কৌতূহলের উদ্রেক করে। কিছুদিন পরে *মানবমন* পত্রিকায় (জানুয়ারি ১৯৮৫) অরুণা হালদারের *'লৌকিক অলৌকিক'* শীর্ষক একটা লেখা প্রকাশিত হয়। তা থেকে জানা যায় গয়া এবং পাটনা থেকে বহু বিত্তবান মানুষই দুরারোগ্য রোগ সারাতে ম্যানিলায় পাড়ি দিচ্ছেন।

এরপর এ-সম্পর্কে খোঁজখবর করে যতটা জানতে পেরেছি তা নিয়ে আলোচনা করা যাক।

যে ধরনের অপারেশন অস্ত্রোপচারের কথা এখানে বলা হলো, তাকে বলে 'সাইকিক সার্জারী' (Psychic Surgery)। মানে বিনা অস্ত্রে অস্ত্রোপচার। এটা হয়

'আত্মার শক্তিতে'। 'ডাক্তারের শরীরে শুভ-আত্মা ভর করে বলেই, এমন অদ্ভুত ঘটনা ঘটানো সম্ভব।' এই সাইকিক সার্জারী যে-বিভাগের মধ্যে পড়ে তাকে বলে ফেইথ হিলিং (Faith healing); অর্থাৎ বিশ্বাসের দ্বারা রোগ নিরাময়। যারা অপারেশন বা চিকিৎসা করে তাদের Psychic Surgeon বা Faith Healer বলে। অবশ্য ব্রিটেন ও আমেরিকা থেকে প্রকাশিত বিশ্বকোষে (*Encylopaedia Britanica* ও *Encyclopaedia Americana*) 'সাইকিক সার্জারী'-র কোনো উল্লেখ নেই।

শ্রী প্রসাদের সাইকিক সার্জারী করা হচ্ছে

ফেইথ হিলিং-এর জন্ম বহু প্রাচীনকালে, আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পত্তনের আগে। সেই সময় রোগ নিরাময়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা এবং কৃত্যাদির (rituals) প্রয়োগ বিশ্বজনীন ছিল। সাইকিক সার্জারী হলো ফেইথ হিলিং-এর এক যুগোপযোগী, আধুনিক ও নিপুণ (sophisticated) রূপ। সাইকিক সার্জারী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে ফেইথ হিলিং ব্যাপারটা একটু জানার চেষ্টা করা যাক। খ্রিস্টধর্মের মূল নির্দেশক বাইবেল-এ এর প্রচুর উদাহরণ আছে। যীশু প্রায় জনা চল্লিশেক অন্ধ, খোঁড়া, বোবা, কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত লোককে সারিয়ে তুলেছিলেন।* প্রকৃতপক্ষে যীশুকে শ্রেষ্ঠ ফেইথ-হিলারদের একজন বলে গণ্য করা হয়। যীশু ছাড়াও বাইবেলের যুগে লোকে বিশ্বাস করতো, মন ও আত্মাই শরীরের নিয়ন্ত্রক। প্রকৃতপক্ষে অসুখ হয় মনে

* And great multitudes came unto him, having with them those that were lame, blind, dumb, maimed, and many others and cast them down at Jesus' feet, and he healed them. (Mathew 15:30)

বা আত্মায়, দেহে নয়। রোগকে পাপের ফল বা শয়তানের শয়তানী বলে গণ্য করা হতো। তাই রোগমুক্তি ঘটাতে আত্মার পরিশুদ্ধি ও অটুট বিশ্বাস (যীশুর প্রতি) অপরিহার্য ছিল। এই অর্থে ফেইথ হিলিং Divine healing বা Spiritual healing-এর সমার্থক। আসলে ফেইথ হিলিং প্রায় সব ধর্মেই দেখা যায়। সাইকিক সার্জারীর ব্যাপারটা খ্রিস্ট ধর্মের সাথে যুক্ত বলেই কেবল এত গৌরচন্দ্রিকার প্রয়োজন হলো। তা না হলে, এ-ব্যাপারে ভারতীয় ঐতিহ্য কারো চেয়ে কম যায় না। মন্ত্রের সাহায্যে পেট থেকে শেকড়, দাঁত থেকে পোকা বার করার ঘটনা অনেকেই দেখে থাকে। ঝাঁড়-ফুঁক তো সরাসরি এ-বিভাগেই পড়ে। আর মরা মানুষ বাঁচানোর ব্যাপারে বোধহয় আমাদের দেশ সবচেয়ে এগিয়ে। মহাপুরুষদের জীবনী-গ্রন্থে এরকম অজস্র 'সত্যি-হলেও-গল্প' পাওয়া যায়।

আগেই বলা হয়েছে সাইকিক সার্জারী হলো ফেইথ হিলিং-এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ। প্রথম যে সাইকিক সার্জন, সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তিনি হলেন ব্রাজিলের অরিগো, যার আসল নাম ছিল Jos'e Pedro de Feitas। ১৯৫০ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত প্রায় হাজারখানেক রোগীর চিকিৎসা করেছিলেন বলে তার সমর্থকরা দাবি করেন। তার অস্ত্রোপচারের অস্ত্র ছিল সাধারণ পকেট ছুরি, টেবিল ছুরি বা ওই জাতীয় কোনো অস্ত্র। ছুরি দিয়ে পেট চিরে টিউমার বার করার পর দু-দিক চেপে জুড়ে দিতেন।

অরিগো তার অলৌকিক ক্ষমতার জন্য এক অশরীরী আত্মার কথা উল্লেখ করতেন। সেটি হলো মৃত ডাক্তার ফ্রিট্স্-এর। ফ্রিট্স্ তার কানে কানে যেরকম নির্দেশ দিতেন তিনি তেমনই করতেন।

ব্রাজিলেই আর একজন বিখ্যাত সাইকিক সার্জন ছিলেন, জিকা (Zeca)। বহু চিকিৎসকও তার ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত হয়েছেন।

ব্যক্তিগতভাবে কোনো কোনো চিকিৎসক এই সব হিলারদের স্বীকৃতি দিলেও ব্রাজিলের মেডিকেল অথরিটি কিন্তু কোনোদিনই এদের সুনজরে দেখে নি। উপরন্তু নানাভাবে পর্যুদস্ত করেছে। ইতিমধ্যেই পৃথিবীর অপর প্রান্তে ফিলিপিনসে আরও ডজনখানেক সাইকিক সার্জেনের আবির্ভাব ঘটে গেছে। সাথে সাথে একদল যুক্তিবাদী মানুষও উঠে পড়ে লাগলেন এর রহস্য উদঘাটনে। কারণ বর্তমানে চিকিৎসা-বিজ্ঞান যথেষ্ট উন্নত ও সমৃদ্ধ। সেই জ্ঞানের নিরিখে অস্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে কারুর শরীর থেকেই কোনো টিস্যু ইত্যাদি অপসারণ সম্ভব নয় এবং ক্ষতচিহ্ন না রেখে শরীরের ওপর থেকে অস্ত্রোপচারজনিত ক্ষত তখনই সম্পূর্ণ রূপে মিলিয়ে দেওয়া আরো অসম্ভব। সুতরাং এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো গরমিল আছে। আর যদি ধরে নেওয়া হয় যে, এটা নিছক এক ধরনের হস্তকৌশল, তবে রোগমুক্তি কেমনভাবে ঘটে, সে-সম্পর্কে প্রশ্ন থেকেই যায়।

একটা ব্যাপার জানিয়ে রাখা ভালো, যে ওই সার্জেনদের করা অপারেশন থেকে লুকিয়ে (প্রকাশ্যে, কোনো মতেই তারা এটা বরদাস্ত করে না) রক্ত ও টিউমার নিয়ে

সেরোলজি পরীক্ষা করে দেখা গেছে, কোনো ক্ষেত্রেই ওই রক্ত মানুষের নয়; গরু, শূয়োর ইত্যাদির। টিস্যুগুলো বেশিরভাগই মুরগীর। তবে একবার এক মজার ঘটনা ঘটেছিল। এক বালিকার ঘাড় থেকে বার করা টিস্যু পরীক্ষা করে জানা যায়, ওটা পরিণত মহিলার ব্রেস্ট ক্যানসার নির্ণয়ের বায়োপসি স্যাম্পল (biopsy sample)। এরপর আর কিছু না বলাই ভালো।

এদের কৌশল ধরতে যে সব যুক্তিবাদী মানুষ উঠে পড়ে লাগেন, তার মধ্যে জন টেলর, ই. বালানভস্কি এবং জেমস র‍্যাণ্ডি অন্যতম। র‍্যাণ্ডি নিজেও একজন যাদুকর। সুতরাং সাপের হাঁচি চেনার পক্ষে তিনি দক্ষ বেদে। টেলর ও বালানভস্কি একযোগে অনুসন্ধান চালিয়েছেন। তারা মোটামুটিভাবে এটার কৌশলও আঁচ করতে পেরেছেন। কিন্তু র‍্যাণ্ডির মতো সবিস্তারে ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। তাই সাইকিক সার্জেন ও তাদের পৃষ্ঠপোষকদের কাছে র‍্যাণ্ডি অনেক বেশি আতঙ্কজনক। পঞ্চাশের দশক থেকেই র‍্যাণ্ডি বহুবার ম্যানিলায় যাবার চেষ্টা করেও যেতে পারেন নি। পাশপোর্ট বাজেয়াপ্ত করে, প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে, ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত হানার অভিযোগে অভিযুক্ত করে, তাকে বিরত রাখা হয়। ব্রাজিলেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। শেষে তিনি গ্রানাদা টেলিভিশন কর্তৃক প্রচারিত—*ওয়ার্ল্ড ইন অ্যাকশন* নামে এক তথ্যচিত্রে পুরো ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ হন এবং সহজেই এর কৌশল আবিষ্কার করে ফেলেন। শুধু আবিষ্কারই নয় তিনি এ-ধরনের সাইকিক সার্জারী ইতালি, ইংল্যাণ্ড, কানাডা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বহু জায়গায় এবং দূরদর্শনে অনুষ্ঠান করেও দেখান—সব রহস্যের ব্যাখ্যা করে।

প্রসঙ্গত, সাইকিক সার্জারীর ব্যাপারে দেশের সরকারের আশ্চর্য নীরবতা এবং পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। যারা চিকিৎসার জন্য গেছেন তাদের মুখেই শোনা যায় যে, ম্যানিলায় এই ধরনের চিকিৎসাকে কেন্দ্র করে বহু জায়গায় টাউনশিপ গড়ে উঠেছে। গড়ে উঠেছে বহু দোকানপাট, হোটেল প্রভৃতি। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের লোকেদের আনাগোনায় সেগুলো সরগরম হয়ে থাকে। যার অর্থ এক কথায় দাঁড়ায়, বিদেশী মুদ্রার আমদানি—যা সব দেশের সরকারের কাছেই একান্ত লোভনীয় ও কাম্য। তাই এটাকে এক অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসার পৃষ্টপোষকতার কারণ হিসাবে ধরলে মনে হয় খুব একটা অন্যায় হবে না।

এই ধরনের সার্জারীর ব্যাপারে ব্রিটিশ মেডিকেল অর্গানাইজেশনগুলোর কোনো আগ্রহ নেই। British Medical Association, Royal College of Surgeon এবং Royal College of Physician-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা এ-সম্পর্কে বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখান নি। আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের মনোভাবও তাই। এদের দর্শনটা যেন 'Let the people learn from their errors'—অর্থাৎ মানুষ ঠেকে এবং ঠকে শিখুক, নিজের বুদ্ধি দিয়ে।

আবার ফেরা যাক অরিগোর কথায়। একে বিখ্যাত করবার পেছনে দু-জনের অবদান ছিল সর্বাধিক। তাঁরা হলেন জন ফুলার, যিনি *অরিগো: সার্জন অফ রাস্টি লাইফ* বলে একটি বই ব্রিটেন থেকে ছেপেছিলেন এবং পাহারিক, যিনি পরে ইউরি গেলার নামে আর এক ধাপ্পাবাজকে নিয়ে মেতেছিলেন। অরিগো আসলে ছিলেন এক হাতুড়ে ডাক্তার (amateur doctor)। তিনটে জিনিস অরিগোর জানা ছিল : এক, প্রাথমিক শল্য চিকিৎসার মূল নীতি; দুই, প্রাথমিক দন্ত চিকিৎসা ; এবং তিন, মনস্তত্ত্বের নিপুণ ব্যবহার। সে যা প্রেসক্রিপশন করত তা একমাত্র তার সহকারীর পক্ষে বোঝা সম্ভব হতো। সে সেটা টাইপ করে দিত। যেহেতু রোগী, রোগ বা নিরাময় নিয়ে কোনো সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না, তাই গল্পের গরু সহজেই গাছে ওঠে। এবং প্রচারের মহিমায় অসহায়, বিপন্ন ও শেষ-অবলম্বন-খোঁজা লোকজনদের ভিড় বাড়ে। র‍্যাণ্ডিরা যে টি.ভি. প্রোগ্রাম দেখেছিলেন, তাতে সাইকিক সার্জেনের ভূমিকায় ছিলেন জোসে মারকাড়ো (Jos'e Mercado)।* এখানে প্রথমে এক ধরনের লোশন লাগিয়ে অস্ত্রোপচারের জায়গাটা ম্যাসাজ করতে শুরু করে। অস্ত্রোপচার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পেটে করতে দেখা যায়। অরিগোর মতো এরা কোনো অস্ত্র ব্যবহার করে না, এরা অস্ত্রোপচার সারে হাত দিয়ে—হাতের তলা থেকে রক্তের রেখা ফুটে উঠল এবং একটা ক্ষতের সৃষ্টি হলো। সার্জেন রক্তের রেখা মুছে আরও তুলোর জন্য হাত বাড়ালেন। বাঁ-হাতটা শরীরের ওপর চেপে রেখে ডান হাতের আঙ্গুলগুলো তার তলায় কর্মরত দেখা গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার নতুন করে রক্ত বের হতে লাগল। সাথে এক টুকরো সাদা মাংস খণ্ড; ওটা আলগাভাবে

Film : Flam. James Randi. p.180

লেগেছিল। বাঁ-হাতের তলা থেকেও বেরলো ঐ রকম আর একটা টুকরো। তুলো সমেত সেগুলো ট্রেতে ফেলে জায়গাটা মোছার পর কোনো ক্ষতচিহ্নের টিকিও দেখা গেল না। অস্ত্রোপচার সাঙ্গ হলো।

অনেক চেষ্টার পর মট্টক স্কট এক খণ্ড টিস্যু এবং খানিকটা রক্ত সুকৌশলে লুকিয়ে সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। এর নেতৃত্বেই ব্রিটেনের গ্রানাদা টেলিভিশন সাইকিক সার্জারীর ওপর তথ্যচিত্র তুলতে গেছিল। টিস্যুটার দুয়ের তিন ভাগ ছিল কটন উল। সংগৃহীত মাল মশলা, লণ্ডন হসপিটাল মেডিকেল কলেজ এর ব্লাড গ্রুপ সেরোলজি এবং ফরেনসিক মেডিসিনের (Blood Group Serology and Forensic Medicine) বিশেষজ্ঞ ডা. পি. জে. লিঙ্কন (P.J. Lincon) সাহেবের কাছে পাঠানো হয়. বিশ্লেষণের জন্য [illegible] রক্তটা গরুর এবং টিউমারটা মুরগীর অন্ত্র (intestine)। [illegible] সাইকিক সার্জেনরা বা তাদের সমর্থকরা মোটেও [illegible] এ-সবই ঈশ্বরের মহিমা—মারাত্মক টিউমারও নিরীহ [illegible] পরিবর্তিত হয়েছে।

এখন কথা হলো, সার্জেন তো এল খালি হাতে এবং অস্ত্রোপচার সারল, তবে রক্ত আর মুরগীর অন্ত্র এলো কোথা থেকে।

রাণ্ডির মতে পুরো ব্যাপারটার মধ্যে দুটো প্রধান কৌশল আছে। প্রথমটা হলো, একটা নকল বুড়ো আঙুল। ম্যাজিকের সরঞ্জাম বিক্রির দোকানে পাওয়া যায় এগুলো, যা দেখে আসল না নকল ধরা খুবই শক্ত। (সিনেমাতে এবং ফার্স্ট এড ডেমনস্ট্রেশনে কৃত্রিমভাবে ক্ষত তৈরি করা হয়, যা খুব সামনে থেকে দেখেও বোঝা মুশকিল, একে বলে faking injuries!) অস্ত্রোপচারের আগে ওই বুড়ো আঙুলের মধ্যে রক্ত ভরে নেওয়া হয়। তারপর এক হাত অন্য হাত দিয়ে ঢেকে বুড়ো আঙুলটা খুলে ফেলা হলে রক্ত ও টিস্যু বেরিয়ে আসে। ক্ষত বোঝাবার জন্য চামড়াটা দুদিক থেকে চেপে একটা খাঁজ তৈরি করা হয়। অস্ত্রেপচার তথা হস্তপাচার শেষ হলে কায়দা করে নকল আঙুলটা আসল আঙুলের ওপর পরে নিতে হয়। তারপর টিস্যু ও রক্ত তুলো দিয়ে মুছে নিলেই ব্যাস্। আরো বেশি রক্ত দেখাবার প্রয়োজন হলে (রক্ত বেশি বেরলে ব্যাপারটা জমে ভালো) তুলোর মধ্যে লুকিয়ে রক্ত ভরা বেলুন আনানো হয়। কৌশলে তা থেকে রক্ত ও টিস্যু দেখানো খুবই সোজা। জোসেও তাই করতেন। অস্ত্রোপচার সেরে রক্তে ভেজা তুলো এবং টিস্যু চটপট একটা পাত্রে ফেলে সরিয়ে ফেলা হয়।

অপারেশনের কৌশল আমদের দেশেও কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো যাদুকর পি.সি. সরকার (জুনিয়র)। তিনি 'ছুরি-কাঁচি ছাড়া অপারেশন' শিরোনামে ২০ আগাস্ট, ১৯৮৭-র *আজকাল* পত্রিকায় লেখেন। তার মতে, অপারেশনের আগে থেকেই এরা আঙুলের ফাঁকে একটা আলপিন জোর করে ঢুকিয়ে রাখে। এটা একটা কষ্টকর কৌশল। কিন্তু অন্যের মাথায় ঘোল ঢেলে মোটা টাকা

উপার্জন করতে এই কষ্টটুকু এরা দাঁতে দাঁত চেপে সয়ে থাকে। অপারেশনের সময় যে রক্ত দেখা যায় তা মোটেও রোগীর নয়, ওটা ডাক্তারদের। ওরা নিজের আঙুলেই পিন ফুটিয়ে রক্তপাত ঘটায়। শ্রীসরকার যে কৌশলের কথা বলেছেন তাতে হয়তো এক-আধজনের অপারেশন সম্ভব। কিন্তু একই দিনে একাধিক অপারেশন এইভাবে করা সম্ভব কি-না প্রশ্ন থেকেই যায়।

দৃষ্টিবিভ্রম! পেটের ওপর কৌশলে ভাঁজ করা আঙুল দেখে মনে হয় বুঝিবা হাত পেটের ভেতরে।

এ ছাড়াও, প্রবীর ঘোষ নিজেকে এই রহস্যের প্রথম উন্মোচক বলে দাবি করেছেন (*আজকাল*, ৭.২.৮৯)। র‍্যাণ্ডি যা পারেন নি তিনি তাই পেরেছেন বলে ঘোষণা করলেও, তার বিবরণ থেকে বিশেষ কিছুই উদ্ধার করা যায় না।

র‍্যাণ্ডি যে পুরো ব্যাপারটা ডেমনস্ট্রেশন সহযোগে দেখিয়েছেন, সে-কথা আগেই বলা হয়েছে। সাইকিক সার্জেন গণ্ডায় গণ্ডায় আছে। কৌশলও একের অপরের থেকে ভিন্ন হতে পারে।

অনেকসময় এদের পেটের ভেতর হাত ঢোকাতে দেখা যায়। এটাও করা খুব সোজা। সাধারণত মোটাসোটা লোকের ক্ষেত্রে করা সুবিধাজনক। আঙুলগুলো পেটের দিকে আস্তে আস্তে মুড়ে, গাঁট দিয়ে পেটে চাপ দিলেই হলো। তবে আঙুল ভাঁজ করার সাথে সাথে সমান তালে মাথা ও শরীর সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিতে হয়। এতে এক ধরনের দৃষ্টিবিভ্রম (Optical Illusion) সৃষ্টি হয়। এই হলো এর

কৌশলগত রহস্য। তবুও এটা বহু সাধারণ-অসাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে দিচ্ছে।

এই 'অলৌকিক' শক্তিধর সার্জেনরা, যা-ই করুন না কেন তাঁরা মানুষ। সুতরাং তাদের নিজেদেরও রোগ-ভোগ হয়। তখন তারা কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সাহায্য নেন। আমাদের দেশে সাঁইবাবা, বালক ব্রহ্মচারী বা এই ধরনের 'বাবাজীরা'ও নেন। আর একটা মজার ঘটনা হলো, দূর-দূরান্ত থেকে লোক চিকিৎসার জন্য ফিলিপিনসে ছুটে গেলেও, গেঁয়ো যোগীরা নিজের দেশের লোকের কাছ থেকে ভিক্ষে পান না। টনি আগপাওয়া ওখানকার ধনীতম সাইকিক সার্জেনদের একজন; নিজের অ্যাপেনডিক্স অপারেশন করতে সানফ্রান্সিসকো ছুটে গেছিলেন। তার ছোটো ছেলে অসুস্থ হলে কালক্ষয় না করে দৌড়েছিলেন হাসপাতালে।

এবার আরোগ্যের প্রশ্ন। ঠিক কতজন এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে আরোগ্যলাভ করেছে বা করছে তার সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া দুষ্কর। হিলারদের বা তাদের সমর্থকদের কাছ থেকে যা জানা যায়, তার বিশ্বাসযোগ্যতা সন্দেহাতীত নয়। ১৯৫৫ সালে এক জার্মান হিলারকে ৫৩৮ জন পেশেন্টের ওপর পরীক্ষা করানো হয়। তাদের বেশিরভাগই ছিল ক্রনিক পেশেন্ট এবং তারা বছর পাঁচেক ধরে প্রচলিত চিকিৎসা করিয়েছিলেন। এদের হিলিং ট্রিটমেণ্ট করানোর পর দেখা গেছে শতকরা ৯ জনের প্রকৃত শারীরিক উন্নতি হয়েছে। শতকরা ৬১ জনের তুলনামূলকভাবে সুস্থতা অথবা সাময়িক উন্নতি ঘটেছে। অপরপক্ষে অর্ধেকের বেশি রোগী, যাদের অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছিল তারা সুস্থ বোধ করছে সাজেশন এবং বিশ্বাসের প্রভাবে। গ্রানাদা টেলিভিশনের তরফ থেকে অনেকগুলো রোগীকে নিয়ে সার্ভে এবং তথ্যচিত্র গ্রহণ করা হয়েছিল। সেখান থেকে জানা যায়—সাইকিক সার্জারীর প্রভাবে কিছু লোক নিজেদের সম্পূর্ণ সুস্থ বলে ঘোষণা করলেও, তারা পুনরায় সেই রোগেই আক্রান্ত হন। বাকি সব কিছুটা সুস্থতা বোধ করেছিলেন।

অনেকে তো আবার ফিল্মটা টিভিতে দেখাবার আগেই মারা যান। অন্যান্যরা পরবর্তীকালে মারা যান স্ব স্ব অসুখের পুনরাক্রমণে।

১৯৭৯ সালে র‍্যাণ্ডি ইংলণ্ডে বি বি সি-র এক অনুষ্ঠানে সাইকিক সার্জারীর কৌশল ফাঁস করে দেন—সবিস্তার ব্যাখ্যা সহযোগে, করে দেখিয়ে। বি বি সি সাইকিক সার্জারীর নিন্দা করে, এটাকে fakes, hoaxes and frauds বলে অভিহিত করে। আর র‍্যাণ্ডির তো সমস্ত সাইকিক সার্জেনদের বিরুদ্ধে চ্যালঞ্জে-ই রয়েছে দশ হাজার ডলারের।

পরিশেষে, যাকে নিয়ে শুরু করেছিলাম সেই প্রসাদজীর কথায় ফেরা যাক। টাকা তার যা-ই খরচা হোক না কেন, তিনি সুস্থতর অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। আগে একদম চলাফেরা করতে পারতেন না। কিন্তু ম্যানিলা থেকে ফিরে আসার পর তাকে লাঠি নিয়ে আস্তে আস্তে চলতেও দেখেছি। যেন আর কিছুদিন পরে তিনি আগের মতোই স্বাভাবিকভাবে হাঁটা-চলা করতে পারবেন। ওখান থেকে এরকম কথাই বলে দিয়েছিল। সোৎসাহে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তিনি ঐ অলৌকিক ঘটনার গল্প করেছিলেন।

কিন্তু কয়েকমাস যেতেই সেই ব্যাধি নবতম উদ্যম নিয়ে আক্রমণ করে। সে আক্রমণ তাকে সম্পূর্ণ পঙ্গু করে দেয়। ঘটনার শেষ পরিণতি দুঃখজনক হলেও সত্যি

তা সত্ত্বেও মনে নাছোড়বান্দা একটা প্রশ্ন উঁকি মারতে থাকে; রোগ না হয় পুনরাক্রমণ করল কিন্তু ওই সাময়িক সুস্থতা কিভাবে সম্ভব হয়েছিল? এর উত্তর সম্ভবত একটাই—মনের জোর আর বিশ্বাস। একটা ব্যাপার প্রসাদজীর কাছ থেকে শুনে অনুমান করা যায়। তার মাথার তলায় একটা বাইবেল রেখে তাকে, ক্রমশ রোগমুক্তি ঘটছে, এরকম চিন্তা করতে তাঁরা নির্দেশ দেন এবং সাথে সাথে তাঁরা যেটা করেন সেটাকে হিপনোটিক সাজেশান বলা যায়। সব মিলিয়ে তিনি মনে বেশ জোর পেয়েছিলেন। কিন্তু রোগের কারণ যেখানে বহুলাংশে দৈহিক সেখানে সাজেশন যে বেশিদিন কার্যকর হবে না, তা বলাই বাহুল্য। ওর ক্ষেত্রেও হয়েছে তাই।

সূত্রগ্রন্থ

১. John Taylet. *Science and the Supernatural* :

২. James Randi. *The Faith Healers*. Prometheus Book

৩. Frazier. Claude. *Faith Healing : Finger of God or Scientific Curiousity* (1973)

৪. Kuhlman. Kathryn. *Nothing is Impossible with God* (1974)

৫. Nolen William. *Healing : A Doctor in Search of a Miracle* (1974)

৬. James Randy. *Film Flam..*

সমীরকুমার ঘোষ

জুলাই '৮৯

টেলিপ্যাথি ও আইনস্টাইন

অতীন্দ্রিয়বাদীরা প্রায়শই টেলিপ্যাথি, পূর্বোপলব্ধি ইত্যাদি বিশেষ. ক্ষমতার অস্তিত্বের সমর্থক হিসেবে বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের নাম করে থাকেন। ১৯৩০ সালে প্রকাশিত আপ্‌টন সিনক্লিয়ারের টেলিপ্যাথি সংক্রান্ত বই *মেন্টাল রেডিও*-র ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন আইনস্টাইন স্বয়ং। এই ভূমিকাটিকে মূলধন করেই অতীন্দ্রিয়বাদীরা আইনস্টাইনকে তাদের সমর্থক হিসেবে চিহ্নিত করে এসেছেন বহুদিন ধরে। এমন কি এর থেকে আরো একধাপ এগিয়ে যে কথা আইনস্টাইন বলেন নি, বরং উল্টো কথাই বলেছেন, সেই সব কথাও তাঁর ওপর আরোপ করেছেন। যেমন ধরা যাক, পরামনোবিদ্যার জনক স্বরূপ জে. বি. রাইন-এর কথা। রাইনের টেলিপ্যাথি জাতীয় গবেষণা কাজ দেখে আইনস্টাইন নাকি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এইভাবে ক্রমাগত প্রচারের ফলে আইনস্টাইনকে অনেকে পরামনোবিদ্যার বিশেষ সমর্থক বলে মনে করতেন।

অথচ যে ভূমিকাটির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে আইনস্টাইনকে পরামনোবিদ্যার সমর্থক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে সেই ভূমিকাটি সম্পূর্ণ পাঠ করলে কিন্তু তেমন ধারণা হয় না।

আলবার্ট আইনস্টাইন সিনক্লিয়ারের *মেন্টাল রেডিও* আপ্‌টন লিখিত গ্রন্থের ভূমিকা

'আমি আপটন্ সিনক্লিয়ারের বইটি অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে পড়েছি এবং আমি নিশ্চিত যে, এটি শুধু সাধারণ মানুষেরই নয়, এ বিশেষজ্ঞ মনোবিজ্ঞানীদেরও মনোযোগ আকর্ষণ করার ক্ষমতা রাখে। টেলিপ্যাথি-সংক্রান্ত পরীক্ষাগুলির ফলাফল যে রকম সাবধানতা এবং সাবলীলতার সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে তা যে কোনো প্রকৃতি অনুসন্ধানকারীই গ্রহণযোগ্য মনে করবেন। অন্যদিকে আপ্‌টন্ সিনক্লিয়ারের মতো এত সচেতন একজন ব্যক্তি সচেতনভাবে প্রতারণার আশ্রয় নিতে পারে এ-কথা একেবারেই অবিশ্বাস্য; তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা ও নির্ভরশীলতা সন্দেহাতীত। অতএব এখানে বর্ণিত ঘটনাবলী যদি টেলিপ্যাথি না হয়ে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির মধ্যে অবচেতন সম্মোহনজনিত কোনো প্রতিক্রিয়ার ফলও হয়ে থাকে তবে সেটাও মনোবিজ্ঞানের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোনো ক্ষেত্রেই মনোবিজ্ঞানের উৎসাহীচক্রের উচিত নয় বইটিকে গুরুত্বহীন মনে করে দূরে সরিয়ে রাখা।'

এই ভূমিকাটি কোনো অবস্থাতেই কি প্রমাণ করে যে, আইনস্টাইন টেলিপ্যাথিতে বিশ্বাস করতেন? তিনি সিনক্লিয়ার বর্ণিত ঘটনাবলীর একটা বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা থাকার সম্ভাবনার কথাই বরং প্রকারান্তরে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু একটি ভুল তিনি অবশ্যই

করেছিলেন এবং তা হলো অতীন্দ্রিয়বাদ---এই বিষয়টির ওপর লেখা এই বইটির ভূমিকা লিখে দিয়ে।

এটি অবশ্যই একটি মারাত্মক ভুল, বিশেষভাবে আইনস্টাইনের মতো একজন বড়োমাপের বিজ্ঞানীর পক্ষে। এ-ব্যাপারটি কিন্তু আইনস্টাইন নিজেও বুঝতে পেরেছিলেন এবং নিজের ঘটানো এই ছোট্ট ঘটনাটির সুদূরপ্রসারী ফলাফল দেখে নিজেই বিস্মিত হয়ে পড়েছিলেন।

এরই ফলস্বরূপ আমরা পাই তাঁর লেখা দু-খানি চিঠি। দুটো চিঠিই লেখা হয়েছিল ১৯৪৬ সালে। হয়ত আরো এরকম চিঠি বা টুকরো লেখা এখানে সেখানে ছড়িয়ে থাকতে পারে যার খবর এখনো আমরা জানি না। কারণ, ১৯৪৬ সালে লেখা গুরুত্বপূর্ণ এই চিঠি দু-টি প্রকাশিত হয়েছে তার তিরিশ বছর পরে---১৯৭৭ এবং ১৯৭৮ সালে।

প্রথম চিঠি :

১৯৪৬ সালের ১৩ মে তারিখে আমেরিকা বসবাসকারী ব্রিটিশ মনোবিজ্ঞানী জান রেনওয়াল্ড (Jan Ehrenwald)-কে লেখা তাঁর একটি চিঠি পদার্থবিজ্ঞানী জন স্ট্যাচেল মারফত মার্টিন গার্ডনারের হাতে আসে। তিনি সে চিঠিটি *স্কেপটিক্যাল এনকোয়ারার* পত্রিকার একটি সংখ্যায় (১৯৭৭) প্রকাশ করেন।

১৩ই মে, ১৯৪৬

প্রিয় ডক্টর রেনওয়াল্ড

আমি অতি উৎসাহের সঙ্গে আপনার পুস্তকটির[১] ভূমিকা ও তৎসহ আমাদের আরো অনেকের মতো আপনারও যে সমস্ত অপ্রিয় ঘটনাবলীর অভিজ্ঞতা হয়েছে তা পড়লাম। আপনি যে এদেশে চলে আসতে পেরেছেন তার জন্য আমি আনন্দিত এবং আমি আশা রাখি আপনি এখানে অনেক ভালো কাজ করার সুযোগ পাবেন।

বেশ কয়েক বছর আগে আমি ডক্টর রাইনের বইটি পড়েছি। উনি যে সমস্ত ঘটনার কথা লিখেছেন তার কোনো ব্যাখ্যা আমি খুঁজে পাই নি। তথাকথিত টেলিপ্যাথি-সংক্রান্ত পরিসংখ্যানমূলক এই গবেষণার সাফল্য দুই ব্যক্তির মধ্যেকার দূরত্বে কোনোভাবেই যুক্ত নয়—এই ব্যাপারটি আমার কাছে এক বিরাট বিস্ময়। এই ব্যাপারটি আমাকে দৃঢ়ভাবে এইটেই ভাবায় যে, এ সমস্ত ঘটনাবলীর পেছনে কোনো নিয়মিত ভুলের আকর আছে।

আমি আপটন সিনক্লিয়ারের বইটির ভূমিকা লিখে দিয়েছিলাম লেখকের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কের খাতিরে এবং আমি সেখানে একদিকে যেমন আমার প্রত্যয়ের অভাবের কথাও প্রকাশ করি নি তেমনি আবার কোনো অসৎ মন্তব্যও করি নি। ঐ সমস্ত ঘটনাবলীর প্রতি আমার সন্দেহবাতিকতার কথা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। এই সন্দেহবাতিকতা ঐ সমস্ত বিষয়ের ওপর গবেষণার ফলশ্রুতি হিসেবে আমার মধ্যে জন্মায় নি,

জন্মেছে আমার আজীবন পদার্থবিজ্ঞান সান্নিধ্যের জন্য। এ ছাড়াও আমি এ কথাও জানাতে চাই যে, আমার নিজের জীবনে এমন কোনো ঘটনাই ঘটে নি যা স্বাভাবিক মন-প্রক্রিয়ার বাইরের কোনো বিশেষ প্রক্রিয়ার সম্ভাবনার ওপর আলোকপাত করতে পারে। আমি এর সঙ্গে আরো যোগ করতে চাই যে, জ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে আমার অজ্ঞতার কথা মাথায় রেখে আমার প্রতিটি কথার ওপর যতটা গুরুত্ব আরোপ করা উচিত সাধারণ মানুষ তার থেকে অনেক বেশি গুরুত্ব আরোপ করে ফেলেন। এই কারণেই এই বিষয়টির ওপর আমার অতিরিক্ত সতর্কতার সঙ্গে কোনোরকম মন্তব্য করা উচিত বলে আমি মনে করি। অবশ্য আপনার বইটির একটি কপি পেলে আমি খুব আনন্দিত হব।

শ্রদ্ধাসহ
অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

এই চিঠিতে তিনি রাইন সম্পর্কে পরিষ্কার বক্তব্য রেখেছেন। তিনি রাইন-কে প্রতারক না বলে নিচুমানের গবেষক বলেছেন, কারণ—গবেষণায় একটা ভুলের উৎস কোথাও রয়েছে এ-ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত। এটা কি রাইনের জন্য প্রশংসাসূচক কোনো মানপত্র?

সিন্‌ক্লিয়ারের বই-এর ভূমিকা লিখে দেবার ব্যাপারটা তিনি যথেষ্ট পরিষ্কার করে বুঝিয়েছেন এবং নিজের ভুলও তিনি বুঝতে পেরেছেন। কোনো প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির যে কোনো কথার যে অপরিসীম মূল্য এ-ব্যাপারে তাঁর পরিষ্কার অভিজ্ঞতার কথা তিনি ব্যক্ত করেছেন এবং নিজের দায়িত্বের কথাটাও স্বীকার করেছেন অকপটে।

কিন্তু আমাদের যা আরো অবাক করে দেয় তা হলো অতীন্দ্রিয়বাদীদের প্রতারণার মাত্রা। তারা ১৯৩০ সালে লেখা আইনস্টাইনের একটা বিতর্কযোগ্য ভূমিকাকে সরাসরি ব্যবহার করে বিশ্ববাসীর সামনে আইনস্টাইন এবং তৎসহ সমস্ত যুক্তিবাদী বিজ্ঞানীদের ভাবমূর্তি ভেঙে দেবার ঘৃণ্য চেষ্টা চালিয়ে গেছেন এবং আজও চেষ্টা চালাচ্ছেন, পরিণত বয়সে তাঁরই লেখা পরিষ্কার বক্তব্যগুলোকে স্রেফ চেপে গিয়ে।[২] ১৯৪৬ সালের এই চিঠিটি, আগেই লিখেছি, প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে।

দ্বিতীয় চিঠি :

ডক্টর রেনওয়াল্ড তাঁর একটি বই-এর কপি আইনস্টাইনকে পাঠান ভূমিকা লিখে দেবার অনুরোধ করে। এর উত্তরে তিনি ৪ জুলাই ১৯৪৬ মি. রেনওয়াল্ডকে যে চিঠিখানি লেখেন তাতে তিনি পরামনস্তত্ত্ব নিয়ে আরো মন্তব্য করেন।

'আমি আপনার বইটি[৩] অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে পড়লাম। বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টিকে উপস্থাপিত করার এটি নিঃসন্দেহে একটি উত্তম পদ্ধতি এবং আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, বইটি ব্যাপক পাঠকের হাতে পৌঁছে যাবে। আমি নিতান্তই একজন সাধারণ অবিশেষজ্ঞ পাঠকের চোখেই বইটির বিচার করতে সক্ষম।'

অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে এই কথাকটি লেখার পর আইনস্টাইন মূল বইটির অতীন্দ্রিয় ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই সাধারণ যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিয়েই ঘটনাগুলো ব্যাখ্যা করা যায়। এবং শেষে লিখেছেন—

> '...আমি এর ভূমিকা লিখতে পারছি না কারণ আমি নিতান্তই অযোগ্য। একজন অভিজ্ঞ মনোবিজ্ঞানীরই এ কাজটি করা উচিত। আপনি এ চিঠিটি ব্যক্তিগতভাবে অন্যকেও দেখাতে পারেন।'

১৯৪৬ সালে লেখা এ চিঠিটি রেনওয়াল্ড মার্টিন গার্ডনারকে দেখান ১৯৭৭ সালে। ১৯৭৮ সালে এটি প্রকাশিত হয়।

এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। অবৈজ্ঞানিক কাজেকর্মে বিজ্ঞানীদের টেনে আনা আগেও অনেক হয়েছে, এখনো হচ্ছে। বর্তমান বিশ্বে আরেকটি নতুন উপদ্রব শুরু হয়েছে। অতীন্দ্রিয়বাদীরা উল্লাসে আত্মহারা হয়ে প্রচারের রণাঙ্গনে নেমে যান যখন— এক, কোনো বিজ্ঞানী তাদের সমর্থনে কোনো কথা বলেন বা বলে ফেলেন এবং দুই, কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশে যদি এ-জাতীয় কোনো কাজ হচ্ছে বলে শোনা যায় বা সে-সব দেশের লোকেরা যদি এ-বিষয়ের সমর্থনে কোনো কথা বলেন। এবং এই দু-জাতীয় ঘটনাই বিরল নয়। রাশিয়ার প্রেতচর্চা কিংবা অতীন্দ্রিয় গবেষণার সামাজিক প্রতিক্রিয়া মারাত্মক। পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি, বিশেষ করে পোল্যাণ্ডও সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে। এসব দেশের এ-জাতীয় ঘটনার খবর এদেশের কাগজে মাঝে মাঝেই আমরা পেয়ে থাকি।

উল্লেখপঞ্জী :

১. Dr. Jan Ehrenwald এর *Telepathy and Medical Psychology* (London. Allen and Unwin. 1947) বইটির কথা বলা হয়েছে

২. Dr. J.B. Rhine সম্পর্কে আইনস্টাইনের ধারণাটি উল্টো করে যারা বলেছেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য R.A. McConnell . ঐ *Parapsychology and Physicists. J. of Parapsychology.* Vol. 40. Sept. 1976.

৩. J.Ehrenwald. *Telepathy and Mental Psychology* (Allen & Unwin. 1947)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : Martin Gardner. *Science : Good. Bad and Bogus.* Oxford University Press. 1934.

অপবিজ্ঞান, অস্ট্রেলিয়া, এবং.........

হ্যারি এডওয়ার্ডস্ National Austrilian Sceptics-এর সচিব এবং সঙ্ঘের ত্রৈমাসিক পত্রিকা *The Skeptic*-এর যুগ্ম সম্পাদক। অলৌকিক ঘটনা, অতীন্দ্রিয় শক্তিধরদের কীর্তিকলাপ, অন্ধ ঈশ্বরবিশ্বাস, ও রহস্যময় 'অবিশ্বাস্য'দের পিছু ধাওয়া করে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ দিয়ে সত্য উদঘাটন করা সঙ্ঘ-সদস্যদের নেশা এবং স্বনামখ্যাত বুজরুক ও ফন্দিবাজদের আসল চেহারা প্রকাশ করা এদের প্রয়াস ও প্রতিজ্ঞা। হ্যারির বয়েস হয়েছে ৬৩ বছর। অভিজ্ঞতা প্রচুর। প্রায় ১৯৫৩ সাল থেকে একনিষ্ঠভাবে কাজ করছেন, স্বীকৃতিও পেয়েছেন পর্যাপ্ত—দেশে-বিদেশে।

হ্যারি এডওয়ার্ডস্ সপরিবারে ভারত ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন মাস দুয়েক আগে. কলকাতা হয়ে ফিরে গেলেন গত ৮ নভেম্বর '৯০। ভারতের ৭টি প্রদেশের প্রায় ১৭টি অঞ্চলে ভ্রমণ, প্রদর্শনী, সভা করেছেন। এই কর্মসূচির সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন দক্ষিণ ভারতের সুপরিচিত যুক্তিবাদী, ভারতীয় নিরীশ্বরবাদী (sceptic) বিজ্ঞান সংগঠনের আহ্বায়ক বি. প্রেমানন্দ্ এবং কলকাতায় ওরা এসেছিলেন *উৎস মানুষ*-এর অতিথি হয়ে। কর্মব্যস্ততার ফাঁকে যেটুকু আলাপের সুযোগ হয়েছে তাতে মন ভরে নি ঠিকই, তবু কিছু কথা *উৎস মানুষ*-এর পাঠকদের কাছে বলা যায়।

প্রতিবেদক ॥ কলকাতা শহরে এসে প্রথমেই আপনাদের প্রতিক্রিয়া কেমন হলো?

হ্যারি ॥ ভিড়। অসম্ভব লোক, আর যানবাহনের ভীষণ জট। মনে হয় গোটা অস্ট্রেলিয়ায় যত লোক আছে, কেবল কলকাতারই লোকসংখ্যা তার চেয়ে বেশি ছাড়া কম হবে না।

প্রতিবেদক ॥ আপনাদের আসার দিনক্ষণ নিয়ে কিছু অনিশ্চয়তা ছিল বলে প্রাথমিক প্রস্তুতি ভালোমতো নিতে পারি নি আমরা, ফলে প্রথমটায় আপনাদের কিছু হয়রান হতে হয়েছে, এজন্য খুবই খারাপ লাগছে। কিন্তু এখানে আসার আগে একটা খবর দেন নি কেন?

হ্যারি ॥ দিয়েছিলাম। দিল্লী থেকে টেলিগ্রাম করেছি পাঁচদিন আগে। এখনো দেখছি আসে নি। ...প্রকৃতিতে ঘটে যাওয়া বহু মামুলি 'কয়েনসিডেন্স' বা কাকতালীয় ঘটনাকে সুযোগ সন্ধানীরা সময় সময় ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে 'মিরাক্‌ল্' বলে প্রচার করে। একটু খতিয়ে দেখলেই কিন্তু প্রকৃত রহস্যটা জানা যায় সব ক্ষেত্রে।

প্রতিবেদক ॥ আপনাদের নেশা তো মিরাক্‌ল্ বা অতি-প্রাকৃতের পিছু ধাওয়া করা।

তা, এ কাজে যথেষ্ট কর্মী পাওয়া যায়। আপনাদের সংস্থার সাংগঠনিক চেহারাটা কেমন?

হ্যারি ॥ সংগঠন বলতে আমাদের 'স্কেপটিক্স্' সংঘ। এখানে সারাক্ষণের তরুণ কর্মী বিশেষ নেই। আমি অবসরপ্রাপ্ত লোক, অবকাশ থাকে আমার। এরকম কয়েকজন স্বেচ্ছাব্রতী আছেন। তবে সেরকম প্রয়োজনে, কোথাও প্যারানরম্যাল (paranormal) বা অলৌকিক দাবি অনুসন্ধানের দরকার হলে বিশেষজ্ঞের সাহায্য পেতে অসুবিধা হয় না, সহজেই 'টিম' তৈরি হয়ে যায়। এছাড়া আমাদের মুখপত্র *THE SKEPTIC* নিয়মিত প্রকাশ করাটাও অন্যতম সাংগঠনিক কাজ। এটা প্রধানত আমাকেই দেখতে হয়, তবে অনেক কাজই পেশাদারি পদ্ধতিতে করিয়ে নিই।

প্রতিবেদক ॥ সেখানে তো অর্থের প্রশ্ন আছে। আপনাদের অনুসন্ধানমূলক কাজ ও পত্রিকা প্রকাশের খরচ-খরচা কীভাবে মেটে?

হ্যারি ॥ প্রধানত সদস্য চাঁদা আর পত্রিকার গ্রাহক চাঁদা থেকে উঠে আসে। কিছু ব্যাক্তিগত অনুদান আছে। এজাতীয় কাজে সরকারি কোনো অনুদানের ব্যবস্থা আমাদের নেই। অন্যান্য কিছু সমস্যা থাকলেও অর্থাভাব আমাদের সংস্থার কোনো সমস্যা নয়।

প্রতিবেদক ॥ আচ্ছা আমেরিকার বাফেলোতে যে অনুরূপ একটা বড় সংগঠন রয়েছে CSICOP (Committee for Scientific Investigation of Claims of Paranormal), যার কথা বাঙালী পাঠক কিছু কিছু জানেন তাদের সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ কেমন?

হ্যারি ॥ বলতে পারেন সহোদরা সংস্থা (sister concern)। আমাদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্মপদ্ধতি প্রায় একই, তবে ভৌগোলিক ও অন্যান্য কারণে যৌথভাবে কাজ করা সম্ভব হয় না। এরকম অনেক সংস্থাই বিভিন্ন দেশে রয়েছে যারা স্বনির্ভরতায় আলাদাভাবে কাজ করে চলেছে।

প্রতিবেদক ॥ ঠিক কী ধরনের অলৌকিক ঘটনা বা ঐশ্বরিক শক্তির কথা বেশি শোনা যায় অস্ট্রেলিয়ায়? আমাদের এখানে যেমন মন্ত্রতন্ত্র ঝাড়-ফুঁক জ্যোতিষ হস্তরেখা স্বপ্নাদ্য ওষুধ গুরু-বাবার দৈব-ক্ষমতা জাতিস্মর প্রেতচর্চা দশা-সমাধি ইত্যাদির প্রভাব-প্রাদুর্ভাব বেশি, ওখানে 'অতি-প্রাকৃতে'র চেহারা কেমন?

হ্যারি ॥ আসলে দুটো দেশের সামাজিক অবস্থা, অর্থনৈতিক গড়ন তো আলাদা, তাই মানুষকে প্রভাবিত ও প্রতারিত করার পদ্ধতিতে ফারাক নিশ্চয়ই থাকবে। কিন্তু মৌলিক চরিত্রটা অবশ্যই এক। যেমন মন্ত্রতন্ত্র আমাদের ওখানে নেই কিন্তু টেলিপ্যাথি ক্লেয়ারভয়েন্স (আলোকদর্শন)-এর মতো অতীন্দ্রিয় শক্তি (ESP) আছে, আছে সাইকোকাইনেসিস বা মনঃসংযোগশক্তি। জ্যোতিষ আছে আরো আধুনিকতার মোড়কে—কম্পিউটার ও নিউমারোলজির সঙ্গে

মিশেল দিয়ে। জাতিস্মরের মতো আছে রি-ইনকারনেশন। স্বপ্নাদ্য ওষুধ না থাকলেও সাইকিক সার্জারি আছে। প্রেতচক্র বা উইজা বোর্ড-এর প্রচার আমেরিকায় বেশি। আমাদের ওখানে সম্প্রতি উফো (UFO) বা উড়ন্ত চাকির চমক ছড়ানো হচ্ছে আবার।

প্রতিবেদক ॥ বলুন না, এরকম কোনো সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা যদি থাকে।

হ্যারি ॥ এই তো, আমি ভারতে আসার কয়েকমাস আগে এরকম উফো-র কাণ্ড ফাঁস করা হলো। ওখানকার সব কাগজেই বেরিয়েছিল [ব্যাগ থেকে সংবাদপত্রের কাটিং বের করলেন]। এই যে গোল গোল বিশাল গর্ত, নিখুঁত বাটির মতো, এগুলি নাকি রাতারাতি গ্রহান্তরের যান এসে করে দিয়ে গেছে। দাবিদাররা বেশ কয়েকটি অঞ্চলের ফাঁকা মাঠের ভেতর ওরকম 'অলৌকিক গর্তে'র ছবি কাগজে বের করেছিল। আমরা, স্কেপটিক সঙ্ঘের সদস্যরা খবর অনুসারে একে একে সব কটা জায়গায় গেলাম আর খানিকটা ঘোরাঘুরি করতেই দেখলাম এ স্রেফ ফটোগ্রাফির জালিয়াতি। প্রত্যেকটি গর্তের দুপাশে টানা সমান্তরাল দাগ রয়েছে মাটিতে, একেবারে ট্রাক্টর-জাতীয় কোনো যন্ত্র চলার দাগ। এবং গর্তের পরিধি বরাবর লিভার দিয়ে ঘুরে ঘুরে গর্ত তৈরি করার স্পষ্ট চিহ্ন দেখা গেল। প্রচারিত 'অলৌকিক' সংবাদে কায়দা করে পাশের সমান্তরাল দাগ বাদ দিয়ে কেবল গোল গর্তের ছবিগুলো ছাপা হয়েছে। মানুষকে বিভ্রান্ত করার দারুণ কায়দা।

প্রতিবেদক ॥ আপনার স্ত্রী ভার্জিনিয়া তো ফিলিপাইনের মেয়ে। আমরা শুনেছি ফিলিপাইনে সাইকিক সার্জারির বেশ পসার। অলৌকিক শক্তিধর চিকিৎসকেরা বিনা অস্ত্রে অপারেশন করে সেখানে, কোনো আশ্চর্য উপায়ে খালি হাতে পেট কেটে টিউমার বের করে আনে তারা, দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় হয়ে যায় নাকি [দ্র.— *উৎস মানুষ*, জুলাই ১৯৮৯ সংখ্যা]। এ-ব্যাপারে আপনার অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই আছে।

হ্যারি ॥ হ্যাঁ, একেবারে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। বছর দুয়েক আগে আমি এদের দেশে (ফিলিপাইন), মানে আমার শ্বশুরবাড়ির দেশ আর কি, গিয়ে ওরকম এক চিকিৎসকের চেম্বারে নিজেই গিয়েছিলাম রোগী সেজে। বেডে শুইয়ে ডাক্তার আমার শরীরেও অস্ত্রোপচার করেছিল। বেশ রোমাঞ্চকর ব্যাপার। ছুরি-কাঁচি নেই, ক্ষত তৈরি হচ্ছে, রক্ত পড়ছে, আবার ক্ষত জোড়াও হচ্ছে বিনা সেলাইতে। খুবই নিপুণ কৌশল, তবে চেষ্টা করলে কায়দাটা আয়ত্ত করে নেওয়া কঠিন নয়। কুশলী হাতের কাজ লাগে, আর লাগে একজন দক্ষ সহকারী। ব্যস, আর কিচ্ছু না। আমি সাইকিক সার্জারির কৌশলটা আয়ত্ত করেছি আর আমার দেশে সিডনিতে এর প্রদর্শনীও করেছি। ওখানে আমার সহকারী ছিল ভার্জিনিয়া—(কৌতুকের সুরে) সে অবশ্য তার দেশীয় ঐতিহ্যের বিরোধিতাই করেছিল।

প্রতিবেদক ॥ আচ্ছা, আপনার কী মনে হয়, এত ব্যাপক সংখ্যক মানুষ কেন অলৌকিকে বিশ্বাস করে, দৈবশক্তি বা অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার প্রতি অন্ধভাবে নির্ভর করে। কেন কুসংস্কার ধরে রাখে? কী কারণে?

হ্যারি ॥ মৌলিক কারণটা অবশ্যই সামাজিক ও মানসিক বলে মনে হয়। আমি অস্ট্রেলিয়ার কথা বলতে পারি, সেখানে অধিকাংশ মানুষই সচ্ছল। সমাজটাও আধুনিকতার বিচারে উন্নত বলা চলে। ব্যবহারিক জীবনে অনেক কিছু পেয়েও আত্মিক জীবনে, ধর্মীয় ভাবনায় অধিকাংশ মানুষ প্রায়শই নিজেকে রিক্ত বঞ্চিত মনে করে। একটা মানসিক নির্ভরতার জায়গা খোঁজে তারা প্রতিনিয়ত। আর তখনই বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রবক্তারা, অতীন্দ্রিয় ধারণার প্রচারকেরা তাদের ফায়দা তুলে নেওয়ার চেষ্টা করে। অনেক মানুষকে কোনো এক অযৌক্তিক বিশ্বাসের প্রভাবে এনে ফেলতে পারলে বিরাট লাভ— ক্ষমতা, যশ, অর্থ অনেক কিছু। সেইজন্যই আমার মনে হয় ওইসব অসৎ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অপকীর্তি বন্ধ করতে হলে, মানুষকে তাদের আত্ম-প্রতারণা সম্পর্কে সজাগ করতে হলে ঈশ্বর-বিশ্বাসে আঘাত করতে হবে। কোনো কিছুর ওপর অন্ধভাবে নির্ভর করাটাই প্রধান বিপদ। একজন খ্রিস্টান যাজক তার প্রদর্শনীতে এক্স-রে প্লেট দেখিয়ে বলছেন— তাঁর মাথায় মস্ত টিউমার ছিল, কেউ সারাতে পারে নি। শেষে প্রভু যিশু এক নির্ধারিত রাতে আবির্ভূত হয়ে সে টিউমার বের করে নিয়ে যান। প্রমাণস্বরূপ সেই যাজক সর্বসমক্ষে তার মাথার ডানদিকে গোল অপারেশন চিহ্ন দেখান। দর্শকেরা অভিভূত। অথচ এ-প্রশ্নটা কেউ করল না যে, প্রভু যিশু তার ঐশ্বরিক কৃপায় এতটাই যদি করলেন তাহলে বেচারার মাথায় আবার অপারেশনের কষ্ট দিলেন কেন, সর্বশক্তিমানের পক্ষে একটা টিউমার হাওয়া করে দেওয়া কি খুব কঠিন কাজ ছিল?.......এই যে ধর্মবিশ্বাসের দৈন্য, শূন্যতা, আমরা এটাকেই বড় ব্যাপার বলে মনে করি। অবশ্য তোমাদের এই ভারতবর্ষের পটভূমি তো আলাদা, এখানে বোধহয় দারিদ্র একটা বড় কারণ। তোমরা কী মনে কর?

প্রতিবেদক ॥ কেবল দারিদ্রকে আলাদাভাবে চিহ্নিত না করে বড় অর্থে সামাজিক-অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাবের কথা বলা উচিত। আমাদের এখানে দরিদ্র অসহায় মানুষ যেমন কুসংস্কার আর ভূত-ভগবানে ভরসা খোঁজে, তেমনি আবার সচ্ছল শিক্ষিত মানুষও তাদের চেতনায় অযৌক্তিক, অমানবিক, অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাসের শিকার হয়ে বসে আছে। এবং এসবের পেছনে এক নিপুণ রাজনৈতিক যোগসূত্র কাজ করছে। আচ্ছা, আপনারা অস্ট্রেলিয়ান নিরীশ্বরবাদীরা (Sceptics) যে কাজ করে চলেছেন তার রাজনৈতিক তাৎপর্য কতটা? মানে আপনাদের কাজের সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার সংযোগ কতখানি?

হ্যারি ॥ আমরা রহস্য-উন্মোচন ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালাই। রাজনীতির লোকেরা

তাদের নিজেদের কাজ করেন। দুয়ের বিশেষ সম্পর্ক আমাদের ওখানে নেই। আমেরিকার CSICOP সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে বোধ হয়। তবে আমার মনে হয়, তোমাদের এই ভারতে বিষয়টা একেবারেই অন্যরকম, তাই না?

প্রতিবেদক ॥ হ্যাঁ, অন্যরকমই বটে। আমরা কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার বিরোধিতা আর রাজনীতি— এ দুটোকে একদম আলাদাভাবে দেখতে পারি না, দেখা সম্ভব নয়। কেন না এখানে রাজনৈতিক শক্তিগুলি মানুষের কুসংস্কার ধর্মবিশ্বাস আর অবৈজ্ঞানিক ধারণাকে ভীষণভাবে কাজে লাগায়। স্পষ্ট উদাহরণ আপনার কাছেই রয়েছে। টেম্পল্ আর মসজিদ নিয়ে অযৌক্তিক উন্মাদনা কত ভয়ঙ্কর এবং শক্তিশালী রাজনৈতিক চেহারা নিতে পারে সে তো আপনারা দিল্লী, ইউ পি, গুজরাটে নিজে চোখেই দেখে এলেন। স্রেফ একটা ধর্মীয় 'ইস্যু' একটা গোটা মন্ত্রিসভার পতন ঘটিয়ে দিতে পারে—একি আপনাদের দেশের প্রেক্ষাপটে ভাবতে পারেন? [প্রসঙ্গ— রাম মন্দির বাবরি মসজিদ সংঘাত, ১৯৯০]

হ্যারি ॥ হ্যাঁ, এটা ভীষণরকম সত্যি। এবং এটাও সত্যি যে, গণচেতনার কাজ নির্দিষ্ট একটা ছকে বাঁধা হয়ে চলে না, দেশ কাল সমাজ ও সংস্কৃতি অনুসারে কাজের চরিত্র নিরূপণ করে নিতে হয়। এ-প্রসঙ্গে আমার আরেকটা চিন্তার কথা বলি, বলতে পারেন দুর্ভাবনার কথা।..........আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, আমাদের এই সত্য-উদ্ঘাটনের কাজ, মানুষের চেতনা বিকাশের প্রয়াস, এতে আদৌ কি মানুষের চিন্তার উন্নয়ন ঘটে? কেন না, অধিকাংশ মানুষ তো স্বভাবত রহস্যপ্রিয়। দেখবেন, কোনো আশ্চর্য অলৌকিক বিষয়ে মানুষ যত সহজে ব্যগ্র কৌতূহলী হয়, ততটা আগ্রহ বা কৌতূহল যুক্তিশীল ও বিজ্ঞানসম্মত বিষয়ের প্রতি দেখা যায় না। আসলে সভ্যতার সেই আদি লগ্নে যখন বিজ্ঞান ছিল না, কার্যকারণ ধারণা ছিল না, তখন প্রাকৃতিক ঘটনা-দুর্ঘটনাকে মানুষ নিরেট বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছে আর রোমঞ্চিত হয়েছে। অজানা শক্তি বা অতিপ্রাকৃতের প্রতি মানুষের ভয়-ভক্তি-মোহ হয়ত মস্তিষ্কের গভীরে গেঁথে গেছে। যে-কারণে আজও মানুষ বিস্মিত হতে ভালোবাসে। এরকম কিছু কথা মনস্তাত্ত্বিকেরাও বলেন। তাই একটা দ্বিধা বা প্রশ্ন আমার মনে এসেই যায় যে, মস্তিষ্কের গভীরে লালিত সেই প্রবণতাকে স্থায়ীভাবে কাটিয়ে ওঠা সত্যিই কি সম্ভব?

প্রতিবেদক ॥ প্রশ্নটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞান চেতনা বিকাশের কাজ করতে গিয়ে এরকম চিন্তা আমাদেরও মনে আসে, আসাই স্বাভাবিক। তবে এর একটা গ্রহণযোগ্য উত্তরও পাওয়া যায় কিন্তু! দেখুন, মানুষের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া, বিশ্বাস, ধারণা, মূল্যবোধ—এগুলো তো ঝপ্‌ঝপ্ করে একটা-দুটো পর্যায়ে গড়ে ওঠে নি, বরং সেই আদিকাল থেকে যুগ যুগ ধরে নানা প্রাকৃতিক-

সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ওই বৈশিষ্টগুলো মাথায় জমা হয়েছে। ফলে, যদি আবার দীর্ঘমেয়াদি কোনো সামাজিক-সাংস্কৃতিক-বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডল রচনা করা যায়, যেখানে প্রাচীন ভুলভাল ধারণার বিপরীতে সঠিক ধারণা তৈরির চেষ্টা চলবে লাগাতার, তাহলে আবার নিশ্চয়ই মানুষের মনের ভেতর দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যে দিয়ে পরিবর্তিত ধ্যান-ধারণা জন্ম নেবে। এই গতিশীল প্রক্রিয়াই তো আসল চাবিকাঠি, তাই না? এ পদ্ধতি প্রমাণিতও বটে সমাজবিকাশের নানা ক্ষেত্রে। সেইজন্য আমাদের কাজ হওয়া দরকার একটানা, দীর্ঘমেয়াদি। হাতে হাতে ফল হয়তো মিলবে না, কারণ যা গড়ে উঠেছে বহুযুগ ধরে, তা পাল্টাবেও ধীরে ধীরে। একটা-দুটো কৌশল ফাঁস করে বা প্রদর্শনী করেই বিশ্বাস পাল্টে দেওয়ার আশা করা অমূলক। এ কাজকে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত পর্যায়ে আটকে না রেখে ব্যাপক আন্দোলনের স্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে। তা না হলে বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি রচনা হওয়া এবং প্রতিনিয়ত মানুষের চিন্তা-ভাবনায় সংঘাত ঘটানো সম্ভব হবে না, ফলে মৌলিক পরিবর্তনও হবে না এরকমই মনে হয়।

হ্যারি ॥ তোমাদের এই উপলব্ধি খুবই যুক্তিযুক্ত লাগছে আমার কাছে। আমাদের দেশের অনুসন্ধানমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে স্থায়ী পরিবর্তন ঘটানো আমাদেরও প্রত্যাশা। সেই অর্থে আমরা একই নৌকোর যাত্রী বলা যায়। তাই নয় কি?

প্রতিবেদক : অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

ডিসেম্বর ১৯৯০

বিশ্বজুড়ে সর্বত্র অবতারবাদের স্বরূপ একই

১৯ এপ্রিল, ১৯৯৩।

মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফ বি আই-এর সঙ্গে ৫১ দিন ব্যাপী যুদ্ধের পর এদিন সকালে পরাজয় স্বীকার করলেন টেক্সাসের 'যীশু' ডেভিড কোরেশ। ওয়াকো-র আশ্রমে প্রোপেন ভর্তি পিপেতে অগ্নিসংযোগ করে গণ-আত্মহত্যা করলেন ৮৬ জন শিষ্য-শিষ্যাকে নিয়ে। হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন নবনির্বাচিত মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটনসহ আরও অনেকে। কিন্তু কোরেশের পাগলামি কতকগুলি পুরনো প্রশ্নকে আবার সামনে এনে দিল। আমেরিকা গত কয়েক দশকে কম উন্মাদ ধর্মগুরুর উত্থান-পতন দেখল না। ঈশ্বরপুত্রদের আবির্ভাব, তাদের আইনভাঙা আচরণ এবং অনেক ক্ষেত্রেই সদলে ধ্বংস—এই ছক মোটামুটিভাবে পরিচিত হয়ে গিয়েছে। ইতিহাস কেন বারবার পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছে, অতীতের ভ্রান্তি কেন ভবিষ্যতের শিক্ষা হয়ে উঠছে না—এ নিয়ে তাই প্রশ্ন উঠছে।

ডেভিড কোরেশ সম্পর্কে যেটুকু জানা গিয়েছে তা হলো—তার আসল নাম ভার্নন হাওয়েল। ডেভিড নামটি পরবর্তীকালে বাইবেল-এর 'পুরাতন নিয়ম' থেকে সংগ্রহ করা। কোরেশের অল্প বয়সে তার বাবা-মা-র মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে যায়। সে তার মা-র কাছে চলে আসে। তারপর শিকড়হীন পরগাছার মতো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বড় হয়ে ওঠা। শোনা যাচ্ছে—ডেভিড যে ঈশ্বরপ্রেরিত এক মহান পুরুষ এ ধারণা বদ্ধমূল করে বালকটির মাথায় গেঁথে দেবার কাজটি করেছিলেন স্বয়ং তার জননী। ছেলেবেলা থেকেই ডেভিড কোরেশ ঘন্টার পর ঘন্টা প্রার্থনা করতে অভ্যস্ত এবং পড়াশুনোতে ভালো না-হলেও বাইবেল তার কণ্ঠস্থ ছিল।

১৯৮৪ সালে কোরেশ একটি খ্রিস্টান সংগঠনের প্রধান হয়ে বসে। ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে ধর্মগুরুসুলভ কথাবার্তা বলা—আমিই খ্রিস্ট পৃথিবীর সমস্ত মানুষের পাপ কাঁধে নিয়ে নিহত হওয়া আমার ভবিতব্য। কোরেশের মতোই ছিন্নমূল মানুষের দল দ্রুত ভিড় জমাল তার পাশে। কিছুদিন বাদে কোরেশের আরেক উপলব্ধি ঘটে যে, সে-ই স্বয়ং ঈশ্বর। তার আশ্রমের বিরুদ্ধে যখন অভিযোগ ফেঁপেফুলে উঠছে তখন একদিকে ঈশ্বরের গায়ে হাত তোলার পরিণাম সম্পর্কে যেমন মার্কিন প্রশাসনকে সতর্ক করে দিয়েছিল সে, তার পাশাপাশি সম্পূর্ণ সন্ত্রাসবাদীসুলভ ঢঙে জানিয়ে দিতে ছাড়ে নি, আশ্রমে জোর করে প্রবেশ করতে চাইলে এফ বি আই বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার পাবে না। কিন্তু কার্যত দেখা গেল 'ঈশ্বর' হার মানলেন, অগ্নিদগ্ধ হয়ে বিদায় নিলেন পৃথিবী থেকে।

পাপীতাপী মানুষের দুঃখকষ্টকে ঠিকভাবে বুঝে ওঠার জন্য ডেভিড কোরেশ

যে পদ্ধতি নিয়েছিল তা এককথায় অভাবিত। 'নিজে সবরকম পাপ না-করলে পাপীদের বুঝব কি করে?'—এই হলো তার বক্তব্য? তার আশ্রম আর্মাগেডন র‍্যাঞ্চে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র, দেহব্যবসা, মাদকদ্রব্য প্রভৃতি সবকিছুর ঢালাও আয়োজন ছিল যাতে পাপীর দুঃখ বুঝতে 'ভগবানে'র কোনোও অসুবিধে না-হয়! এসব নিষিদ্ধ কাজকর্মের বিরুদ্ধে অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশি অভিযান পরিচালিত হয়। দীর্ঘ ৫১ দিন আশ্রম অবরোধ করে রাখার পর ১৯ এপ্রিল ভোরবেলা এফ বি আই এজেন্টরা জোর করে ভিতরে যাবার চেষ্টা করলে ঘটে যায় গণ-আত্মহত্যার মর্মান্তিক ঘটনা।

কোরেশ-প্রসঙ্গ যেখানে আলোচনা হচ্ছে, সেখানে অনিবার্যভাবে আসছে তার পূর্বসূরী জিম জোনস্-এর কথা। ১৯৭৮ সালে দক্ষিণ আমেরিকার গায়ানাতে জোনসের সশিষ্য আত্মহনন প্রশ্ন তুলেছিল আমেরিকার বর্তমান প্রজন্মের মানসিক সুস্থিরতা নিয়ে।

জেমস ওয়ারেন জোনসের জন্ম ইণ্ডিয়ানা রাজ্যের লিন শহরে, যে শহরের কুখ্যাতি জাতিবিদ্বেষী গুপ্তদলের ঘাঁটি হিসেবে। জোনসের নেতৃত্ব দেবার একটা সহজাত ক্ষমতা এবং মৃত্যুর প্রতি এক অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল। 'জীবন পাপ, মৃত্যু পূণ্য; আমি আদেশ দিলে বিনা প্রশ্নে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করবে'—এরকম বক্তব্য তার অসংখ্য বক্তৃতায় বারবার ফিরে এসেছে। ব্যবসাসূত্রে হাতে কিছু পয়সাকড়ি জমা মাত্র তার মধ্যে দেখা দিল ধর্মগুরু সাজার প্রবণতা। একটি পরিত্যক্ত গির্জা কিনে নিয়ে 'পিপলস টেম্পল সেক্ট' নামে ধর্মসম্প্রদায় সে প্রতিষ্ঠা করল। প্রথমদিকে সব সদস্যই ছিল হতদরিদ্র আমেরিকান নিগ্রো—তাদের দু-বেলা খেতে-পরতে দিয়ে এবং কথার চাতুরিতে মোহিত করে ফেলল জোনস। পরবর্তীকালে ক্যালিফোর্নিয়ার রেডউড ভ্যালিতে প্রতিষ্ঠিত হয় জোনসের আশ্রম, এ-সময় সে রাজনীতিতেও প্রবেশ করার চেষ্টা করে।

কিন্তু রেডউড ভ্যালির আশ্রম যে সবরকম অপরাধমূলক কাজকর্মের আখড়া এটা ফাঁস করে দেয় কিছু স্থানীয় সংবাদপত্র। আইনের নাগাল এড়াতে জোনস ক্যালিফোর্নিয়া ত্যাগ করে দক্ষিণ আমেরিকার গায়ানাতে হাজির হয়। এখানে জোনসটাউন কলোনিতে ধর্মব্যবসা রমরম করে জমে ওঠে। গৃহহীন, দুঃখী, নিঃসহায় মানুষের প্রতি জিম জোনসের উদার আহ্বান ছিল, 'আমার কাছে এস, আমি তোমাদের দুঃখ লাঘব করব।' মাদকাসক্ত বা নৈরাশ্যে নিমজ্জিত নরনারী জোনসের মায়াবী কথাবার্তায় আকৃষ্ট হয়ে ছুটে এসে দেখত—সব মরীচিকা; কিন্তু ততক্ষণে পালাবার পথ বন্ধ। বাধ্য হয়ে তারা যোগ দিত জোনসের পাপচক্রের বিভিন্ন শাখায় যার মধ্যে আছে ছিঁচকে চুরি থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র পর্যন্ত।

জিম জোনসের ধর্মব্যবসা আরও কতদিন চলত বা শেষ পর্যন্ত কী চেহারা ধারণ করত বলা শক্ত। জোনসটাউন থেকে চুঁইয়ে বেরিয়ে আসা বিপজ্জনক কাজকর্মের খবর পেয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার কংগ্রেস-সদস্য লিও রায়ান কয়েকজন সংবাদিককে নিয়ে

উড়ে গেলেন উত্তর গায়ানার জঙ্গলে। আশ্রমিকরা গুরুর উপস্থিতিতে সাংবাদিকদের জানাল এখান থেকে তারা কেউ ফিরে যেতে চায় না। কিন্তু বেশ কিছু অস্বাক্ষরিত হাত-চিঠি রায়ানকে বুঝিয়ে দিল জোনসটাউন আদৌ সুবিধের জায়গা নয়, এখান থেকে চলে যেতে আগ্রহী অনেকেই। সব শুনে জিম জোনস লিও রায়ানকে জানাল যে, কেউ যদি আশ্রম ত্যাগ করতে চায় তবে তার কোনো আপত্তি নেই। প্রকৃতপক্ষে, তার আগেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গিয়েছিল পিপলস টেম্পল সেক্টের কাজকর্ম গোপন রাখতে হলে এই কংগ্রেস-সদস্য বা সাংবাদিকদের ফিরে যেতে দেওয়া চলবে না।

১৯৭৮ সালের ১৭ নভেম্বর গায়ানা বিমানবন্দর থেকে যখন লিও রায়ান, সাংবাদিকরা এবং জোনসটাউনত্যাগী কয়েকজন আশ্রমিক রওনা হওয়ার উদ্যোগ করছেন, হঠাৎ সেখানে আবির্ভূত হলো জিম জোনসের ভাড়াটে খুনির দল। মাত্র কয়েক মিনিটের প্রলয়! গুলির শব্দ আর ধোঁয়া কমে যেতে দেখা গেল রানওয়ের ওপর পড়ে আছেন লিও রায়ান, ন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং করপোরেশন-এর রবার্ট ব্রাউন ও ডোনাল্ড হ্যারিসন, সানফ্রানসিসকো একজামিনার পত্রিকার গ্রেগরি রবিনসন এবং আশ্রমত্যাগিনী প্যাট্রিসিয়া পার্ক। আহত দশজন, তাদের মধ্যে অন্যতম সানফ্রানসিসকো ক্রনিক্‌ল পত্রিকার রিপোর্টার রোনাল্ড জাভার্স। জাভার্স লিখেছেন, 'যা দেখলাম যতদিন বেঁচে থাকব, ভুলব না কখনও।'

জিম জোনস বুঝে গিয়েছিল যে, শেষের সেদিন এসে গিয়েছে। কিন্তু কোরেশের মতো হিম্মত তার ছিল না, সে চেয়েছিল পালিয়ে বাঁচতে। আশ্রমের প্রধান চিকিৎসক ডা. লরেন্স শ্যাথ্রুট-এর ফর্মূলা অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছিল এক মারাত্মক বিষ। সকলে নির্দ্বিধায় সেই বিষ পান করেছিল। যে-সব 'দুর্বলচিত্ত' ভক্ত বিষপানে আপত্তি জানায় তাদের হত্যা করা হয়েছিল গলার শিরা কেটে নয়তো গুলি করে এবং জোনস নিজেও প্রাণ দিয়েছিল বন্দুকের গুলিতে। মোট নিহতের সংখ্যা ন-শোর কিছু বেশি। কি বলা যাবে একে, মাস-হিস্টিরিয়া? না, এত সহজে ব্যাখ্যা করা যাবে না জোনস-ভক্তদের আচরণকে।

এ-মিছিলের শেষ নেই। জিম জোনসের পূর্বসূরী হলেন চার্লস ম্যানসন। পিতৃমাতৃ পরিচয়হীন এই উন্মাদ ধর্মগুরুর মূল কথা ছিল ঈশ্বর ও শয়তান অভিন্ন। চার্লস নিজে কখনও 'মেসায়া' কখনও 'ডেভিল'। তার সম্প্রদায় আয়তনের দিক থেকে কখনই কোরেশ বা জোনসের সমান হতে পারে নি, কিন্তু অনুগামীদের নিঃশর্ত আনুগত্য অর্জনের দিক থেকে চার্লস পিছিয়ে ছিল না। ১৯৭০ সালের ৪ জানুয়ারি নিয়ইয়র্ক টাইমস ম্যাগাজিন-এ স্টিভেন রবার্টস লেখেন যে, 'চার্লি ম্যানসনের চারপাশে নিঃসঙ্গ-অসহায় মানুষের জমায়েত, যাদের ভরসা করার মতো আর কোনো স্থান নেই। চার্লি এদের আশ্রয় দেয়, মনে নির্ভরতার সঞ্চার করে, ফলে ভক্তদের কাছ থেকে আনুগত্য লাভ করতে অসুবিধে হবে না।

শৈশবে নিরাশ্রিতের জীবনযাপন করা ম্যানসন নিশ্চয়ই বুঝত কাদের চক্রান্তে

তার দুরবস্থা। সে-কারণে সমাজ ও বিত্তবান মানুষের প্রতি এক উদ্‌গ্র ঘৃণা পোষণ করত সে। এর পরিণতি পরপর ১১টি হত্যাকাণ্ড। প্রথম শিকার সঙ্গীতবিদ গ্যারি হিনম্যান। ১৯৬৯ সালের ৬ অগাস্টের এই হত্যাকাণ্ডের জের কাটার আগেই ৯ অগাস্ট ম্যানসন-পরিবার আবার আঘাত হেনেছিল। এবার তাদের লক্ষ্য দ ভ্যালি অফ দ্য ডলস ছবির নায়িকা শ্যারন টেট এবং তার কয়েকজন বন্ধুবান্ধব। এই হত্যাকাণ্ডের নৃশংসতায় আমেরিকা চমকে উঠেছিল। সর্বশেষ হত্যাকাণ্ড ১১ অগাস্ট, এবার তাদের শিকার শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী লাবিয়াঙ্কা। প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের পর নিহতদের রক্ত দিয়ে দেয়ালে লেখা হতো কুরুচিপূর্ণ উশ্‌কানিমূলক স্লোগান, ম্যানসন চেয়েছিল এর মাধ্যমে সাদা-কালো জাতিদাঙ্গা বাধিয়ে দিতে।

এফ বি আই চার্লসের র‍্যাঞ্চে হানা দিয়ে আটক করেছিল ৬টি চোরাই গাড়ি, প্রচুর টাকাপয়সা, মাদকদ্রব্য এবং গোপন নথিপত্র। ডেভিড কোরেশ বা জিম জোনসের মতো চার্লি ম্যানসনেরও ছিল ব্যক্তিগত হারেম সেখান থেকে একদল মাদকসেবী অর্ধোন্মাদ যুবতীকে উদ্ধার করেছিল পুলিশ।

আদালতে চার্লস ম্যানসনের আচরণ ছিল নাটকীয়তায় পরিপূর্ণ। একদিকে তার কপালে অঙ্কিত স্বস্তিক চিহ্ন, আইনজীবী নিয়োগ করার ধরন এবং উদ্ভট ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে অসংলগ্ন স্বীকারোক্তি লোক হাসিয়েছে; অন্যদিকে নিজের জীবন সম্বন্ধে তার খোলামেলা কথাবার্তা বিব্রত করেছে মার্কিন প্রশাসনের নীতি-নির্ধারকদের। ম্যানসন জানিয়েছিল যে, জ্ঞান হওয়ার মুহূর্ত থেকে পেটের তাগিদে ছোটোখাটো অপরাধ করার ফলে পঁয়ত্রিশ পছরের জীবনে তাকে বাইশ বছর জেলখানায় কাটাতে হয়েছে। 'All my life I've been locked up because nobody wanted me. Jail is where they put people they don't want.' সে আরও বলেছিল, হতাশা ভুলতে উদ্‌গ্র মাদক এল এস ডি সেবন শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে তার উপলব্ধি ঘটে যে, ঈশ্বর পৃথিবীর মানুষকে উদ্ধার করার দায়িত্ব তাকে সমর্পন করেছেন।

ম্যানসন-পরিবার থেকে বেরিয়ে এসে রাজসাক্ষী হয়েছিলেন শ্রীমতী লিণ্ডা ক্যাসাবিয়ান। তিনি জানিয়েছিলেন আশ্রমে যে-সব নতুন মহিলা সদস্যা আসে তাদের সকলের মাথায় বিশ্বাস গেঁথে দেওয়া হয় যে তারা সবাই ডাইনি এবং ম্যানসন স্বয়ং শয়তান। মেয়েরা অল্পদিনের মধ্যেই ভাবতে শুরু করে যে, এখন তারাও চার্লির অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার অংশীদার। ম্যানসন-র‍্যাঞ্চের আভ্যন্তরীণ পরিবেশ—যেখানে ড্রাগ, অ্যালকোহল ও আগ্নেয়াস্ত্রের ছড়াছড়ি—সম্বন্ধেও অনেক তথ্য দিয়েছিলেন তিনি। প্রধানত তার সাক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে আদালত শেষ পর্যন্ত চার্লস ম্যানসনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল। এভাবে খতম হয়েছিল আরেক ঈশ্বরপুত্রের দুনিয়া উদ্ধারের অভিযান।

ম্যানসন থেকে কোরেশ—ডিলিউশন কি এদের পতনের পিছনে কাজ করেছে? অনুগামীরা যখন বিশ্বাস করছে ম্যানসন বা জোনস কিংবা কোরেশ স্বয়ং যিশু, তখন

সেই বিশ্বাস কি বদ্ধমূল হয়ে যাচ্ছে তাদের গুরুদের মধ্যেও? তারা কি বিশ্বাস করছে তাদের ক্ষমতা অসীম, সবরকম সামাজিক নিয়মকানুনের ঊর্ধ্বে তাদের আচরণ? এ থেকেই কি আইনভাঙা আচরণের সূত্রপাত, যার পরিণতি হয়ে উঠছে ভয়ঙ্কর? এসব প্রশ্নের উত্তর আমরা সন্দেহাতীতভাবে জানি না, তবে এদের দুঃসাহসী কাজকর্ম প্রশ্নগুলিকে ভেবে দেখতে বলে। হয়তো ঠিক সময়ে থামতে না-জানলে এমন মানসিকতা তৈরি হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু সময়জ্ঞান থাকলে যে ভক্তদের পয়সায় চর্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয় আহার করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দিব্যি কাটিয়ে দেওয়া যায় এটা দেখিয়ে দিয়েছেন 'চার্চ অফ সায়েন্টোলজি'-র প্রতিষ্ঠাতা লাফায়েৎ রোনাল্ড হুবার্ড।

১৯১১ সালে নেব্রাস্কায় রন হুবার্ডের জন্ম। সায়েন্স ফিকশন-লিখিয়ে হুবার্ড যে অবতার সেজে ধর্মব্যবসা ফাঁদতে চলেছেন সেটা বোঝা গিয়েছিল ১৯৪৯ সালে একটি লেখক সম্মিলনে যখন তিনি মন্তব্য করেন 'Writing for a penny a word is ridiculous. If a man really wants to make a million dollars, the best way would be to start his own religion.' এর ঠিক পরের বছর, অর্থাৎ ১৯৫০ সালে, প্রকাশিত হলো তার *Dianetics* গ্রন্থটি এবং এ-বইয়ের উদ্ভট দর্শনকে ভিত্তি করে ১৯৫৪ সালে স্থাপিত হলো 'সায়েন্টোলজি' ধর্ম সম্প্রদায়ের। হুবার্ডের নিজের দাবি অনুযায়ী তিনি নিউক্লিয়ার পদার্থবিদ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন নৌবহরে যোগ দিয়ে যুদ্ধে আহত হন ও নৌবাহিনী ত্যাগ করেন। হাসপাতালে থাকাকালীন তিনি ডায়ানেটিক্স-তত্ত্ব আবিষ্কার করেন, এই গবেষণা তাকে সুস্থ করে তোলে। কিন্তু আসল তথ্য হলো হুবার্ড কিছুদিন নিউক্লিয়ার ফিজিক্স নিয়ে পড়াশুনো করলেও এ-বিষয়ে তার কোনো ডিগ্রি নেই, কারণ কোর্সটি তিনি আদৌ পাশ করতে পারেন নি। নৌবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন ঠিকই, তবে তাকে যুদ্ধে পাঠানো হয় নি বলে আহত হওয়ার প্রশ্ন নেই। পাকস্থলীর ক্ষত এবং ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য তাকে নৌবাহিনী থেকে জবাব দেওয়া হয়েছিল। এখান থেকে বেরিয়ে এসে হুবার্ড একটি মানসিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য আবেদন করেন। একই সঙ্গে আরেকটি দরখাস্তে তিনি এফ বি আই-কে লেখেন যে, তার পিছনে কমিউনিস্ট গুপ্তচর লেগেছে। সেই দরখাস্তের পিছনে নোট লেখার সময় সংশ্লিষ্ট ফেড-এজেন্ট হুবার্ডের মানসিক সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

ডায়ানেটিক্সের যে দর্শন রন হুবার্ডের রাতারাতি কোটিপতি হয়ে ওঠার হাতিয়ার তার মূল বক্তব্যগুলি এতোই খেলো যে শুনলে মনে হয় না কোনো স্বাভাবিক বোধবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এসব কথায় বিশ্বাস করতে পারেন। অথচ ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব, প্রাচ্য ধর্মসমূহের নির্যাস এবং হলিস্টিক মেডিসিনের সংমিশ্রণে গড়ে তোলা এই ভুয়ো দর্শনে আস্থা রাখা লোকের অভাব নেই। আশির দশকের মাঝামাঝি চার্চ অফ সায়েন্টোলজির সদস্য-সংখ্যা ছিল ৫৫ লক্ষের কাছাকাছি। যে সমাজে সারাক্ষণ চলছে ইঁদুরদৌড়, একজনকে দাবিয়ে রেখে আরেকজনের ওপরে ওঠার তীব্র চেষ্টা, সেখানে যে প্রতিষ্ঠান ব্যর্থ-মানুষের দুঃখের সাথী হওয়ার কথা বলবে তার সদস্যবৃদ্ধি অনিবার্য।

সাদৃশ্যের সন্ধানে

ধর্মব্যবসার স্বরূপ বিশ্বের সর্বত্র প্রায় এক রকম। দেশকালের প্রভেদে হয়তো কিছু পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু মূল ছকটা অবিকৃত থেকে যায়। অধিকাংশ ধর্মগুরুর আশ্রমের ভিতরে সেই দেহব্যবসা, ড্রাগ অ্যালকোহল ও অস্ত্রশস্ত্রের পরিচিত পরিবেশ। ভারতীয় ঈশ্বরপুত্রেরা এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। এখানে কয়েকটি স্বদেশী উদাহরণ তুলে দেওয়া হলো যাতে পাঠক ছকটিকে চিনে নিতে পারেন।

প্রথমে সেই বহু-বিতর্কিত সাইবাবা। নামী-দামী ভক্তদের অকাতরে সোনার গয়না বিতরণ করা দেখে যুক্তিবাদীরা তার বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন যে, তিনি স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ আইন ভাঙছেন। আদালত রায় দিলেন—অলৌকিক উপায়ে তৈরি করা সোনা এই আইনের বিচার্য নয়। সাইবাবার শূন্য থেকে গয়না আনার কৌশল খুব সম্প্রতি আবারও ভিডিও ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। এতো সোনা আসে কোত্থেকে, আকাশ থেকে নয় নিশ্চয়ই?

রন হুবার্ডের ভারতীয় সংস্করণ মহর্ষি মহেশ যোগী-র উদ্ভাবন 'ট্রান্সেনডেন্টাল মেডিটেশন' ওরফে অতীন্দ্রিয় ধ্যান। এই ধ্যান ঠিকমতো শিখতে পারলে শূন্যে ভাসার ক্ষমতা জন্মায় বলে দাবি করা হয়। হাজার হাজার মানুষ লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয় করে চলেছেন এভাবে শূন্যে-ওড়া শিখতে গিয়ে। কিছুদিন আগে রবার্ট ক্রোপিনস্কি নামে এক মার্কিনকে এক লক্ষ আটত্রিশ হাজার ডলার ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন মহেশ যোগী, আদালতের নির্দেশে। রবার্টের অভিযোগ - ১১ বছর অতীন্দ্রিয় ধ্যান চর্চা করেও সে শূন্যে ভাসার কৌশল আয়ত্ত করতে পারে নি, মাঝখান থেকে ধ্যানে বসে হাঁটু জখম হয়েছে এবং নষ্ট হয়েছে মানসিক ভাবসাম্য।

ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারীকে ভুলে গেলে চলবে না। ইন্দিরা-জমানায় প্রশাসনের দাক্ষিণ্যে তার বাড়বাড়ন্ত লক্ষণীয় পর্যায়ে পৌঁছেছিল। জম্মুতে তার 'শিব্য গান ফ্যাক্টরি' নামে অস্ত্র তৈরির কারখানা উৎপাদনের ছাড়পত্র পেয়েছিল জৈল সিংহ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালীন। ১৯৮৭ সালের অগাস্টে জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লাকে ব্রহ্মচারী জানিয়েছিলেন তিনি অস্ত্র-ব্যবসার পাট গুটিয়ে দিতে চলেছেন। কিন্তু তার আগেই পুলিশ কারখানায় হানা দিয়ে উদ্ধার করল ছ-শ বে-আইনি স্প্যানিশ বন্দুক।

কয়েকদিন আগে বহু অর্থব্যয়ে মাতৃ-শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করলেন 'নিঃস্ব' চন্দ্রস্বামী। একাধিকবার 'ফেরা' আইন লঙ্ঘনের জন্য সি বি আই তাকে গ্রেফতার করেছে। রাজনীতিতে চন্দ্রস্বামীর অপরিসীম আগ্রহের বহর জিম জোনসের কথা মনে করিয়ে দেয়। ১৯৭৯ সালে মোরারজি দেশাই-এর সরকার ভেঙে দেওয়ার পিছনে তার সক্রিয় ভূমিকা ছিল বলে জানা যায়।

আচার্য রজনীশের কর্মকাণ্ডের মধ্যে মার্কিন যোগসূত্রের গন্ধ প্রকট। ১৯৮১ সালে আমেরিকার ওরেগন-এ এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার একর পতিত জমির ওপর প্রতিষ্ঠা

করেছিলেন 'রজনীশপুরম' নামে একটি ছোটো মাপের আধুনিক শহর। আর্মাডেগন ব্র্যাক বা জোনসটাউনের মতো রজনীশপুরম যে যাবতীয় নোংরামির আখড়া সে-কথা ফাঁস করে দিয়েছিলেন রজনীশের একদা-ঘনিষ্ঠ সহচরী মা আনন্দশীলা। এর ফলে আমেরিকা থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর রজনীশ অনেকদিন কোনো রাষ্ট্রে বসবাসের অনুমতি পান নি।
বালক ব্রহ্মচারীর মরদেহ নিয়ে নাটকের সমাপ্তির পর সুখচর আশ্রমের যে-সব কাহিনী সংবাদপত্রে বেরোচ্ছে তা থেকে মনে হতে পারে পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসনের নাকের ডগায় গড়ে উঠছিল আরেকটি 'জোনসটাউন।' মরদেহ উদ্ধার অভিযানের সময় পুলিশ সংযত মনোভাবের পরিচয় না-দিলে, কে বলতে পারে, এই কলকাতায়ই হয়তো কোরেশ-কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ঘটত।

অবশ্য কবে একজন সদস্য এসে সম্প্রদায়ে যোগ দেবেন তার অপেক্ষায় না-থেকে হুবার্ড বাঁকা রাস্তা ধরেছিলেন। সায়েন্টোলজির চার্চ রাস্তার মোড়ে মোড়ে ক্যাম্প খাটিয়ে বিনা পয়সায় লোকের ব্যক্তিত্ব পরীক্ষার আয়োজন করে। কৌতূহলী দর্শক হিসেবে যিনি এগিয়ে আসেন তাকে বোঝানো হয় যে, বর্তমান বা পূর্বজন্মে পাওয়া বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা (traumatic experience) পার্থিব সমস্যার মূল কারণ। এই মানসিক অবস্থাকে—যা সায়েন্টোলজির পরিভাষায় 'ইনগ্রাম'—মস্তিষ্ক থেকে ধুয়ে সাফ করে দিলেই জীবনের সমস্ত সমস্যা খতম, তারপর নতুন জীবন হবে আনন্দময়। ইনগ্রাম-ধৌতির কাজটা চার্চের মিনিস্টার অর্থাৎ চিকিৎসকেরা করে থাকেন। খরচ মাত্র কয়েক ডলার। ইনগ্রাম শনাক্ত করা হয় হুবার্ডের নিজস্ব উদ্ভাবন 'ই-মিটার' নামক যন্ত্রের সাহায্যে। জিনিসটি আদতে একটি পুরনো ধরনের লাই-ডিটেক্টর, যাতে একটি গ্যালভানোমিটারের সঙ্গে দুটি টিনের সিলিণ্ডার যুক্ত থাকে। তড়িৎ প্রবাহের ফলে সূচকের নড়াচড়া দেখে মিনিস্টার ইনগ্রামকে শনাক্ত করেন এবং খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে রোগীর অতীতের পাপকর্ম সম্পর্কে জেনে নেন। প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ হওয়ার পর মিনিস্টার দাবি করেন রোগীর মন পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এবারেই শুরু আসল খেলা! রোগী যখন নতুন জীবন ফিরে পাবার আনন্দ নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, তখন তার পিছনে বেজে ওঠে একটু আগে করা অন্যায় কাজের স্বীকারোক্তি বিধৃত ক্যাসেট, সমস্ত বাক্যালাপ তার অজান্তে রেকর্ড করে নেওয়া হয়েছে। এরপর সূচনা হয় ব্ল্যাকমেলের, যার পরিণতি চার্চের সদস্যবৃদ্ধি এবং সম্পদস্ফীতি।

সায়েন্টোলজির চার্চ থেকে বেরিয়ে এসেছেন এরকম ডজন-ডজন সদস্য ফাঁস করে দিয়েছেন এই গোপন কার্যকলাপ। সেকারণে আমেরিকার ফুডস অ্যাণ্ড ড্রাগস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ 'ই-মিটার' যন্ত্রটিকে বেআইনি চিকিৎসা-সামগ্রী বলে ঘোষণা করেছেন, ব্রিটিশ সরকার হুবার্ড ও তার অনুগামীদের চিকিৎসাচর্চাকে নিষিদ্ধ করেছেন এবং অস্ট্রেলিয়ার আদালত চার্চ অফ সায়েন্টোলজির গির্জা-স্বীকৃতি ফিরিয়ে নিয়েছে।

বিপদের আশঙ্কা করে ষাট ও সত্তর দশকের অধিকাংশ সময় রন হুবার্ড একটি ইয়টে চেপে সমুদ্রের আন্তর্জাতিক জলবিভাগে ঘুরে বেড়িয়েছেন যাতে কোনো দেশের আইন তাকে গ্রেফতার করতে না-পারে।

আরও অনেকবার হুবার্ড তার বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। অন্যান্য অবতারবাদের মতো তিনি গুণ্ডাবাহিনী তৈরি করেন নি; নিজের নিরাপত্তার জন্য ১৯৬৬ সালে গড়ে তুলেছেন Guardian Organization বা 'গো (Go)' নামে এক ব্যক্তিগত গোয়েন্দা সংস্থা যার কার্যকারিতা পেশীশক্তির চেয়ে অনেক বেশি। অবশ্য শেষ পর্যন্ত 'গো' তাকে ডুবিয়েছে। ১৯৭৭ সালের ৮ জুলাই চার্চ অফ সায়েন্টোলজির লস অ্যাঞ্জেলসের সদর দপ্তর থেকে এফ বি আই ২৩ হাজার গোপন সরকারি নথিপত্রের নকল উদ্ধার করে। বিভিন্ন সময় সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে 'গো'-এজেন্টরা এগুলি সরিয়েছিল। বিচারে 'গো'-র প্রধান শ্রীমতী মেরি সু (যিনি হুবার্ডের তৃতীয়া পত্নী) সহ আটজন সায়েন্টোলজিস্টের কারাদণ্ড হয়। রন হুবার্ড নিজে কিন্তু একফোঁটা শাস্তি পান নি। আশির দশকের গোড়ার দিকে রন হুবার্ড লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যান, তার 'পাবলিক অ্যাপিয়ারেন্স' নামক অনুষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায়। অনেকের অনুমান হুবার্ড ওই সময় নাগাদ মারা গিয়েছিলেন, যদিও ১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের আগে চার্চ মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করে নি।

ডেভিড কোরেশের সাম্প্রতিক আত্মহনন আবার তুলে আনল ভুলে যাওয়া প্রশ্নটা—এত ধর্মগুরু কেন? এককথায় উত্তর দেওয়া শক্ত, তবে বুঝতে অসুবিধে হয় না ঈশ্বরপুত্র, ধর্মগুরু ও অবতারবাদের চিত্র সারা বিশ্বে একই রকম। বিলাসের শিখরে বসে জীবনকে উপভোগ করতে গিয়ে কিছুসংখ্যক মানুষ হারিয়ে ফেলছে বেঁচে থাকার আনন্দ। অন্যদিকে আশ্রয় ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীন আরেকদল মানুষ মাথার ওপর ছাদ খুঁজতে ছুটে যাচ্ছে জোনসটাউন বা আর্মাগেডন র‍্যাঞ্চে। উভয় দলই ভণ্ড গুরুবাবার শিকার, তাদের নষ্টামির সঙ্গী। একটি দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা অবতারদের লালন করে, এটা স্পষ্ট করে বোঝা প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র :

১. *New York Times*, 4 January, 1970
২. *Rolling Stone*, 25 June, 1970
৩. *New York Times*, 20 November, 1978
৪. *Time*, 10 February, 1986
৫. *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২৬ মে, ১৯৯৩
৬. *Sunday*, 29 January, 1989

কাজল ভট্টাচার্য

সেপ্টেম্বর '৯৩

অতিপ্রাকৃত

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর (১৮৬৪-১৯১৯) সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার নেই। তাঁর অসাধারণ প্রগতিশীল মনীষার স্বাক্ষর রয়ে গেছে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের বিস্তীর্ণ পটভূমিতে। অতিপ্রাকৃত—প্রথম প্রস্তাব তার *জিজ্ঞাসা* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় *সাধনা* পত্রিকায় (১৩০০ বঙ্গাব্দ)।

দুই চারি জন খ্যাতনামা ব্যক্তি অতিপ্রাকৃত ঘটনায় বিশ্বাস করেন, দেখিতে পাওয়া যায়। ফলে সাধারণের মনে একটা বিষম খট্‌কা উপস্থিত হয়। অমুক অমুক ঘটনা এত দূর অবিশ্বাস্য যে, মনকে নিতান্ত বলপূর্ব্বক না টানিলে মন সেদিকে ধায় না; তথাপি আমাদের অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে বুদ্ধিমান ব্যক্তি যখন সেই সেই ঘটনায় নির্ব্বিবাদে বিশ্বাস করিতেছেন, তখন কতকটা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইতে হয়। মনুষ্যচরিত্র রহস্যময়। অতিমাত্র সংযতচিত্ত মনস্বী ব্যক্তিরও মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে কোন স্তরে, কোন পর্দ্দার অন্তরালে, এমন একটা গোলযোগজনক কিছু থাকিতে পারে, যাহাতে তাঁহার বাহ্য আচরণ ও কর্ম্মপ্রণালীর সামঞ্জস্য অকস্মাৎ নষ্ট করিয়া দেয়। এতটুকু নির্ভয়ে বলিতে পারা যায়। কাজেই কোন কোন বড় লোক অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস করেন, ইহাতে বিস্মিত হওয়া অনুচিত। তবে মানবজাতির মধ্যে এই বিশ্বাস এতটা প্রচলিত যে, ইহার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে একটু আলোচনা নিরর্থক না হইতে পারে। এই বিশ্বাস মনুষ্যজাতির ঠিক প্রকৃতিগত এবং স্বভাবসিদ্ধ কি না, এই বিষয়ে প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে। মনের কথা সাহসের সহিত ও স্পষ্ট করিয়া বলিলে বলিতে হয়, যেন অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসের দিকে মনের একটা ঝোঁক আছে, যেন ঐ বিশ্বাসে মন একটু আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করে। ভূত মানি বলিতে সকলের 'নৈতিক' সহসে কুলায় না; তবে মনের পর্দ্দার স্তরের নীচের স্তর খুঁজিয়া দেখিলে, সেখানে যেন ভূতের অস্তিত্বের প্রতি একটা আগ্রহ দেখা যায়।......

একটু চাপিয়া ধরিলে এই সিদ্ধান্তটা কত দূর টিকে, বলা যায় না। একটু যেন যুক্তিতে গোলযোগ আছে। কিন্তু গোলযোগ ঠিক তাৎপর্য্যগত বা ভাবগত নহে, অনেকটা শব্দগত বা আভিধানিক। প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত, এই শব্দ দুইটার অর্থ লইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে। প্রাকৃত শব্দের অর্থ যাহা প্রকৃতি নির্দিষ্ট, প্রাকৃতিক নিয়ম-সঙ্গত, অতিপ্রাকৃত শব্দের অর্থ যাহা প্রকৃতির নিয়মিত বিধানেরও বাহিরে। এখন আদিম মনুষ্যের অবস্থা দেখা যাউক। মনুষ্যের জ্ঞান যখন ইতর জীবের ন্যায় সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ ছিল, তখন সে প্রাকৃতিক নিয়মের অস্তিত্ব স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়াছিল কি না সন্দেহ।...মোটের উপর অধিকাংশ জাগতিক ব্যাপার তাহাদের

নিকট ঘটিত এই মাত্র ; তাহাদের অনুভূতির ভিতর আসিত এই মাত্র; যখন ঘটিত, তখন তাহারা অনুভব করিত এই মাত্র। এই সকল জাগতিক ব্যাপার যে ঘটিবে বা ঘটিবে না, অথবা কবে কোথায় কিরূপে ঘটিবে, এ সকল প্রশ্ন তাহাদের মনের মধ্যে কখন উপস্থিত হইত না। অর্থাৎ দুই একটা ঘটনা বাদ দিয়া সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনা তাহাদের অনুভূতির বিষয় ছিল মাত্র; তাহাদের বুদ্ধিপ্রয়োগের বিষয় ছিল না। তাহাদের নিকট সকলই প্রাকৃত ছিল; অতিপ্রাকৃতের অস্তিত্ব তাহাদের নিকট ছিল না। আমরা এখন অতিবুদ্ধিবলে অতিবলীয়ান হইয়া দর্পসহকারে বলিয়া থাকি, এ ঘটনা অসম্ভব। তাহাদের এরূপ দর্পপ্রকাশের কোনরূপ অবকাশ ছিল না। তাহাদের নিকট সকলই সম্ভব, সকলই বিশ্বাস্য ছিল। অসম্ভাব্য, অতএব অবিশ্বাস্য, এরূপ তাহাদের নিকট কিছুই ছিল না।

অর্থাৎ অতিপ্রাকৃতকে অতিপ্রাকৃত জানিয়াও, প্রকৃতির নিয়মের সহিত অসঙ্গত বুঝিয়াও, তাহাতে বিশ্বাস এক কথা; আর প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত এই ভেদবোধের অনুদয় হেতু সর্বত্রই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। ব্যক্তি-বিশেষের আদেশে সূর্য আকাশমার্গে স্থির ছিল, ব্যক্তিবিশেষ মৃত্যুর পর ভক্তজনকে দেখা দিয়াছিলেন, ইত্যাদি ঘটনায় আমরা, অতিপ্রাকৃত বুঝিয়াও কোন স্থানে মনের সহিত ঝগড়া করিয়া, কোন স্থানে অপরের সহিত ঝগড়া বাধাইবার উদ্দেশে, বিশ্বাস করি। কিন্তু সেকালের মানুষের নিকট ঝড়বৃষ্টি ভূমিকম্প চন্দ্রগ্রহণ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ ...ঘটনার মত ঐ সকলও নৈসর্গিক ও সম্পূর্ণ সম্ভবপর বলিয়া গৃহীত। এইরূপে দেখিলে অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস মানুষের পক্ষে যে স্বাভাবিক, তাহা বলা যায় না। অলৌকিক অসাধারণ অদ্ভুত ঘটনায় মানুষে যে বিশ্বাস করে, অতিপ্রাকৃতে স্বাভাবিক বিশ্বাস তাহার কারণ নহে। তাহা যে প্রাকৃত নহে, নিয়মসঙ্গত নহে, এই বোধের অনুৎপত্তিই তাহার প্রকৃত কারণ। অতিপ্রাকৃতকে মানুষ প্রাকৃত জানিয়াই বিশ্বাস করিতে চায়।

আদিম মানব সকল ঘটনাই সম্ভাব্য বলিয়া জানিত। আমরা সেই আদিম মানুষেরই বংশধর; জগৎ সম্পর্কে কতকটা জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া কয়েকটা ধাপ উপরে উঠিয়াছি সত্য; কিন্তু প্রাচীন সংস্কার এখনও আমাদের অস্থিমজ্জা হইতে লুপ্ত হয় নাই। সুতরাং একটা অশ্রুতপূর্ব অদ্ভুত ঘটনা শুনিলেই তাহাকে উড়াইয়া দিতে হইবে, এরূপ বাক্যের সমর্থনে আমাদের অনেকেই অসম্মত।

আর একটা কথা। জ্ঞানের উন্নতিতে অনেক নূতন নূতন জাগতিক ব্যাপার আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে মানুষ সে সকলের অস্তিত্ব কল্পনায় আনিতেও সাহস করে নাই। এত নূতন নূতন ব্যাপার যখন দিন দিন আমাদের সম্মুখে আসিতেছে, তখন জগতে আরও কত কাণ্ড আছে, কে বলিতে পারে? এখন যাহাকে অতিপ্রাকৃত বলিয়া উড়াইতে চাহিতেছে, কে বলিতে পারে, দশ বৎসর পরে তাহাই প্রাকৃত বলিয়া গণ্য হইবে না? এই ত কিছুদিন আগে মেসমার সাহেবকে লোকে বুজরুক মাত্র বলিয়া জানিত। কিন্তু আজ হিপ্নটিজম বা বশীকরণ বিদ্যাকে অমূলক বলিতে কে সাহস করে?

প্রকৃতির নিয়মের সম্পূর্ণ বিরোধী ঘটনায় বিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। তবে ইদানীং আমাদের প্রাকৃতিক নিয়মে অভিজ্ঞতার অপেক্ষা অজ্ঞতার পরিমাণ অনেক অধিক। সুতরাং একটা নূতন কথা শুনিলেই সেটা অতিপ্রাকৃত বলিয়া উঠা অদূরদর্শিতার পরিচয়। আবার নূতন কথা শুনিলেই বিশ্বাস করিতে হইবে, এমনও নহে। তাহার সত্যতা সম্বন্ধে যথাসাধ্য অনুসন্ধান কর্তব্য। হইতে পারে, ঘটনার সাক্ষিগণ মিথ্যাবাদী, অথবা অনিচ্ছাত্ত্বেও প্রতারিত ; হইতে পারে, তাঁহাদের ইন্দ্রিয় কোনরূপে প্রতারিত হইয়াছে, অথবা তাহাদের বোধশক্তি তখন সুস্থ দশায় ছিল না। এইরূপে অনুসন্ধান করিয়াও যদি দেখা যায়, ব্যাপারটা অমূলক নহে তখন আমাদের প্রাকৃতিক নিয়মের অনভিজ্ঞতা স্বীকার করিতে হইবে। ঘটনাটাকে নিয়মের বিরোধী বা অতিপ্রাকৃত বলিবার প্রয়োজন হইবে না।

কিন্তু প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর মধ্যে পরস্পর একটা সম্পর্ক, একটা সুনিয়ত সম্বন্ধ থাকিতেই হইবে, এমন কি কথা আছে? কোন একটা অদৃষ্টপূর্ব নূতন ঘটনা ঘটিলেই এখন তাহাকে জগৎপ্রণালীতে স্থান দিতে পারিতেছি না, কিন্তু এককালে স্থান দিতে পারিব, এরূপ মনে করিবার হেতু কি? জগৎপ্রণালী সুব্যবস্থিত সুশৃঙ্খল সুনিয়ত হইবেই হইবে, এরূপ মনে করিবার হেতু কি আছে?

এই স্থলে একটু সূক্ষ্মদর্শনের আবশ্যকতা আছে। পরিতাপের বিষয়, বড় বড় পণ্ডিতেরাও দার্শনিক বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া এই সূক্ষ্মদর্শনটুকু প্রয়োগ করিতে ভুলিয়া যান। প্রকৃতি, প্রাকৃতিক নিয়ম প্রভৃতি শব্দগুলি লৌকিক প্রচলিত অর্থে গ্রহণ করিয়া অনর্থক গোলযোগে প্রবৃত্ত হয়েন। বহিঃপ্রকৃতি অথবা বাহিরের জগৎ সর্ব্বতোভাবে মানব-মনেরই সৃষ্ট, এ-কথাটা আমরা যখন-তখন ভুলিয়া যাই। জগৎ আমাদের বহিঃস্থ, স্বাধীন, স্বতঃ সৃষ্ট, স্বতন্ত্র অস্তিত্বযুক্ত একটা-না-একটা কিছু, এই ধারণাটাই আমাদের মনে সর্ব্বদা যেন জাগিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে আমার জগৎ আমারই সৃষ্ট; তোমার জগৎ তোমারই সৃষ্ট। আমার জগৎ আমারই একটা মনগড়া পদার্থ, যাহা আমার সুবিধার জন্য আমি আমার বাহিরে কোনরকমে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছি। সেইরূপ তোমার জগৎ তোমারই প্রক্ষিপ্ত মনগড়া পদার্থ। আমার জগৎটা সর্বাংশে তোমার জগতের অনুরূপ নহে, যেহেতু আমি সর্বাংশে তোমার অনুরূপ নহি। আমার জগতে যে সকল নিয়মের অস্তিত্ব আমি বোধ করি, সে আমারই কায়দা। তাহাতে আমারই সুবিধা। জগৎকে নিয়মানুযায়ী দেখিলে আমার জীবনযাত্রার যথেষ্ট সুবিধা ঘটে। অনিয়ত দেখিলে জীবনযাত্রা ভার হইয়া উঠে। সেই জন্য আমার জগৎকে আমি নিয়মানুযায়ী ও নিয়মের অধীন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছি। আমার জগতে আমিই নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। আমার জগতের সহিত আমার নিত্য আদান-প্রদান, নিত্য কারবার চলিতেছে। সেই আদান-প্রদান ও কারবারের সুবিধার জন্য আমি নিয়মের

প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। আমার আত্মপ্রসারণের সহিত আমার জগতের পরিসর বৃদ্ধি পায়। আমি সেই জগতের কেন্দ্রস্থলে উপবিষ্ট হইয়া আশে-পাশে হাত বাড়াইয়া যথাসাধ্য গোছাইয়া ও বিধানানুগত করিয়া উহাকে আয়ত্ত করিয়া লই। যত দূর সাধ্য, তত দূর করি। সবটাকে আয়ত্ত করিতে পারি না। আশেপাশে নিকটে যতটুকু আছে, তাহাকে বিধানবিন্যস্ত করি। জগতের কেন্দ্র হইতে দূরদেশে, যেখানে হাত বাড়াইতে সকল সময় পারি না, সেখানে এমন অনেক জিনিস রহিয়া যায়, যাহা আমার নিয়মের ভিতর টানিয়া আনিতে পারি না। সেখানে আমার প্রভূত্ব বড় খাটে না। সেই অনিয়ত জিনিসগুলা আমার অধীন হয় না। আমার জীবনের কাজে তাহাদিগকে নিয়োগ করিতে পারি না। অনেক সময় তাহারাই অতর্কিতভাবে আমার উপর প্রভূত্ব চালায়। আমি ভুলিয়া যাই যে, আমারই সৃষ্ট পদার্থ আমাকে আক্রমণ করিতেছে। ভুলিয়া যাই যে, আমার শক্তির অভাবে যাহাদিগকে আমার প্রতিষ্ঠিত নিয়মের অধীনতায় অদ্যাপি আনিতে পারি নাই, তাহারাই আমাকে জীবনযাত্রায় প্রতিরোধ করিতেছে, আমার জীবনের পথ কণ্টকিত করিতেছে। আমি নিজের ছায়া দেখিয়া বালকের মত ভয় পাইতেছি। নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া উপাখ্যানের কুকুরের মত প্রতারিত হইতেছি। আপন প্রতিবিম্বের বিভীষিকা দেখিয়া উপাখ্যানোক্ত সিংহের মত নিজের জীবন বিসর্জ্জন করিতেছি। এই সকল জাগতিক ঘটনাকেই আমরা ভয় করি; ইহাদের দর্শনে আমাদের আতঙ্ক জন্মে; ইহাদের স্পর্শে আমাদের রোমাঞ্চ হয়। কেন না, ইহারা এখনও নিয়মের বশে আইসে নাই, এখনও জীবনের অনুকূল হয় নাই; এখনও ইহারা জীবনের প্রতিকূলতা করিতে ছাড়ে না। ইহাদিগকে দেখিয়া সময়ে সময়ে শিহরিয়া উঠি এবং বলি— এটা মিরাক্‌ল, ওটা অতিপ্রাকৃত। বস্তুতঃ ইহা অতিপ্রাকৃত এই অর্থে যে, এখনও ইহা প্রকৃতির নিয়মের অনুগত হয় নাই। অতিপ্রাকৃত রহিবে কিনা তাহা আমার নিজের শক্তির উপর নির্ভর করে। আমার শক্তি থাকে, কালে অতিপ্রাকৃতকে প্রাকৃত করিয়া লইব; শক্তি না থাকে, অতিপ্রাকৃতই রহিবে।

আমার জগৎ সর্ব্বাংশে তোমার জগতের অনুরূপ নহে। আমার জগৎ যত বড়, তোমার ঠিক তত বড় নহে। হয়ত আমার জগতের দেশগত পরিসর অধিক; হয়ত আমার জগতের কালগত বিস্তৃতি অধিক। সে আমার আত্মোৎকর্ষের পরিচয়। আমার জগতের ভিতর যা-যা আছে, তোমার জগতের ভিতর যে ঠিক তাই-তাই আছে, তাহা মনে করিবার কারণ নাই। জন্মান্ধ ব্যক্তি তাহার প্রমাণ; রঙ্‌কানা লোক তাহার প্রমাণ; তাহাদের জগৎ সর্ব্বাংশে আমার জগতের মত নহে। আমার জগতে আমার প্রত্যক্ষ বিষয় যাহা-যাহা আছে, তোমার জগতে তোমার প্রত্যক্ষ বিষয় সে সমস্ত নাই। আবার তোমার জগতে যাহা আছে, আমার জগতে তাহা নাই। তুমি যাহা দেখিতে পাইতেছ, আমি তাহা দেখিতে পাই না। তাই বলিয়া তোমাকে মিথ্যাবাদী অথবা প্রতারিত অথবা বিকৃতেন্দ্রিয় অথবা বিকৃতবুদ্ধি বলা আমার সাজে না। আমার পক্ষে আমার জগৎ যেমন সত্য, সুপ্তের পক্ষে স্বপ্নদৃষ্ট জগৎ তেমনই সত্য। আমার

নিকট আমার সুনিয়ত সুব্যবস্থ জীবনানুকূল জগৎ যেমন সত্য; পাগলের পক্ষে তাহার অনিয়ত অব্যবস্থ জীবনের প্রতিকূল জগৎ তেমনই সত্য। তবে পাগলকে অবজ্ঞা করি কেন? তাহার কারণ, আমি জীবন-সমরে সমর্থ, আর সে অসমর্থ।

এখনও যে মনুষ্যজাতি অতিপ্রাকৃতের বিভীষিকা দেখে, সে বিভীষিকা অলীক নহে। যে দেখে, সে মিথ্যাবাদী না হইতে পারে, কিন্তু সে অশক্ত। যে যে-পরিমাণে দেখে, সে সেই পরিমাণে অশক্ত। মনুষ্যজাতির শক্তিসঞ্চয়ের সহিত অতিপ্রাকৃতের সংখ্যা ও পরিমাণ কমিয়া যাইবে সন্দেহ নাই, তবে মানবাত্মার পরিসর কখন শেষ সীমা প্রাপ্ত হইবে, মানব কোন্ সময়ে সৃষ্ট শক্তি হইতে বঞ্চিত হইবে, তাহা বলিতে পারি না। যে পর্যন্ত সেই শেষ দিন না আইসে, সে পর্য্যন্ত প্রাকৃতের সহিত অতিপ্রাকৃত এই অর্থে মিলিয়া মিশিয়া বর্ত্তমান থাকিবে, সন্দেহ নাই।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

অদ্ভুত, অলৌকিক, রহস্যময় কিছুর প্রতি
এক অমোঘ আকর্ষণ, কম বেশি সব মানুষের
মধ্যেই বোধ হয় লুকিয়ে থাকে। তাই বাস্তব
জীবনে আমরা বিভ্রান্ত হই, প্রতারিত হই,
আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলি প্রায়ই। এই মানসিক
শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে হয় নিজেকেই। জানতে
হয় রহস্যের বৈজ্ঞানিক প্রেক্ষাপট। খুঁজে বার
করতে হয় সত্যকে—
অতীন্দ্রিয় অলৌকিকের অন্তরাল থেকে।

ISBN 81-86371-02-8